প্রথম প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৯৫৯

প্রকাশক ঃ

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

'করুণা প্রকাশনী'

১৮এ টেমার লেন

কলকাতা-৯

মুদ্রাকর ঃ

বিষ্ণুপদ চৌধুরী

প্রিন্ট হোম

২০৯এ, বিধান সরণী

কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী

মদন সরকার

সুন্দরের সন্ধানীদের উদ্দেশ্যে

এই লেখকের অন্যান্য বই

তন্ত্রপ্রভাব
মুকুরে শত মুখ
মানসনয়ন
ডাকিনী
বহুরূপে দেবতা তুমি
তান্ত্রিক সাধনা ও তন্ত্রকাহিনী
সম্মোহন
তন্ত্র-তপস্যা
গোপন সাধনা
অশরীরী
অবিশ্বাস্য
যক্ষিণী
যোগিনী
জন্মান্তর রহস্য
আজও যা ঘটে
আবার আমি
কে ডাকে আমায়
অজানার আঙিনায়
জীবনের ওপার থেকে
কে তুমি

যাঁরা আমাদের দৃষ্টিতে, আমাদের ধারণাতে বরাবরের জন্যে হারিয়ে গেছেন, তাঁরা কি সত্যিই হারিয়ে যান ? দেহ যাওয়ার পরেও তাঁদের বাণী কি আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়ায় ? মর-জগতের দেহরূপের নাশ হলেও সত্যি সত্যি কি আলোর পথ ধরে, জ্যোৎস্নার পথ ধরে, অন্ধকারে মিলে-মিশে আসে কি তারা আগেকার রূপের ভাবধারা নিয়ে ?

চিরকালের পৃথিবীর সব দেশেরই মানুষের এই আকুল জিজ্ঞাসা যুগ যুগ ধরে এক মন থেকে অন্য মনে ঘুরে-ফিরে বেড়িয়েছে। প্রভাব বিস্তার করেছে। মানুষ অশান্ত, দিশেহারা। ভেবে কোনো কূল-কিনারা পায় নি। পাবার ক্ষীণ আশার আলোও দেখা যায় নি।

তবুও মানুষ হঠাৎ হঠাৎ অনেক জায়গায় অনেক সময়, অনেক কিছুর যেন প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে ওঠে। অতীতের অজানা-অচেনা ঘটনার ছবি এসে হাজির হয়। এটা কি সত্যি ? সত্যি না হলেই বা অনুসন্ধানে কেমন করে হুবহু মিলে যায় ?

বাতাসে কি ধরা থাকে অতীতের কণ্ঠস্বর ? আলোতে-আঁধারে কি অতীতের রূপের প্রতিচ্ছায়া ঘুরে-ফিরে বেড়ায় ?

এরকম রহস্যঘন অনেক অজানা ঘটনা আমি আমার শ্রদ্ধেয় পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে এই বইয়ের পাতায় পাতায় পরিবেশন করেছি।

সুদূরতম

সে কি এলো ফিরে

হিজলবনের ধারে।

আগের সেই ঝোপঝাড় তেমনই আছে। তেমনই ভয়াবহ জায়গা। এ-ধার দিয়ে বড় একটা কেউ যাতায়াত করে না। দিনের বেলাতেই ভয় ধরে।

আমায় জায়গাটা দেখাতে নিয়ে এসেছে বজ্রকান্তদের বংশের জোয়ান ছেলেটি। নিশিকান্ত। নিশিকান্ত বলছে, সুরমাদেবীর বারণ সত্ত্বেও এখান দিয়েই যেত এককালের শিবশঙ্কর—বিনয়কৃষ্ণ।

এখানে আসার জন্য নিদারুণ আকর্ষণ অনুভব করছে বজ্রকান্ত। বিনয়কৃষ্ণর প্রতি স্নেহের ঘোড়াটাও আসতে চাইত কেবল এই পথে।

সুরমাও ঘোড়ায় চেপে এসে পড়েছিল একদিন নিজের অগোচরেই…।

জায়গাটা দেখে ফিরে এলুম সুরমার বাড়ির রাস্তায়।

বাড়ির দোরগোড়ায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নিশিকান্ত। ওর পাশে আমি। আমারও দু'পা যেন হঠাৎ আটকে গেছে মাটির সঙ্গে…

দরজাগোড়ায় এসে থমকে দাঁড়াল বজ্রকান্ত।

বাড়িটা নির্বান্ধবপুরী মনে হচ্ছে। লোকজন নেই কেউ। কিন্তু বজ্রকান্ত বাড়ি-ভর্তি লোক। অথচ নিস্তব্ধ নিঝুম। এটা তার ভালো লাগছে না। বাড়ির সঙ্গে তার নাড়ির যোগ। আসাযাওয়া আজ অবধি বন্ধ হয়নি এক-দিনের জন্য, অবিশ্যি অসুখ-বিসুখে ব্যতিক্রম হয়েছে।

আজ সবকিছু নতুন ঠেকছে। বাড়িটাও। বজ্রকান্ত প্রবেশ করল ভেতরে। ঘর ভেতরে মাঝরাত। গোটা বাড়িটা ঘুমিয়ে আছে। সিঁড়ির ধাপে পা রাখল, ওপরে উঠবে। মনে হল, কে যেন পেছনে এসে দাঁড়াল তার। শুধু ঘাড় ফেরাল না বজ্রকান্ত, ডানপাশ বাঁপাশ সামনে—বড় বড় চোখ করে দেখল। কেউ কোথাও নেই। একটা বেড়াল-কুকুর পর্যন্ত চোখে পড়ল না।

ধাপে ধাপে পা ফেলে ওপরে উঠছে। কেবলি মনে হচ্ছে, কেউ না কেউ অনুসরণ করছে তাকে। এমন অনুভূতি এর আগে এ বাড়িতে হয়নি কখনো আর। দোতলার বারান্দায় আসতেই কার যেন দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ শুনল কানে। একটু দাঁড়িয়ে পড়েই, আবার এগোতে লাগল।

বারান্দার শেষের ঘরটার দরজা দু'হাট করে খোলা। প্রদীপ জ্বলছে। আলোটা থর থর করে কাঁপছে হাওয়ায়। ঘরে লোক আছে নিশ্চয়। অন্য কাউকে দরকার নেই। যাকে দরকার—যার জন্য আসা—সারাটা পথ যার মুখ ভেসে উঠেছে—সে থাকলেই হল। সুরমা।

বজ্রকান্তের ধ্যান-জ্ঞান সুরমা। সুরমার আকর্ষণেই বরাবরই আসে। আজও এসেছে। পনেরো থেকে পঁচিশ অবধি সুরমার মুখ তার বুকের তলায়

লুকনো রয়েছে। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সুরমাকে। কুচকুচে কালো চুল খাটের ওপর থেকে লুটোচ্ছে মেঝের। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। বোধহয় ঘুমোচ্ছে। না হলে বেরিয়ে আসত ঘর থেকে তাকে দেখে। হাসতে হাসতে বলত, ও বাড়ির কেউই তো আর আসে না। আমাদের ওপর টান যা তোমারই। এসো এসো —ঘরে এসো !

আরাম কেদারায় বসতে বলে, চুমকিকে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করে বাড়ি মাত করত—নতুন যে কাঁচাগোল্লা আর রাঘবশাহী সন্দেশ এসেছে, ছোটবাবুর জন্য নিয়ে আয় শিগগির। ছোটবাবু যা পরিষ্কার—রেকাবিটা ধুয়ে, ফর্সা কাপড়ে মুছে নিবি।

বজ্রকান্ত এগোচ্ছে পায়ে পায়ে। সুরমা একাই রয়েছে ঘরে। কাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বজ্রকান্ত নিশ্চিন্ত। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। যখুনি এসেছে, কাছে লোক আর লোক। দু'দণ্ড একা পাওয়ার জো নেই। দুটো কথা কইবে যে একান্তে, তাতেও লোকের দৃষ্টি, লোকের কথা !

আজকের মত সুযোগ কোনদিন পায় নি। আনন্দে দু'চোখের পাতা বুজে আসছে। বারান্দার থাম ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোতে ইচ্ছে করছে। একটা ছেলেমানুষি পেয়ে বসেছে। শিকেয় ঝোলানো ছাতার কাপড় ঢাকা ময়নার খাঁচাটাকে নিচে—উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করছে। ময়নাটা ভয় পেয়ে চিৎকার করবে, খাঁচার ভেতরে দাপাদাপি করবে।

আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়ার দড়ি খুলে দিতে ইচ্ছে করছে। কষে চাবুক লাগাবে ঘোড়ার পিঠে। চিঁ-হিঁ-হিঁ করে চার পা তুলে লাফাতে লাফাতে ছুটবে ঘোড়াটা।

ময়না আর ঘোড়া—এরা দুটোতেই বুঝে ফেলেছে হয়তো বজ্রকান্তর মনোভাব। তা নাহলে বারমহল থেকে ঘোড়াটা চিৎকার করে উঠল কেন অমন করে ? মনের ইচ্ছে কি বাতাসে ভেসে বেড়ায় ? এখান থেকে চলে গেছে ওর মনে ! ময়নার খাঁচাটাও বেশ দুলছে। ভেতরে ছটফট করছে ময়না। বজ্রকান্ত আশ্চর্য হয়ে গেল।

তাকাল সুরমার দিকে। ঘুমে অচেতন।

বজ্রকান্ত এসে পড়েছে ঘরের দোরে। চৌকাঠের ওপারে ঘরের ভেতর পা রাখতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হল। বুকের ভেতর গুড় গুড় করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিল। সুরমার জায়গায় বিনয়কৃষ্ণ শুয়ে। দ্রুতপায়ে সরে এলো।

এক মুহূর্ত দাঁড়াতে দিল না তাকে কে যেন। পিঠে ধাক্কা মেরে মেরে সিঁড়ির মুখে নিয়ে গেল। পেছন ফিরে তাকাতে দিল না একবারের জন্য। সিঁড়ি থেকে ঠেলে ঠেলে নামিয়ে দিল। সদরের বাইরে সে বুঝি বার করে দিয়ে নিশ্চিন্ত।

ছোটার মত করেই চলেছে বজ্রকান্ত। তাকে ছোটাচ্ছে কেউ। বুঝতে পারছে কিন্তু করার কোন হাত নেই তার। এক অদৃশ্য হাতের ওপর ভেসে চলেছে যেন

হাঁপিয়ে পড়ছে বজ্রকান্ত। ঘেমে নেয়ে উঠছে। পূর্ণিমার ভরা জ্যোৎস্নায় চৈত্রের দুপুর রোদের তাপ পাচ্ছে সারা দেহে। বুড়ো আঙুলে কপালের ঘাম মুছে ফেলছে। আঙুল থেকে রক্তের ফোঁটা পড়ছে বুঝি টপ টপ করে। নিচের দিকে তাকাল। হাঁ ক'রে ফাটা জমিটা গিলছে তার রক্তের ফোঁটা। কি ভয়ঙ্কর !

ন্যাড়া বাবলা গাছ যেন এক একটা দৈত্যদানা দাঁড়িয়ে। কাটা ধানগাছের গোড়ায় এক একটা মানুষের মুণ্ডু। হাসছে, ব্যঙ্গ করছে বজ্রকান্তকে।—যে সুরমার মুখ তোমায় পাগল করে রেখেছে দিনরাত—তার কাছে যেতে গিয়ে অত ভয় পেলে কেন ? কেন, কেন ?

বজ্রকান্তর মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে। করাত দিয়ে কে চিরছে। চলনবিলের দিকে দৃষ্টি গেল। বর্ষার বিশাল চেহারা হারিয়ে ফেলেছে গ্রীষ্মে। কোথাও ধানজমি, কোথাও অল্পস্বল্প জল। অল্প জলে যেন রক্তের ঢেউ উঠছে। বিরাট ঢেউ। তরতাজা জওয়ানের খুন উপচে-উপচে পড়ছে। ছুটে আসছে এই দিকে। বজ্রকান্তকে ডুবিয়ে মারবে।

দু'চোখ বুজে ফেললে বজ্রকান্ত। তাকাতে পারছে না আর। কি বিভীষিকা ! পা দুটো চলতে চাইছে না। প্রাণপণে টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এখুনি বাড়ি পেঁছুতে না পারলে, জীবনে আর পেঁছুতে পারবে না সে।

বজ্রকান্ত বাড়িতে এলো কোনরকমে। অতিরিক্ত ক্লান্ত। সিঁড়ির রেলিং ধরে ধরে ওপরে উঠল। ঘরে এসে, আছড়ে পড়ল বিছানায়। জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। দরজার দিকে নজর পড়তেই বিনয়কৃষ্ণকে দেখে, চিৎকার করে উঠল।—বেরিয়ে যাও। চোখের সামনে থেকে শিগগির বেরিয়ে যাও !

ছুটে এল রাধামণি। স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বলল, কি বলছ তুমি ? আমি যে --আমি, আমি।

—কে—সুরমা ?

--না, রাধা।

বেহুঁশ হয়ে পড়ল বজ্রকান্ত।

রাধামণির দু'চোখে জল। মাসখানেক হল লোকটা কেমন হয়ে গেছে। প্রায় রাতেই এই চিৎকার। জিজ্ঞেস করলে কিচ্ছু বলে না। চুপ করে থাকে। সুরমার ব্যাপার সবই জানে রাধামণি। সুরমাকে বজ্রকান্ত ভুলতে পারবে না কখনো। থেকে থেকেই সুরমা-সুরমা করে পাগল।

সুরমাকে বহুবার দেখেছে রাধামণি। এখনো দেখে রোজ রাত্তিরে। মরা জ্যোৎস্নায়, ফিনিক ফোটা আলোয় ফিকে অন্ধকারে আর অমাবস্যার পাথর-জমাট আঁধারে। এক এক সময় এক এক মূর্তি।

মূর্তির রকমফের থাকলেও রূপের জলুস কমে না এতটুকু। পৃথিবীর সমস্ত রূপসীর রূপ একসঙ্গে জড়ো হয়েছে সারা দেহ জুড়ে। হিংসে হয়। তবুও সব

মেয়েরই দৃষ্টি ডুবে যায় ওই রূপের দরিয়ায়। মেয়েদের যখন এই অবস্থা, ছেলেদের পাগল হওয়া কিছু অসম্ভব নয়।

বজ্রকান্ত পাগল রাধামণির বিয়ের আগে থেকেই। পাগলামিটা বেড়েছে আরো বিয়ের পর। রাধামণির ভেতরের জ্বলুনিটা তাই সময়-সময় জ্বালিয়েছে যে, নিজের কাছে নিজেকেই অদ্ভুত মনে হয়েছে। একদম ক্ষ্যাপা মানুষ দিনেরাতে ঘুম থাকেনি চোখে। খাওয়ায় অরুচি। গায়ে জল ছোঁয়াতে আতঙ্ক দু'চক্ষের বিষ হয়ে উঠেছে বজ্রকান্ত। আর সুরমা? সুরমা তো আস্ত একটা শয়তানী। স্বামীটাকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে। কেড়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে সুরমা বেঁচে থাকতে রাধামণি সুখী হতে পারবে না। তার স্বামী তার হবে না কখনোই।

খুন করে ফেলতে ইচ্ছে করেছে সুরমাকে। একগাদা ছাইয়ের ওপর রেখে গলায় হেঁসোর কোপ। মাটিতে একফোঁটা রক্ত ঝরে না পড়তে পারে যেন কে বলতে পারে ওর একফোঁটা রক্তে আর একটা দ্বিতীয় সুরমা জন্মাবে না খাটের বাজু ধরে রাধামণি পা রাখল মেঝেয়। জানলায় এসে দাঁড়াল। ঘোড়া পায়ের খুরের খট-খট শব্দ কানে বাজছে। রাধামণি জানে কার ঘোড়া, কে আসছে। সুরমা আসছে ঘোড়ায় চেপে।

স্পষ্ট দেখছ রাধামণি, পেছনে বিনয়কৃষ্ণ বসে। বিষণ্ণ মুখ। বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গেল সুরমা ঘোড়ার লাগাম টানা-ছাড়া করতে করতে কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। খানিক পরে এই রাস্তা দিয়েই ফিরবে আবার—এক ভাবে। যাওয়া-আসার একই ভাব হলেও, মনের পরিবর্তন প্রতিদিন চোখে পড়ে কোনদিন আনমনা, কোনদিন উদাসী। কোনদিন অনুসন্ধানী দৃষ্টি ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। কি একটা খুঁজে বেড়ায়। হয়তো ও সেটা জানে, হয়তো জানে না। নিজের অগোচরে খোঁজাখুঁজি করে মরে।

ঘোড়া থেকে নামে। সেদিন কিন্তু ওর পাশে বা ঘোড়ার পিঠে দেখা যায় বিনয়কৃষ্ণকে, ঘোড়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কি যেন কি বলে ফিস-ফিস করে। ঘোড়াটা কি বোঝে কে জানে! সামনের পা দুটো দিয়ে ঠোক্কর মেরে মেরে মাটি খুঁড়তে থাকে। ল্যাজ নেড়ে নেড়ে মাথা দোলাতে থাকে ডাইনে-বাঁয়ে

ঘোড়ার পিঠে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে সারা হয় সুরমা নিজ মেঠোপথে। এ ব্যাপার কেউ দেখে নি। বজ্রকান্ত দেখে থাকলেও থাকতে পারে অনেকদিন রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে দৌড়ে। তখুনি ফিরে এসেছে আবার ভয়ে মুখের রক্ত সরে গেছে। ধবধবে সাদা কাগজ একখানা।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছে, রাধা! দুঃখীরামকে টানাপাখার দড়িটা এ টানতে বল না। হাওয়া কি কোথাও নেই নাকি? নিশ্বাস নিতে বড্ড হচ্ছে। যমযাতনা সহ্য করতে পারছি না আর। রাস্তার দিকের জানলাটা খোলা রেখেছ কেন? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোকার মত হাঁ করে দেখছ কি? বজ্রকান্তর ব রাধামণির পুরনো ক্ষতের ওপর একটা শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। এ নির্দয় আনন্দ নাচানাচি করে বেড়ায় রক্তে। জানলা বন্ধ করে। সুরমাকে দেখ

চাইছে না আর। ওর দিক থেকে মন সরিয়ে আনতে চাইছে হয়তো। হয়তো সেই আচারীবাবার কথা ফলতে চলেছে হাতে হাতে।

হাত জোড় করে কপালে ঠেকায় রাধামণি। মনে মনে আচারীবাবার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়।

আচারীবাবার এসেছিল এই হিজলগাঁয়ের শ্মশানে। দর্শনের জন্য আর আশীর্বাদ নেয়ার জন্য শ্মশানে মড়া পোড়ানো দায় হয়ে দাঁড়াল। লোকে লোকারণ্য। ঠেলাঠেলির চোটে কত জলজ্যান্ত মানুষ জ্বলন্ত চিতায় পড়ে পুড়ে মরল!

গ্রামের মাথাদের টনক নড়ল। আচারীবাবার সঙ্গে যখন-তখন দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ। তাদের হুকুম না নিয়ে কেউ যেতে পারবে না ওখানে। পাইক-বরকন্দাজের পাহারা পড়ে গেল শ্মশানের চতুর্দিকে।

বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল সাধুর গুণমাহাত্ম্য। আচারীবাবা বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ। মুখে যা বলে, অব্যর্থ ফলে যায়। ওর কৃপাদৃষ্টিতে মনস্কামনা পূর্ণ হতে এতটুকু দেরী হয় না।

শাশুড়ী মহেশ্বরীকে ধরে পড়ল রাধামণি। শ্বশুর শুদ্ধকান্ত মাথাদের মধ্যে একজন। মা যেন বাবাকে বলে-কয়ে সাধুর সঙ্গে দেখা করার দিন স্থির করে দেয় একটা।

মহেশ্বরী রাধামণির আরজি শুনে মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলল, রাস্তা দিয়ে যাবে কেমন করে?

অবাক হয়ে গেল রাধামণি। বড়তরফের কুলের বৌ সুরমা ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে বেড়ায়। প্রজাদের অসুখ-বিসুখে দেখতে যায়, ওষুধ দিতে যায়। কই, কেউ তো বাধা দেয় না! কেন—ভাসুর সুরমার অনুগত বলে? তার পোড়া বরাত সকলে জানে। তাই কি অজুহাতের বেড়া? সে যাচ্ছে কেন—এটা বুঝল না শাশুড়ী। ওরই ছেলেকে ঘরবাসী করে রাখার জন্য। সুরমার কাছ থেকে মনটাকে ছিনিয়ে আনার জন্য। নিজের ঘরের লোকই যদি বৈরী হয়, তাহলে তো রাধামণির অবস্থা—ঘরে থেকে পরবাসী, বল মা তারা দাঁড়াই কোথা!

বৌয়ের মুখ দেখে, মনোভাব আঁচ করেছে কিছুটা শাশুড়ী। কি বলতে যাচ্ছিল, বারান্দায় খড়মের আওয়াজ। কর্তা আসছে। গলা খাঁকারিও শোনা যাচ্ছে বার বার।

মহেশ্বরী চৌকাঠের ওপারে পৌছিয়ে গেল একটু। নথের সোনার টানাটা চুলে চেপে দিল ভালো ক'রে। একগলা ঘোমটা টেনে একটু জোর গলায়—কর্তার কর্ণগোচর হয় যাতে—বলল, ওঁকে তোমার ইচ্ছার কথা জানাব। তোমার ওপর আমাদের সকলের মমতা আছে জেনো। বজ্রর জন্য আমারও কি মনে শান্তি আছে, না কর্তার আছে?

পরের দিন খাবার ঘরে বসে, রুইমাছের চোখ খেতে খেতে হেসে ফেলল শাশুড়ী। বলল, বৌমা, তোমার ঠাকুর সিন্নি খেয়েছে গো! কর্তা রাজী। বাড়ি থেকে শ্মশান অবধি দুদিকে কাপড়ের পরদায় ঘিরে দেয়া হবে। পরদা

ঘেরা গরুর গাড়ি করে শ্মশানে পেঁৗছে দেওয়া হবে তোমাকে। দ্যাখো কি হয়! এখন তো আমাদের ভাগ্যে নয় ও। তোমার ভাগ্যের ওপরই নির্ভর করছে সমস্ত। তোমার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগে কম সাধু-সন্ন্যাসীর পায়ে মাথা খুঁড়ে রক্ত বার করেছি বস্তুর জন্য? কারো তো দয়া হল না।

বংশের কুলজ্যোতিষী দিনক্ষণ দেখে দিল পাঁজিপুঁথি দেখে, অনেক আঁক কষাকষি করে দিনক্ষণ স্থির হল। মঙ্গলে উষা বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা।

তখন ভোরের আলো ফুটেছে সবে। ফাগুনের হাওয়ায় কোকিলের মিষ্টি ডাক শোনা যাচ্ছে। একা কোকিলের নয়, আরো অন্য পাখীরাও গান গাইছে ডালে বসে। লালচে-সবুজ নধর পাতা ঠোকরাচ্ছে লাল-কালো ঠোঁট দিয়ে।

এদিকটায় লোকজন কেউ আসবে না—আগে থাকতে ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে। রাধামণি একা চলছে না। বড়ঘরের মেয়ে বড়ঘরের বউ। পুরোনো ঝি ফুলমালাকে সঙ্গে দিয়েছে শাশুড়ী। রাধামণির পরনে লালপাড় দুধে-গরদের শাড়ী। হাতে চুড়ি-বালা-তাগা। গলায় সাতনরী সোনার গোট হার। কানে কানবালা। নাকে নাকছাবি। পায়ে তোড়া, লাল টকটকে আলতা পরা। ফুল আর ফলে ভরা পেতলের সাজিটা ফুলমালার হাতে।

চলতে চলতে একটা অজানা আনন্দে ভরে উঠছে রাধামণির ভেতর। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কাও আসছে আবার। সাধুর দয়া পাবে বলেই তো আশায় বুক বেঁধে যাচ্ছি, যদি দয়া না হয়!

যাক্ গে, ওসব অশুভ চিন্তা না করাই ভালো শুভ কাজের আশায় বেরিয়ে। দয়া নিশ্চয়ই পাবো। ওরা অন্তর্যামী। মনের ব্যথা তো বুঝতেই পারবে। সাধুর কাছে এলো শ্মশানে।

সামনে একটা চিতা জ্বলছে। মড়ার খুলিতে করে মড়ার মাথার ঘি নিয়ে চিতায় আহুতি দিচ্ছে সাধু। চিতা হোম করছে।

মাটিতে একটা বাঘছাল বিছানো। আচারীবাবা তার ওপর বসে। মাথায় বাঘলোম রঙের জটা। মুখে দাঁড়িগোঁফ ভর্তি। কোমরে লাল কৌপিন।

ফলফুলের সাজিটা ফুলমালার হাত থেকে নিয়ে আচারীবাবার পায়ের কাছে রেখে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল রাধামণি। সেদিকে লক্ষ্য নেই সাধুর। হোম করেই যাছে। বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র উচ্চারণ করছে, রাধামণি একবর্ণও বুঝতে পারছে না।

প্রণামের আশীর্বাদ জানাল না সাধু। রাধামণি দুরু দুরু বুকে বসে বসে আহুতি দেওয়া দেখছে আর মনে মনে প্রার্থনা করছে, সাধুর দয়া হয় যেন তার ওপর। আশীর্বাদ পায় যেন।

হোম শেষে ফিরে তাকাল সাধু। গম্ভীর গলায় বলল, ঠিক সময়েই এসে পড়েছিস। কথা শুনে ধড়ে প্রাণ এলো রাধামণির। আশ্বস্ত হল। বলল, সবই বাবার দয়া।

ছাগল বলির রক্তটা একটা কালো পাথরবাটিতে জমে গেছে একদম। কালচে হয়ে গেছে। কলাপাতার ওপর ভোগের জন্য আধপোড়া মড়ার মাংস—তিন

টুকরো পড়ে রয়েছে। এক একটা টুকরো চাপ রক্তে ডুবিয়ে মড়ার খুলির কারণে ডোবাল সাধু। মুখে পুরে কচমচ করে চিবোতে লাগল। তিনটে টুকরোই এইভাবে মুখে পুরল পরপর।

রাধামণির গা ঘিন ঘিন করছে। বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না মোটে। যে কাজের জন্য এসেছে, এর দ্বারা হবে কিনা কে জানে! দেখেশুনে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম। পালাতে পারলে বাঁচে।

রাধামণি চঞ্চল হয়ে উঠছে। সাধুর চোখ এড়ায়নি। বলল, তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে এমনি এমনি? একটু চুপচাপ বসে থাকতে পারছিস না? আমি এত কষ্ট করে মরছি কার জন্য? তোর শ্বশুরের মুখে শুনেছি সব। বলে, মড়ার খুলির বাকি কারণবারিটুকু ঢক ঢক করে গলায় ঢেলে দিল।

—শোন্, সুরমার ছবি একখানা যোগাড় করে দিতে পারিস? দেখি, কেমন করে ও বাড়ির ত্রিসীমানা মাড়ায় আর বজ্রকান্ত। আচ্ছা, ওই সর্বনাশীকে দুনিয়া থেকে যদি সরিয়ে দিই, তাহলে তো তোর কেল্লা ফতে রে!

সাধুর অট্টহাসিতে শ্মশানভূমি কেঁপে উঠল যেমন, তেমনি রাধামণির বুকের তলায়ও কাঁপন ধরল। এ কঁপন সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। রাধামণি কাঁপা গলায় বলল, ওর কোন অনিষ্ট হোক আমি চাই না। ওর দিক থেকে ওনার মনটা ফিরে আসুক—এইটুকু প্রার্থনা আমার।

বিকৃত গলায় একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠল সাধু। রাধামণির দিকে কটমট করে তাকাল। দাঁতে দাঁতে কড়মড় আওয়াজ তুলে বলল, হুম, বুঝেছি।

সাধুর কোটরে পড়া গোল-গোল লাল করমচা চোখের ধোঁয়াটে তারা দুটো ঘুরতে লাগল। ডাইনে নিচে বাঁয়ে ওপরে।

দেখে দেখে রাধামণির মাথা ঘুরছে। সাধুর তামাটে রং কালো দেখছে।

বটগাছ থেকে বুড়ো শকুনিটা নিচে নামল্। ডানার ঝটপট শব্দে সংবিৎ ফিরে পেল রাধামণি। সাধুর দু'চোখ রাধামণির কপালের সিঁদুরটিপে আটকেছে!

বলল, অমন হয়ে পড়ছিস কেন? একটা নারদভক্তিসূত্রের শ্লোক আওড়াল মুখে।—মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্বা…।

কিছুই বুঝল না। রাধামণি অবাক চোখে তাকিয়ে। ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিল সাধু শ্লোকের মর্ম—

…মহতের কৃপা… সাধুদের কৃপা ভগবানের কৃপারই সামিল। বুঝলি? বুঝিসনি। তোর মুখই বলে দিচ্ছে। যাক, যা বলি শোন্। কাল এই সময় ওর একটা ছবি নিয়ে আসবি। সুরমার যে ছবিটা সব থেকে ভালো—সেইটা। আমার ওপর ভার। যা করার আমি করব। তোর ভাবনার কিছু নেই। ষট্‌কর্মর ক্রিয়া করব। একটাও বাদ দেব না। মারণ উচ্চাটন স্তম্ভন আকর্ষণ বিদ্বেষণ সম্মোহন।

এসব কথা কানে শোনেনি কখনো রাধামণি। না বাপের বাড়িতে, না শ্বশুরবাড়িতে! সাধুর রকমসকমে আর কথাবার্তায় ভীষণ ভয় ধরছে। সুরমার ওপর থেকে মনটা সরিয়ে দিলেই তো বজ্রকান্তকে ফিরে পায় সে। সুরমাকে নিয়ে এত করাকরির কি আছে!

মনের কথা গোপন করেনি রাধামণি, বলেছে। সাধু শুনে আঁকাবাঁকা দাঁত বার করে হেসেছে খানিক। হাসির ধমকে গণেশভুঁড়ির পেটটা নেচে উঠেছে। হাসি থামলে বলল, খুব ভড়কে গেছিস দেখছি। বাড়ি চলে যা! সুরমার কোন খারাপ না হলেই তো হল। কাল ছবিটা আনতে কিন্তু ভুলিস নি।

ছবি চেয়েছে রাধামণি সুরমার কাছে। চিকঢাকা বারান্দায় সতরঞ্চির ওপর পা ছড়িয়ে বসে সুরমা। হাতীর দাঁতের চিরুনি দিয়ে চুমকি চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। উঠল সুরমা। রাধামণিকে ঘরে নিয়ে এসে, দেয়ালে টাঙানো টেবিলে বসানো নানা ভঙ্গীর ছবি দেখিয়ে বলল, যেটা পছন্দ নাও। সাধু বুঝি চেয়েছে? রাধামণি চমকে উঠল। জানল কেমন করে!

—চমকালে কেন ছোটবৌ? ফুলমালা চুমকিকে বলেছে সমস্ত। আর আমি কি তোমার ব্যথা কোথায় জানি না ভাই? আমি চাই তুমি শান্তি পাও। বজ্রঠাকুরের নজর-ধরা হয়ে থাকো। কত বলি, শোনে কই! এখানে আসবেই। এলে, না বসিয়েই বা উপায় কি বল!

যেটা সব চেয়ে বেশী পরিষ্কার ছবি, নিজে টেবিল থেকে তুলে রাধামণির হাতে দিল সুরমা। হেসে বলল, সাধুকে বল না এই কাঁটাটাকে শেষ করে ফেলতে। তাহলে তুমি বাঁচো, বজ্র বাঁচে, আর সত্যি সত্যি আমিও বাঁচি।

—ওকথা মুখে এনো না দিদি।

—আমি তো সব পেয়েছি ছোটবৌ। তুমি যে কিছুই পেলে না। মেয়েছেলের কাছে যে সব ঐশ্বর্যের সেরা ঐশ্বর্য স্বামী—সেই স্বামীই বিমুখ। রূপ আছে, গুণ আছে, তবু বজ্র এমন কেন বুঝি না। বললুম তোমায়, আমার ঘোড়ায় চড়াটা ওর খুব পছন্দ। তুমি শিখে নাও আমার কাছে, তা-ও না। স্বামীর পছন্দই স্ত্রীর পছন্দ হওয়া উচিত। অত লজ্জাবতী হলে চলে নাকি?

—দিদি, তুমি বিশ্বাস কর। ওকে বলেছিলুম। হো-হো করে হেসে উঠল ও। বলল, তোমাকে মানাবে না। সুরমার ভেতরের জিনিস। শিখে নিলে তো নকল হবে। আমার চোখে ভালো লাগবে না মোটে।

একটা দমকা নিশ্বাস ঝরে পড়তে পড়তে সুরমার বুকের কাছে আটকে গেছে। রাধামণির ছলছলে চোখ দেখে দু'চোখে জল ভরে উঠেছে। নিজের সিঁথির সিঁদুর আঙুলে চেপে একটুখানি তুলে নিয়ে রাধামণির সিঁথির সিঁদুরে বুলিয়ে দিয়েছে। চিবুক ধরে আদর করে বসেছে, বোন, বজ্রর সুনজর পড়ুক।

সুরমাদি এ বাড়িতে কতবার এসেছে। যতক্ষণ থেকেছে, কত হাসি কত গল্প। যে-সময়ে বজ্র বাড়ি থাকেনি, সেই সময়েই এসেছে।

ফুলশয্যার রাতে রাধামণির মুখ দেখতে এসে কত আদিখ্যেতাই না করল। নিজের ফুলশয্যায় ভাসুরের দেয়া উপহার মোতির মালা গলা থেকে খুলে পরিয়ে দিয়ে বলল, স্বামী সুখী হও!

সমুদ্রের মত অত বড় হৃদয় না হলে কি কেউ নিজেরটা অপরকে এইভাবে বিলিয়ে দেয় নির্দ্বিধায়?

রাধামণি তখন এ উপহারের মূল্য বোঝেনি। যত দিন গেছে, তত বুঝেছে।

সুরমার মন কত উঁচুতে। সাধারণ মেয়ের প্রকৃতি নয় ওর। সংসার যাত্রার প্রথম দিনে প্রথম সুখের স্মৃতির মধ্যে নিজের সুখকেই দিয়ে গেছে রাধামণিকে চির-সুখী করে তোলার জন্য।

সুরমাকে যখনি-যখনি কাছে পেয়েছে, এক এক সময়ে রাধামণির এক এক রকম মনে হয়েছে। কখনো মা, কখনো বোন, কখনো এত আপনজন পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই আর।

বজ্রকান্ত কি চায় কি পছন্দ করে—পাখী পড়ানোর মত করে বুঝিয়েছে, শিখিয়েছে। স্বামীর মন বসবে ঘরে। বরাত, হল কই! যে তিমিরে সেই তিমিরে।

সুরমাকে চেনা দায়। মুখে বলে এক, কাজে করে এক। বিশ্বাস নেই ওকে। সত্যিসত্যিই যদি কোন সহানুভূতি থাকত রাধামণির ওপর, তাহলে কি বজ্রকান্তকে শাসন করে ও বাড়ি ঢোকা বন্ধ করতে পারত না? গ্রামের অনেকেই অপ্রিয় ওর ওপর। মেয়েছেলে হয়ে পুরুষের মত মালকোঁচা বেঁধে ঘোড়ায় চেপে বসবে। এখন সুরমাই তো ও বাড়ির কর্তা। বিনয়কৃষ্ণ হয়েছে সুরমা, আর সুরমা হয়েছে বিনয়কৃষ্ণ। বিনয়কৃষ্ণকে ঘোড়ার চাবুকে ওঠাচ্ছে বসাচ্ছে চলাচ্ছে ফিরোচ্ছে। চতুর্দিকে ছ্যা ছ্যা।

যুগলকৃষ্ণকে এমন হাত করেছে—সে যে শ্বশুর—নিজের অস্তিত্ব ভুলেছে। বৌয়ের ব্যাপারে বোবা অন্ধ। আর গিন্নী হেমনলিনী থেকেও নেই। তুক-গুণ জানে সুরমা। কুঁড়েঘরের মেয়ে উঠল রাজপ্রাসাদে। ঘুঁটেকুড়ুনি থেকে হল রাজরানী। ধড়িবাজের একখানি। বারো বছর বয়স থেকে খলিফা। ঘোড়াচড়া শেখার নাম করে বিনয়কৃষ্ণকে মুঠোয় পুরল। এখন বিনয়কৃষ্ণের ঘরণী হয়ে নেচে-কুঁদে তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে সারা গাঁও। কেন? প্রজাদের সুখ-দুঃখ দেখেছে, অসুখ-বিসুখে ওষুধ দিয়ে আসছে, খাবার-দাবার দিয়ে আসছে ঘোড়ায় চেপে। বনেদি বংশের মানসম্ভ্রম খুইয়ে, শ্বশুরকুলের মুখে চুনকালি মাখিয়ে, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা হয়ে উঠেছেন উনি।

নিন্দে শুনতে শুনতে রাধামণির কান ঝালাপালা। তালা ধরে যায়। বন্ বন্ করে মাথা ঘুরতে থাকে। ঘর থেকে বারান্দা থেকে ছাদ থেকে ঠাকুরঘরে গিয়ে পালিয়ে বাঁচে। রাধামণির মনে জ্বালা আছে সত্যি। মাঝে মাঝে সুরমারই ওপর ক্ষোভ দুঃখ অভিমান হয়। কিন্তু বেশীক্ষণের জন্য নয়। একটু পরেই মনে হয়, মানুষটা ঠিক মরণবিষ নয়।

সুরমার নিজের হাতে তুলে দেওয়া ছবি নিয়ে গেছে রাধামণি আচারীবাবা সাধুর কাছে। দেওয়ার আগে অনেক ভেবেছে—দেবে না দেবে না। শেষ সিদ্ধান্তে পেঁাছেছে—দেবে। আচারীবাবা বলেছে, সুরমার কোন খারাপ হবে না। আর সুরমারও আন্তরিক ইচ্ছে, বজ্রর মন সরুক তার ওপর থেকে, রাধামণির ওপর দৃষ্টি পড়ুক। ছবি দিলে দোষের কিছু হবে না।

ছবি পাওয়ার পর সাধুর ঘন ঘন আসা-যাওয়া চলল বাড়িতে। বারমহলে বৈঠকখানায় শ্বশুরের কাছে আর অন্দরমহলে শাশুড়ীর কাছে। চুপি চুপি

ফিসফিস কি কথাবার্তা হয় কি শলাপরামর্শ হয়, ওরা ছাড়া কাকে-বকে টের পায় না।

হাঁপিয়ে ওঠে রাধামণি। এমন কি ক্রিয়াকলাপ হচ্ছে যে তাকে গোপন করতে হবে।

তাকে দেখলে আলোচনা বন্ধ সঙ্গে সঙ্গে। শাশুড়ীর থমথমে মুখ, শ্বশুরেরও তাই। সাধুর মুখই ব্যাতিক্রম কেবল। একটা বিচ্ছিরি রকমের হাসি গড়াচ্ছে মুখময়। রাধামণির চোখে চোখ পড়লে, চোখ দুটোও কেমন হয়ে ওঠে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের? না, তা নয়। আনন্দের? তাও না। তবে কিসের?

নিজেকে প্রশ্ন করে করে একটা উত্তরই পায় কেবল। একটা নিষ্ঠুর মানুষ ওই চোখের তারায় ঘোরাফেরা করছে। ওর শান্তি নেই একটা কোন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে না যাওয়া পর্যন্ত।

এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি সামনা-সামনি। দু-বাড়িরই রাস্তাটা খানিক তফাত হলেও, দু-বাড়ির ঘরের ভেতর দেখা যায়। এ বাড়ি থেকে ও বাড়ির, ও বাড়ি থেকে এ বাড়ির। খুব স্পষ্ট না হলেও, মানুষজনের চলা-ফেরা ওঠা-বসা নজরে পড়ে।

এপাশের জানলাটা দিন তিনেক ধরে বন্ধ, সুরমার ঘরের। জানলায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে পা ধরে যাচ্ছে রাধামণির—সুরমার জানলাও খুলছে না, আর সুরমাকেও দেখতে পাওরা যাচ্ছে না অন্য ঘরে।

ঘরে তিষ্ঠতে দিল না রাধামণিকে। ওই বন্ধ জানলার ঘরটা কেবলি ডাকছে তাকে। আয় আয় আয়।

খাবার ঘরে ভাত মুখে তুলতে গিয়ে আরো অস্বস্তি। আলুভাতে দিয়ে গাওয়া ঘি মাখানো ভাতের ডেলাটা গলা ঠেলে বেরিয়ে এলো। ষোড়শ ব্যঞ্জন সাজানো কাঁসার বগিথালাটা হাতে করে ঠেলে দিয়ে আসন ছেড়ে উঠে পড়ল। ওঠার আগে জলের গেলাসে আঙুল ডোবাল একবার। মেঝেয় আসনের পাশে আঙুলে জলের দাগ কেটে বলল, সকলের অনুমতি চাইছি, শরীরটা ভালো নয়।

সকলের দৃষ্টি ফিরল রাধামণির দিকে। মুখে কেউ কিছু বলল না। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। মহেশ্বরী বৌয়ের মুখখানা ভালো করে দেখল। বলল, ঠিক আছে। ফুলমালাকে গিরে বল গে—তোমায় যেন একটু পাতলা করে কাগজিলেবুর রস দিয়ে দইয়ের ঘোল করে দেয়।

ঘোল খেতে ইচ্ছে নেই রাধামণির। সটান চলে গেল সুরমাদের বাড়ি।

সুরমার ঘরের দরজাও বন্ধ। চুমকি এলো রাধামণিকে দেখে। বিমর্ষমুখ। বলল, রানীদির অসুখ। দিন রাত শুয়ে আছে। খাওয়ার রুচি নেই। ঘুমোতে ঘুমোতে উঠে পড়ছে যাই যাই বলে। কাউকে ভাল লাগছে না। রাজাদাকেও না। ছোটরাজাদা এসেছে, দেখা করেনি রানীদি। ছোট বৌরানীদি, কেমন যেন হয়ে গেছে রানীদি—আঁচলে দু'চোখ মুছল চুমকি।

ঘরের ভেতর থেকে ডাকল সুরমা, কে রে চুমকি? ছোটবৌ? দরজা ভেজানো, ভেতরে আসতে বল।

রাধামণি চমকে গেল ঘরে ঢুকে।

দু'তিনদিন দেখা হয় নি, সুরমাদির কি চেহারা হয়ে গেছে! বুড়িয়ে গেছে একদম। মুখের লালরঙের জেল্লা মরেছে।

সুরমার পায়ের কাছে থপাস করে বসে পড়েছে রাধামণি। মুখে কথা সরছে না। চেয়ে আছে।

—অমন হয়ে গেলে কেন ছোটবৌ?

আমার কিছু হয়নি। ভালোই আছি। ঠোঁটের কোণে ম্লানহাসি ফুটে উঠল সুরমার।

রাধামণি বসতে পারছে না স্থির হয়ে। শত বৃশ্চিকের জ্বালা। সুরমার এই অবস্থার জন্য দায়ী সে-ই। নিশ্চয় সাধুর কোন ক্রিয়াকলাপের ফল এটা। কেন মরতে ছবিটা সঁপে দিল হাতে! সাধুর মতলব ভালো ছিল না, গোড়াতেই তো কথাটা ফাঁস হয়ে গেছল।...সুরমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিলে কেল্লা ফতে।

রাধামণির ভেতরটা ডুকরে কেঁদে উঠছে।

একথা কাউকে বলার নয়। শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে গোপন আলাপ-আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে সাধুর ইচ্ছেই ওদের ইচ্ছে। এখন করণীয় কি? কি করে সুরমাকে বাঁচানো যায়? একটা নির্দোষ মানুষ অকালে চলে যাবে, আর তার হেতু হবে রাধামণি—এ হতে পারে না।

সুরমা কি করবে? রাধামণির স্বামীর যদি সুরমা-সুরমা করে পাগল হওয়া ব্যামো হয়ে থাকে, তাহলে কি সুরমার দোষ? নিজের ঘর ঠিক নয় যেখানে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বরাত ফেরানো যায় না। মায়ের মুখে তো এই কথা শুনেছে বরাবর। মা বলে, শত্রুরও অনিষ্টচিন্তা না করলে, সে-ও মিত্র হয়ে ওঠে একসময়। সকলের শুভচিন্তা করলে, সকলের মঙ্গলের সঙ্গে নিজেরও মঙ্গল হবে আপনা হতেই।

রাধামণি ভুল করেছে। অনুতাপ-অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছে। বসে থাকতে পারল না। সাধুর এই সুরমা-মারণযজ্ঞ বন্ধ করে দিতে হবে এই মুহূর্তে। খাট থেকে নেমে পড়ল রাধামণি। দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সুরমার ডাক কানে গেল না।

বাড়ীতে এসে বলেছে শাশুড়িকে।—দু'সারি কাপড়ের পরদার ব্যবস্থা করা হোক এখুনি। সাধুর কাছে যাবে। তার ক্রিয়াকলাপের ফল ফলেছে। আনন্দ-সংবাদ জানাতে যাবে সে নিজেই।

বৌয়ের কথামতো মহেশ্বরী ব্যবস্থা করেছে সমস্ত।

রাধামণিকে দেখে আচারীবাবা সাধু আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠল। মড়ার খুলিতে কারণবারি পান করছিল, একনিশ্বাসে শেষ করে ফেলল। বলল, বস্, বস্। সুখবর আছে। তোর মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

দেখছে সাধুকে রাধামণি একদৃষ্টে।

নিজের কৃতিত্বের কথা গড় গড় ক'রে বলে চলেছে সাধু। —মারণ আর

আকর্ষণ—দু'টোই ফলবতী হয়েছে। তোর ভাগ্য ভালো। আমার ক্রিয়াকলাপ জ্যান্ত, বুঝলি? সুরমাকে কাবু করে এনেছি। রাতে ঘুমোতে দিই না, ওকে ডাকি। চিতার আগুনে দেখি ও জ্বলছে দাউ দাউ করে। ও স্বপ্ন দেখবে, প্রকৃত জ্বলার জ্বালা অনুভব করবে। ঘুমোতে ঘুমোতে ডাক শুনবে। কে ডাকছে ওকে। থামল সাধু।

রাধামণি শিউরে উঠল। সর্বনেশে কাণ্ড।

রাধামণির মুখ থেকে কোন কথা শোনার আশায় চুপ করে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত সাধু। বিফল হয়ে প্রশ্ন করল, আমি তো খবর পেয়েছি ও অসুস্থ। তুই কিছু জানিস না?

চুমকি বলেছে রাধামণিকে, রানীদি ঘুমোতে ঘুমোতে উঠে পড়ছে যাই-যাই বলে। সুরমাদি ভাঙল না, বলল,…কিচ্ছু হয়নি, ভালোই আছি। সুরমাদি এত ভালো—তাকে সহ্য করতে পারে না অনেকে। সেই অনেকের দলে রাধামণিও। কিন্তু সুরমাদি আগুনের জ্বালা তার জন্য নির্বিবাদে মুখ বুজে সহ্য ক'রে, দধীচির মত উৎসর্গ করে যাবে নিজেকে—কোনমতেই সহ্য করতে পারবে না রাধামণি।

রাধামণি বলল, আপনি কথা দিয়েছিলেন কি? বলেন নি—সুরমাদির কোন খারাপ হবে না?

—হেকিমের ওরকম সান্ত্বনা দিতে হয় রুগীকে। যা করছি, তোর ভালোর জন্যই করছি জানবি।

উত্তেজনায় গলা কাঁপছে রাধামণির।—আমার স্বামী যেমন আছে, থাক। কিছু করতে হবে না আপনাকে। ছবি ফিরিয়ে দিন! দিন বলছি!

রাধামণির ঠাণ্ডা মূর্তি নেই আর। আগুনের হলকা ছুটছে দু'চোখ দিয়ে। হকচকিয়ে গেছে সাধু। এরকম হবে আশা করতে পারেনি। সামনে যাকে দেখছে, সে রাধামণি, না রণরঙ্গিনী শ্মশানকালী, না সাধনায় দেবীদর্শনের আগে মিথ্যে বিভীষিকা!

মাথাটার মধ্যে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সাধুর। দেখছে, দেবী চিতার আগুনে সামনের বড় গামলা থেকে আঁজলা আঁজলা জল নিয়ে চিতায় দিচ্ছে। সংকল্প ভঙ্গ, ক্রিয়াভঙ্গ।

শ্মশানের ঈশানকোণে বাঁশঝাড়ের কাছে মড়াখেকো কুকুরটা গুটিসুটি হয়ে শুয়ে ছিল এতক্ষণ, একদিকে শকুনি আর একদিকে চিলের ঠোঁটের ঠোক্করে কেঁও কেঁও কাতর আর্তনাদ করে উঠল।

সাধুর স্বপ্ন ভাঙল। আর্তনাদের মতই বলে উঠল সাধু, একি করলি! সব পণ্ড করে দিলি! বলির রক্তে শেষ হোম করব—তার বদলে জল!

রাধামণি কেমন হয়ে গেছে। আঁজলার বদলে মড়ার খুলি করে জল তুলছে আর চিতায় ঢালছে। মুখে একই কথা—ছবি ফেরৎ দিন ছবি ফেরৎ দিন, ছবি ফেরৎ দিন!

রাধামণির পায়ের কাছে ছবিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সাধু। পায়ে ঠেকেছে।

রাধামণি মাথায় ঠেকিয়ে, বুকে চেপে ধরল ছবিটা।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়েছে, একটু শান্ত হয়েছে। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে, মাথা নুইয়ে প্রণাম করল রাধামণি সাধুকে। এ রাধামণি আলাদা। বলল, বাবা! আমায় ক্ষমা করুন।

—অদ্ভুত মেয়ে! নিজের ভালো নিজে হাতে ভেঙে ফেললি রে। এমন পাগল তো দেখিনি কোথাও! তোর ওপর আমার আশীর্বাদ রইল—বজ্রকান্তর মন ফিরবে তোর দিকে।

মাথার ওপর কে যেন ভর করেছিল, সারা দেহেও বুঝিবা। কি শক্তির নাচুনি রাধামণির ভেতরে! একটা যুদ্ধ মেতে উঠেছিল যেন। প্রলয় নেমে এসেছিল হয়তো এই শ্মশানে কিছুক্ষণের জন্য।

রাধামণি ক্লান্ত-অবসন্ন। ধীর পায়ে পরদা ঘেরা রাস্তায় নামল।

সে-রাতে ঘুমোতে ঘুমোতে যাই যাই বলে আর উঠে বসেনি সুরমা। নির্বিঘ্নে রাত কেটেছে ঘুমের ঘোরে।

চেহারার কালো ছোপ মুছেছে সকালে। গোলাপী মুখে দ্বিগুণ জেল্লা। চিকন কালো ভুরুর তলায় কাজলতারা প্রাণ-খোলা হাসি হাসছে। এলোচুল লুটোচ্ছে খাটে। তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে সুরমা। ফলসা রঙের চওড়া জরিপাড় শাড়ী পরনে। আঁচলে রুপোর চেনে বাঁধা একগোছা চাবি। হাতে লাল চুনী বসানো মকরমুখো সোনার বালা। কানে কানপাশা, গলায় মটরমালা।

গয়না বেশী পরতে ভালোবাসে না সুরমা। নেহাত না পরলে নয়, আর তাছাড়া হেমনলিনীর চক্ষু সর্বদিকে। ঘরের-বৌ সাদাসাপটা থাকলে, তার আবার মনখারাপ। কাজে কাজেই শাশুড়ীর আদেশ শিরোধার্য করতে হয় বই কি সুরমাকে মাঝে-মধ্যে। বালা ছেড়ে মানতাসা, মানতাসা-ছেড়ে রতনচূড়। মটরমালা ছেড়ে গিনির মালা, আবার গিনির মালা ছেড়ে জড়োয়ার চিক। পায়ে তোড়া ছেড়ে পাঁইজোর। কানপাশা ছেড়ে কানবালা মাকড়ি কান দুল ফুল। পুরনো-নতুন কত না গয়না গায়ে তুলতে হয়। নানা জাতের রঙ-বেরঙের শাড়ী-ব্লাউজও পরতে হবে। আজ যেটা দেহ ছুঁল, কাল সেটা নয়, এ-বেলারটা ও-বেলা চলবে না।

রাধামণিকে দেখে, সুর ক'রে গেয়ে উঠল সুরমা, প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ হেরিনু, দিন যাবে আজি ভালো।

—তুমি সুস্থ থাকো, ভাল থাকো সুরমাদি! আঁচল ঢাকা ছবিটা বার করে সুরমার হাতে দিল রাধামণি।

খাট থেকে নেমে বুকে চেপে ধরেছে রাধামণিকে সুরমা।—ঘুম হচ্ছিল না বুঝি? তুমি ছাড়া বজ্রঠাকুরের মনে আর কারো স্থান যেন না হয়।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে সুরমা চিবুকে তর্জনী বুলোতে বুলোতে কি যেন ভাবল। আলমারী খুলল। একটা ছোট্ট রুপোর কৌটো বার করে রাধামণির হাতে দিয়ে বলল, দোব দোব করে দেওয়া আর হয় না। তোমার নাম করে মদনমোহনের পায়ে থাকে থাকে বেলফুল চড়িয়ে যাচ্ছি আর ভাবছি, বজ্রঠাকুরের

মনের পরিবর্তন হোক। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক। ফুল সাজানোর শেষে মদনমোহনের মুখে-চোখে হাসি ফুটে উঠতে দেখলুম যেন। কষ্টিপাথরের মূর্তি নরম-নধর হয়ে উঠল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সাজানো ফুলের সবার ওপরের ফুলটা ঠিকরে এসে একেবারে হাতের ওপর আমার। মদনমোহনের আশীর্বাদী। শোয়ার ঘরের তাকে যত্ন করে রেখে দিও!

এসব রাধামণির জীবনে অতীতের স্বপ্ন। স্বপ্ন এই জন্য—সত্যি হলেও স্বপ্নের মতই তো হয়ে গেছে সমস্ত। এখনো তাকে তোলা সেই রূপোর কৌটো। ধূনোর ধোঁয়া লাগায় রোজ সকাল-সাঁঝে। ক'বছর ধরেই তো চলেছে। এতদিনে এতদিনে তবে সত্যিই কৌটোর ফুলের ফল আর সাধুর কথা ফলল?

রাস্তার জানলা রাধামণি খোলা রাখে কেন—বন্ধ করতে বলছে বজ্রকান্ত। রাস্তা দিয়ে যায় ঘোড়ায় চেপে সুরমা। জানলায় দাঁড়িয়ে দেখতে আর চাইছে না, বোধ হয় ইচ্ছেও করছে না, তাই বন্ধ করে রাখার নির্দেশ।

খুশীমনে জানলার ধারে আসতেই, ধারণা পালটাল। ঘোড়ায় একা নয় সুরমা। পেছনে বসে আছে ভাসুর। বিনয়কৃষ্ণ।

মানুষটা কেন বন্ধ করতে বলছে—বুঝতে আর বাকি নেই রাধামণির।

বিনয়কৃষ্ণকে দেখতে চায় না মোটে। সহ্য করতে পারে না। দেখলে কেমন হয়ে যায়। সমস্ত স্নায়ু অবশ। বুকের ভেতর ধড়ফড় করে। মুখখানা যেন মরা মানুষের মুখ হয়ে ওঠে।

ভাবতেও রাধামণির সর্বশরীর হিম হয়ে আসে। স্বামীর কথা ছেড়ে দিলে, সুরমাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে তার মন; সুরমার জন্য একটা নিদারুণ ব্যথা কুরে কুরে খেতে থাকে ভেতরে। এ ব্যথা উপশমের কোন অব্যর্থ ওষুধ নেই। ত্রিভুবন খুঁজে বেড়ালেও মিলবে না। রাধামণির চোখের জল উপচে-উপচে পড়ছে। বুক ভেসে যাচ্ছে।

যতদূর চোখ যায়, ততদূর দেখছে চেয়ে চেয়ে রাধামণি। সুরমার ঘোড়া ছুটছে। ছুটছে ছুটছে। খুরের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে। ঘোড়াটাকেও আবছা-আবছা দেখা যাচ্ছে। শব্দ শুনতে পাচ্ছে না আর। ঘোড়াটাও অদৃশ্য হয়ে গেছে দৃষ্টি থেকে। খড়খড়ির পাল্লা দুটো আস্তে আস্তে টেনে দিল রাধামণি।

জানলায় দাঁড়ানো আর সুরমাকে দেখার নেশা যাওয়া তো দূরের কথা, দিন দিন বেড়েই চলল বজ্রকান্তর। নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখেছে নির্জনে, এক ঘরে বসে বসে। বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে আরো—সারাজীবনের সঙ্গী এটা। মৃত্যুর আগে অবধি যাওয়ার নয়।

জানলায় দাঁড়াবনা ভাবে। খুলবে না, বন্ধ করে রাখবে। কিন্তু কার্যগতিকে উল্টোদিকে উজান বইতে থাকে।

ঘোড়ার খুরের খটখট আওয়াজ বাতাসে ভেসে এলেই, তড়াক করে লাফিয়ে পড়ে খাট থেকে। জানলার ধারে এসে দাঁড়ায়। বন্ধ জানলার পাল্লা দু'টো ছিটকিনি খুলে দু'দিকে সরিয়ে দেয়।

বাইরের বাতাস টেনে নেয় খানিক বুক ভরে। মনে হয় বন্দীদশা ঘুচল বুঝি। সে মুক্ত বিহঙ্গের মত মুক্ত। দু'হাতে জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। অধীর প্রতীক্ষা। সামনে দিয়ে যেতে এত দেরী কেন? পেছন দিক দিয়ে চলে যাবে না তো আবার?

শব্দ এগিয়ে আসে, এগিয়ে আসে সুরমার অপরূপ মূর্তি। প্রতিদিন একবার করে সুরমাদের বাড়িতে যাওয়া চাই বজ্রকান্তর। চোখের দেখা দেখেও আসে। আদর-আপ্যায়নের কোন ত্রুটি নেই সুরমার। ঠিক আগেকার মত। বরং এখন বেশী। দেখা আদর পাওয়া সত্ত্বেও, ঘোড়ার পিঠের সুরমা অন্য। বিশেষ করে রাত্তিরে। সে কিবা জ্যোৎস্নায় কিবা আলো-আঁধারিতে কিবা অন্ধকার রাতে কিবা আকাশ-আলোয়। ওর রূপ যেন ফেটে পড়ে। ত্রিভুবন ভোলানো ভুবনমোহিনী!

চোখের পিপাসা মেটে না দেখে দেখে। অঝোর ঝরে বৃষ্টি পড়ছে। সন্ধ্যের পর থেকে মুষলধারে নেমেছে। জলের ঝাপটা আসছে খোলা জানলায়। সর্বাঙ্গ ভিজে যাচ্ছে। তবু দাঁড়িয়ে আছে বজ্রকান্ত।

এ ব্যাপারে রাধামণি মৌন একেবারে। নীরব সাক্ষীর ভূমিকা তার। এ নিয়ে স্বামীর সঙ্গে বাদপ্রতিবাদ করেনি কোনদিন। করার প্রবৃত্তিও হয়নি তার, হয়ও না। মানুষটার ভেতরে একটা কষ্ট—বোঝে। বুঝলেও লাঘব করার উপায় কোথায়?

যখন দেখে, বজ্রকান্ত সুরমার অদর্শনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চলেছে অনবরত, তখন রাধামণিরও চোখ ফেটে জল আসে। না দেখতে পেয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। আজো স্বামীর পাঞ্জাবি-ধুতি ভিজে সপসপে হয়ে যাচ্ছে দেখে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ঠাকুরঘরে লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্তির কাছে গিয়ে প্রার্থনা করল, ওকে শান্তি দাও তুমি।

ঝড়জল মাথায় করেও ঘোড়ায় চেপে আসছে সুরমা।

মুগ্ধ নয়নে দেখছে বজ্রকান্ত।

সোনার প্রতিমা তার ঘরেই উঠত। উঠল না বিনয়কৃষ্ণের জন্য। কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল। এ বংশের কেউ নয় ও, এ বংশের একফোঁটা রক্ত ওর শরীরে নেই, ভিন্ন বংশের ভিন্ন রক্তের। জেঠিমার জিদে রাত দিন হয়ে গেল, দিন রাত হয়ে গেল।

আজ ও-বাড়ির বিষয়-সম্পত্তি, এমনকি সুরমাও তো তার হক-প্রাপ্য। সবেতে বঞ্চিত হল বজ্রকান্ত। নিঃসন্তান জ্যাঠামশাই তাকেই তো দত্তক নেবে বলেছিল, জেঠিমার সায় ছিল তখন।

বজ্রকান্ত প্রায়ই দিনরাত থাকত ও বাড়িতে—জেঠিমার কি যত্ন কি আদর। গলায় ঢুকছে না, বেরিয়ে আসছে, তবুও ক্ষীর ছানা ননী মুখে ঠেসে দিত

জেঠিমা। বলত, তুই তো সাক্ষাৎ মদনগোপাল—মদনমোহন।

দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে রাঁধুনি বামুন কালীকিঙ্কর। জোরে জোরে নিশ্বাস ফেল বুক খালি ক'রে ক'রে। বড় হয়ে মর্মে মর্মে অনুভব করেছে। তখন বোঝাবার বয়স ছিল না। মাত্র ছয়। দোরাত্ম্যে বাড়ি মাত করে রাখত। জেঠিমার ভয়ে বকতে বা মারধোর করতে সাহস করত না কেউ।

সে-সময় চুমকির মা ভাঁড়ারী। আমের দিন, আম খেতে খেতে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেছে। আমের আঁটি চুষছে। রসে মুখ হাত মাখামাখি। কনুই গড়িয়ে রস পড়ছে মেঝেয় টপ টপ করে।

চুমকির মা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। চিৎকার করে বলল, লক্ষ্মীর ভাঁড়ার এঁটো হয়ে যাবে যে সব। কি দস্যি ছেলে, আবার ছুঁতে আসছে! চুমকির মা মুখরা ভীষণ, কাউকে ভয়ডর করে না, মুখে যা আসে, বলে বসে। বলল, পাজী নচ্ছার। যাওনা, নিজেদের বাড়ীতে গিয়ে এসব নষ্টামি করগে না। এখানে জ্বালাতে এসেছ কেন?

ভেতরের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল জেঠিমা। চুমকির মায়ের কথা কানে গেল। জেঠিমার গলা এমনিতেই বেশ ভারী-ভারী। ঘোমটাটা মুখের কাছে বাঁপাশে টেনে ধরে ভারী গলায় জোরে জোরে বলল, কাকে কি বলছিস চুমকির মা? এ বাড়ি ওরই জানবি। ভবিষ্যতে ওই ছেলেই মালিক হবে। সাবধান করে দিচ্ছি। ফের যেন এরকম কথা কোনদিন না শুনি।

সেদিনও কালীকিঙ্কর জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলেছে ভাঁড়ার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে, আর একদৃষ্টে চেয়ে থেকেছে তার দিকে।

এরপর হঠাৎ-ই একদিন আবির্ভাব হল বিনয়কৃষ্ণর বাড়িতে।

কালীকিঙ্করের স্ত্রী চোখের জলে ভাসতে ভাসতে এসে হাজির হল। বন্যায় দেশ ভেসে গেছে, তাই আগমন। সঙ্গে বছর আষ্টেকের একটি ফুটফুটে ছেলে। কালীকিঙ্কর হাত ধরে নিয়ে এলো জেঠিমার ঘরে। ছেলেকে বলল, প্রণাম কর। মেঝেয় শীতলপাটির ওপর বসেছিল জেঠিমা।

পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করল ছেলে। কালীকিঙ্কর হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। কথা বেরোচ্ছে না, গলা ধরে গেছে। খানিক কেঁদে ধরাগলায় জেঠিমাকে বলল, রানীমা, আপনি অন্নপূর্ণা। আমি তো পথের ভিখিরী হলুম। সর্বস্বান্ত হলুম। যেটুকু আর ছিলুম, সেটুকুও বানের জলে ভেসে গেছে। বাড়ি-ঘর ধসে গেছে, আমাদের ঠাঁই যদি না দেন মা, ছেলেটাকে চরণে ঠাঁই দিন, মরেও সুখ আমাদের।

কালীকিঙ্করের কি কান্না, থামার নাম নেই। কালীকিঙ্করের স্ত্রীও কেঁদে সারা। চুমকি আর চুমকির মায়েরও চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। ছেলেটাও মা-বাবার কান্না দেখে ফোঁপাচ্ছে।

জেঠিমার চোখে কান্নার বন্যা নামল হু-হু করে। ছেলেটাকে কোলে টেনে নিল।

বজ্রকান্ত অভিমানে, রাগে ঠোঁট ফোলাতে লাগল। কারো লক্ষ্য নেই তার

ওপর। সকলেরই এদিকে লক্ষ্য। ছেলেটার ওপর। ওর জন্য সবার চোখে জল আসছে। কেউ তাকাচ্ছে না, কেউ কাঁদছে না তার জন্য। মনে হয়েছে ওই ছেলে তার দুশমন। জেঠিমার কোল দখল করল। ঘুষি মেরে ওর নাক ভোঁতা করে দেবে। চোখে আঙুল দিয়ে, চোখ গেলে দেব। অন্ধ হয়ে যাবে।

কিচ্ছু করতে পারেনি বজ্রকান্ত। কতদিন চেষ্টা করেছে। দু'জনে মারপিট হয়েছে অনেক। দাঁতের কামড়ে নখের আঁচড়ে দু'জনেরই সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরেছে। এই পর্যন্ত। বজ্রকান্ত ইচ্ছে পূরণ করতে পারেনি নিজেই। সেই আপসোসেই মনোবেদনার অন্ত ছিল ছিল না।

এক এক সময় ছেলেটাকে নিয়ে কি উল্লাস বাড়িসুদ্ধ লোকের! বজ্রকান্তর গা চিড়বিড় করে ওঠে। জ্বালা ধরে। সমস্ত গায়ে কে যেন জলবিছুটি ঘষে দিচ্ছে।

ছেলেটা এসে অবধি যাওয়ার নাম নেই কোন চুলোয়। পাঁচ বছর ধরে রয়েই গেছে বাড়িতে। জেঠিমা ওকে ছাড়বে না বলেছে। লেখাপড়া আর ঘোড়ায় চড়ানো শেখানো নিয়ে জ্যাঠা-জেঠি উঠে-পড়ে লেগেছে। ছেলের শিবশঙ্কর নাম পাল্টে বিনয়কৃষ্ণ রাখা হ'ল। জেঠিমারই দেওয়া নাম এটা।

হাড়পিত্তি জ্বলে যায় রকমসকমে। আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে যেন ওরা। বিনয়কৃষ্ণকে যত্ন করে করেও আশ মিটছে না। এ বাড়ির ওই-ই সব। বজ্রকান্ত কেউ নয়। জেঠিমার কাছে অচেনা যখন, সকলের কাছে কোন পাত্তা পায় না তাই। চতুর্দিকে অবহেলা আর অনাদর।

গলা টিপে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে বিনয়কৃষ্ণকে। ভয়ে পেছিয়ে আসে। হু বার পরখ হয়ে গেছে লড়ে। অসুরের বল ওর দেহে। ওকে কিছু না করতে পেরে, যারা ওকে নিয়ে এত নাচানাচি করছে, সেই জ্যাঠা-জেঠির ওপর প্রতিশোধ নবার জন্য বিদ্রোহী মন অস্থির হয়ে পড়েছে।

শোয়ার ঘরে ঢুকে দেখেছে, নেই কেউ। পা টিপে টিপে পাথরের টেবিলটার াছে এসে দাঁড়িয়েছে। কাঁচের ফ্রেমে আঁটা জ্যাঠা-জেঠির ছবি বসানো গায়ে য়ে। ঝপ করে দু'হাতে তুলে দিল দুটো ছবি। জানলা গলিয়ে ছুঁড়ে ফেলে উঠোনে। শান বাঁধানো উঠোনে ঝনঝন আওয়াজ উঠল। ঘর থেকে লাতে যাচ্ছে বজ্রকান্ত, ধরা পড়ল। এদিকে আসছিল, দেখে ফেলেছে কির মা।

ছ'বছর বয়সে চুমকির মা-র মুখে যে কথা শুনেছে বজ্রকান্ত, তখন অবিশ্যি তার পক্ষ নিয়ে প্রতিবাদ করেছে, আজ প্রতিবাদ করার কেউ নেই, নিজেই বলল সেই কথা।—পাজী নচ্ছার! যাও না, নিজের বাড়িতে য় এসব নষ্টামি করগেনা! এখানে জ্বালাতে এসেছ কেন?

মাথা নিচু করে বাড়ি ফিরেছে বজ্রকান্ত। বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে মুখ কয়েছে বালিশে। কেঁদে কেঁদে দু'চোখ ফুলে উঠেছে।

মা এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে। কি হয়েছে—বজ্রকান্তকে মুখ ফুটে হয় নি কিছু। আর জিজ্ঞেস করলেও নিজের এত বড় অপমানের কথা ত পারত না। মরে গেলেও না। লজ্জায় মাথা কাটা গেছে এমনিতেই।

এ বাড়ির কথা ও বাড়িতে আর ও বাড়ির কথা এ বাড়িতে হাওয়ায় ভেসে আসা· যাওয়া করে। কানে কানে মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়। প্রথম কানাকানি শুরু হতে থাকে দু'বাড়ির দুটি ঝিয়ের মুখ থেকে। চুমকির মুখ থেকে কানে পৌঁছয় ফুলমালার, আর ফুলমালার মুখ থেকে চুমকির কানে। কানাকানি না হওয়া পর্যন্ত ওদের দু'জনের পেটের ভাত হজম হয় না।

ফুলমালার মুখেই মা শুনেছে সব। সান্ত্বনার সুরে তাকে বোঝাল, রাগ করে নিজের দাবি নিজের দখল ছাড়া, বোকামি। যা হওয়ার হয়ে গেছে। অমন কত কি ঘটে, রটে। গায়ে মাখলে চলে না। মন থেকে ঝেড়েমুছে ফেলে দিতে হয়। বিষয়ী ঘরের ছেলে, ঝড়ঝাপটা পোহাত হবে অনেক। মন শক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। এই বয়সই ভিত তৈরীর বয়স।

জেঠিমার মুখ দেখতে ইচ্ছে করছে না, বাড়ি যাওয়া তো দূরের কথা! মা শুনে বলেছে, এ-বংশের কেউ নয়, সে ওই সম্পত্তির মালিক হবে, সহ্য করা যায় না। ধীরে ধীরে বিনয়কৃষ্ণকে হটাতে হবে ওখান থেকে তোমাকেই। তুমি জানতে দেবে না বিনয়ের ওপর অসন্তুষ্ট। ভেতরে যাই থাকুক, মুখে হাসবে কথা কইবে ভদ্রতা বজায় রাখবে। নিজের বাপ-ঠাকুরদার দেখেছি এ জিনিস। শ্বশুর-স্বামীরও দেখেছি। তোমার গায়ে এদের রক্ত বইছে। বংশের ধারা বাঁচিয়ে রাখা মস্ত বড় ধর্ম—মস্ত বড় কর্তব্য।

ও বাড়িতে আবার যাতায়াত শুরু করে দিয়েছে বজ্রকান্ত। জেঠিমার কোলের কাছে বিনয়কৃষ্ণের গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে গল্প শোনে। বিনয়কৃষ্ণ হাসলে বজ্রকান্তর না হাসি পেলেও, জোর করে হেসে ওঠে।

চুমকির মাকে দেখলেই বলে, তোর শরীরটা ভেঙে যাচ্ছে যে রে। নিজের দিকে নজর দে একটু। এসব অবিশ্যি বাবার কাছে বৈঠকখানায় বসে বসে পাঁচজনের কোন আচার-ব্যবহারে কে খুশী হচ্ছে—সে মোটা মানুষকে রোগা বলে মিথ্যে বললেও—রপ্ত করেছে। কাজে লাগাচ্ছে।

বজ্রকান্তর সহানুভূতিতে চুমকির মা গলে গেল পড়ল একেবারে। হেসে বলল কি আর বলব খোকারাজা! তোমাদের সবার মুখ দেখতে দেখতে যেতে পারলে বাঁচি। মদনমোহনকে সাঁঝসকালে জানাই তাই। মুখখানা বড্ড শুকিয়ে গেছে খোকারাজা। রাঘবশাহী ভালোবাসো ভুমি। দু'খানা নিয়ে আসি। আর গরুর বাঁট থেকে দোয়া দুধ—এইমাত্র দোয়া হল—গরম-গরম এক গেলাস।

মিথ্যে ছলনা আর পাটোয়ারী বুদ্ধিতে কি কারো মন সত্যিসত্যি পাওয়া যায়? কেউ পায় কিনা জানে না বজ্রকান্ত। তবে সে পেল কই? মোক্ষম বঞ্চিত হয়েছে সব দিক দিয়ে। বিয়ের আগে সুরমাকে কত না বুঝিয়েছে বিনয়কৃষ্ণ এ-বংশের কেউ নয়। একটা রাঁধুনিবামুনের ছেলের সঙ্গে—

—আমিও তো গরীব বিধবা বামনির মেয়ে। কোন্ রাজপুত্তুর নেবে বল? বলেই ফিক করে হেসে ফেলেছে সুরমা।

—কেন— আমার মা-বাবা তোর মাকে ডেকে বলেনি? কত বলছে।

—রাজী হবে কি করে বল—একটা ভয়তো রয়েছে! তোমাদের বিরাট নামডাক। আমাকে নিয়ে তোমাদের জ্ঞাতিস্বজনের সঙ্গে মনকষাকষিটা কি ভালো?

—সে আমরা বুঝতুম। তোর অত মাথাব্যথা কেন?

—মাথাব্যথা আছে বৈকি, আমি চাই না আমাকে নিয়ে কারো অশান্তি হোক কারো জীবন নষ্ট হোক।

—এসব বাজে বড় বড় বুলি ছাড়। এখনো সময় আছে, তোর মাকে বলে রাজী করা। বাবা তো বলেই দিয়েছে, পাকা বাড়ি বানিয়ে দেবে। ছেঁচা বেড়ার ঘরখানা তো নড়বড় করছে। কবে না কবে মাটি নেয়। খোলার চালে তো সহস্র ফুটো। তোর মায়ের দেমাক কত—শ্বশুরের ভিটে, এই আমার স্বর্গ। বৌ হয়ে ঢুকেছি, মা হয়ে বেঁচে আছি, এই ভিটের মাটিতে প্রাণ বেরোয় যেন। হ্যাঁ, প্রাণই বেরোবে। যে আশা করেছে তোর মা, সে আশা মিটবে না। গাড়ি বাড়ি হবে ভেবেছে, তা আর হচ্ছে না। মরার সময় মুখে জল পড়বে না বলে দিলুম। জ্যাঠাকে চিনতে বাকি এখনো! কাজের সময় মুখ মিষ্টি। এক পয়সায় মরে বাঁচে।

বিরক্ত হয়ে উঠেছে সুরমা। গম্ভীর মুখে ঝাঁঝালো স্বরে বলেছে, তুমি না পুরুষমানুষ? মেয়েদের মত এত ইনিয়ে-বিনিয়ে বলতে লজ্জা করছে না? মা যা বুঝেছে, করেছে, করছে। আমি যা বুঝেছি, করেছি, করছি। অনেক বার তোমাকে বলেছি, আমাদের কোন ব্যাপারে নাক গলাবে না। বজ্রকান্তকে উত্তরের কোন সুযোগ না দিয়েই চলে গেছে সুরমা তুলসীতলা থেকে।

অপলকে তাকিয়ে থেকেছে বজ্রকান্ত তুলসীমঞ্চের দিকে। সুরমা জেবলে দিয়ে গেছে ছোট্ট মাটির প্রদীপ। কতক্ষণ জ্বলবে? যতক্ষণ তেল। তাও নয়। জোরে হাওয়া বইলে নিভবে এখুনি। আর তা না হলে, খানিক পরে আপনা হতেই।

জ্যাঠার শরীর খারাপ। দু-দুবার মরতে মরতে বেঁচেছে। কিন্তু কতদিন আর? তারপর তারই সমস্ত। দোতলার মার্বেল পাথরের ঘরে রানী হওয়া সুরমার দুদিনের। প্রদীপের কাছে এসে দাঁড়াল বজ্রকান্ত। নিভছে না, বেশ জোরে জ্বলছে। হাওয়া তেমন নেই। নেভা না দেখে যেতে ইচ্ছে করছে না। নিশ্চিত হতে পারছে না। ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল।

মানুষের ক্ষোভ দম্ভ যেখানে প্রতি পদে পদে পরাজিত, সেখানে এইভাবেই নিজের পরিতৃপ্তি নিজের শান্তি খোঁজে মানুষ। এটা আলেয়া দেখার মত মনের বিভ্রান্তি কতকটা, নিজের অক্ষমতাকে ঢাকার মিথ্যে প্রয়াস। ভেতরের শূন্য জায়গাটায় ক্ষণিকের জন্য মনগড়া নগণ্য চিন্তার একটা প্রলেপ মাত্র।

বজ্রকান্ত জানে সমস্ত, ও সম্পত্তি ফিরে আসার কোন উপায় নেই আর।

উকিল-মোক্তার ডেকে, সইসাবুদ শেষ। জ্যাঠা দত্তক নিয়েছে বিনয়কৃষ্ণকে। বাবার কথায় ক্ষেপে উঠে তিনদিনও তর সইল না। গ্রামময় ঢাক পিছিয়ে লোকজন খাইয়ে বিনয়কৃষ্ণ লোকচক্ষে সমাজচক্ষে যুগলকৃষ্ণের বংশধর নামে

পরিচিত হয়ে উঠল।

এত তাড়াতাড়ি দত্তক নেয়ার মূলে বাবার অপরাধ—বাবা বলেছিল, তোমার যদি সুরমাকে ঘরের বৌ করে আনার এতই ইচ্ছে, বজ্রের সঙ্গেই তো বিয়ে দিলে পার। বামুনের ছেলেটার চাল নেই চুলো নেই, বৌ নিয়ে রাখবে কোথায়?

—কেন—আমার বাড়িতে থাকবে।

—তুমি যত দিন আছ, না হয় রইল, পরে?

—পরেও থাকবে।

—পরেও! অন্তহীন বিস্ময়ে গলার স্বর জমাট হয়ে উঠেছে বাবার। একটু থেমে বলেছে, তোমার মত ভালোমানুষ পেয়ে বিনয় তো মাথায় উঠে নাচছে। ঘোড়া ছাড়া বাবুর ভুঁয়ে পা পড়ে না। রাঁধুনি বামুনের ছেলের নবাবি বলিহারি। কথায় বলে না, আদেখলার ঘটি হ'ল, জল খেয়ে খেয়ে পেট ফুলল। এতখানি অন্যায় তোমার সহ্য করার ক্ষমতা আছে ভাই। আমি পারব না এসব বেয়াদপি বরদাস্ত করতে। আর তাছাড়া বজ্র জোয়ান ছেলে, ও কি এটাকে প্রশ্রয় দেবে? বুঝতেই তো পারছে রক্তগরমের বয়েস।

—বুঝেছি। দেখি, কি করা যায়। বলে, বাইরের ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে জ্যাঠা। বাগানে ঢুকে পায়চারি করছে। ভুলুদাস ডান হাতে গড়গড়া বাঁ হাতে নলটা ধরে পাশে পাশে চলেছে। পুরনো দিনের চাকর। মালিকের কখন মেজাজ চড়া কখন মেজাজ নরম—হাড়হদ্দ জানা তার। সবে বিষ্ণুপুরের তামাকের মৌতাত লেগেছে রাজাবাবার। নলটা ঠোঁটে চেপে ধরেছে বার চারেক। তারপরই মুখ-নাক দিয়ে ধোঁয়া বার করতে করতে ফরাশ পাতা তক্তপোশ থেকে উঠে পড়ল। মুখখানা লাল থমথমে।

ভুলুদাস ছোট তালপাতার পাখায় বাতাস করছিল ধীরে ধীরে। কলকের আগুন ঠিক থাকে যাতে। জ্যাঠার মুখে আগুনে মেঘ দেখে হৃৎকম্প তার। তবে সে জানে, এ অবস্থায় নলটা আবার মুখে ধরিয়ে দিতে পারলে চড়া থেকে খাদে নামবে মেজাজ।

ভুলুদাস মহা মুশকিলে পড়েছে। জ্যাঠা মুখও ফেরাচ্ছে না, তাকাচ্ছেও না তার দিকে। এমন চিন্তা এর আগে দেখেনি কখনো। আকাশ-পাতাল কি এত চিন্তা বুঝে উঠতে পারছে না ভুলুদাস।

বুঝল জ্যাঠার কথা কানে যেতে—অ্যাঁ, আমি মলে তো এখান থেকে বিনয়-কৃষ্ণকে তাড়িয়ে দেবে বাপ-বেটা! মানুষের জীবনের কোন ভরসা নেই—যা শরীর।

শুধু ভুলুদাস কেন—গাঁওসুদ্ধ সকলেই জানতে পারল দু'দিন না যেতে যেতেই। বিনয়কৃষ্ণের ভবিষ্যৎ আর বজ্রকান্তর ভবিষ্যৎ। বিনয়কৃষ্ণ ওবাড়ির সর্বেসর্বা আর বজ্রকান্ত কেউ নয়।

বজ্রকান্ত বাড়ির কেউ নয়, সুরমারও কেউ নয়। তবুও মরীচিকার হাতছানি দেখে। পাগল হয়ে ওঠে। মনে হয়, তার হকের ধন মারে কে? একদিন না একদিন তার কব্জায় আসবেই ও-বাড়ি—ও-বাড়ির সব কিছু। ভেতরটায়

হাহাকার করে যখন, তখুনি মরীচিকার ছায়া। মিলোলেই আবার হাহাকার।

সুরমার বিয়ে হয়ে গেল ধুমধাম করে। এমন ঘটা গাঁয়ে-ঘরের আদ্যিকালের বদ্যিবুড়োরাও দেখেনি। ভৈরবীরাগিণী শুরু হয়েছে নহবতে ভোর হতে না হতেই। দিনের যখন যা রাগরাগিণী সে-সময় সে-সুর বেজে সন্ধ্যেয় পুরবীতে শেষ হয়েছে। পাঁচদিন ধরে সুরের রাজ্য ভেসে বেড়িয়েছে গাঁয়ের আকাশে-বাতাসে। প্রায় সকলের মুখে একই কথা—স্বর্গ দেখেনি কেউ, স্বর্গ বলে যদি কোন জায়গা থাকে, সে এখানে—এই গাঁয়ে।

খাওয়া-দাওয়ার এলাহি ব্যাপার। পাঁচদিন তো গাঁয়ে কারো ঘরে হাঁড়ি চাপেনি উনুনে। ছেলেবুড়ো সব বয়সীরই নেমন্তন্ন যুগলকৃষ্ণর বাড়ি।

বজ্রকান্তর বাবা শুদ্ধকান্ত তো রেগে আগুন। নিজের লোকেদের কাছে নিজের প্রজাদের কাছে বলে বেড়িয়েছে, যুগলদার সব তাতে বাড়াবাড়ি। লিখে-পড়ে পুষ্যিপুত্তুর নিয়েও এত ভয় কেন বুঝি না। হৈ-হল্লা করে—এত টাকার অপচয় ক'রে, গ্রামসুদ্ধ লোককে ডেকে খাইয়ে সাক্ষী করে রাখার কোন মানে হয়! পরগোত্র নয়, এক রক্ত এক গোত্র—একেবারে নিজের জেঠতুতো ভাই। বুকের ভেতর কর কর করে। বাপ-ঠাকুরদা কি বংশের কারো বিয়ে-থা দেয়নি নাকি? তাবলে এমনতর কাণ্ড একটা! ভিখিরী বললেও, অন্যায় কিছু বলা হবে না—একটা রাঁধুনি বামুনের ছেলের জন্য! দেখাল বটে!

বাবা যাই বলুক না কেন, বজ্রকান্তর ভেতরটা শূন্য হয়ে গেছে একদম। বিনয়কৃষ্ণর কাছে হেরে গেল সে। ছ'বছর বয়স থেকেই হারছে। পনেরো বছর বয়স থেকে সুরমাকে হারানোর খেলা শুরু হয়ে গেল। চলল দুষ্টগ্রহের সঙ্গে লড়ালড়ি। বিনয়কৃষ্ণই তার দুষ্টগ্রহ, তার জীবনের রাহু-শনি।

বিনয়কৃষ্ণর ঘোড়ায় চড়া দেখে ছেঁচাবেড়ার ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না সুরমা। বারো বছরের সুরমা বাইশের বল ধরে দৌড়ে আসত। টুকটুকে ছোট ছোট হাত বাড়িয়ে দিত বিনয়কৃষ্ণর দিকে। ঘোড়ার পিঠে তুলে নেবে। তুলে নিয়েছে বিনয়কৃষ্ণ। সামনে বসিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেছে বজ্রকান্তর চোখে ধুলো উড়িয়ে দিয়ে।

নিজের নিশ্বাসের আওয়াজে চন্দ্রকান্ত নিজেই চমকে উঠেছে। নিশ্বাসে একটা জাতকেউটের ফোঁস ফোঁস আওয়াজ যেন। একটা জাঁতাকল হৃৎপিণ্ডটাকে পিষছে। ঘোড়ায় চড়া শিখবে। ঘোড়ায় চড়া শেখার জন্য সুরমার ওদিকে আকর্ষণ। কিন্তু শিখবে কেমন করে? জ্যোতিষীর বারণ। পঁচিশ অবধি ফাঁড়া। মারাত্মক আঘাত লাগা—জীবন সংশয়—কিছু অসম্ভব নয়। বরং ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা নিশ্চিত।

বাবার সঙ্গে অনেক জেদাজেদি হয়েছে শেখা নিয়ে। বাবার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। কিছুতেই না, যা হবে, পঁচিশের পর।

তার আগেই তো সুখের ভিত ফেটে চৌচির। পঁচিশে পড়তে আর হল না। তার বছর আষ্টেক আগেই, সতেরোয়—সুরমাকে পাওয়ার আশা জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গেল। পঞ্চদশী সুরমা লাল বেনারসী পরে সোনা-জহরতে মোড়া

গায়ে জ্যাঠামশাইয়ের ঠাকুরঘরে মদনমোহনকে প্রণাম করল বিনয়কৃষ্ণর সঙ্গে। বিনয়কৃষ্ণর জীবনসঙ্গিনী সুরমার মাথায় মদনমোহনের চরণ-তুলসী ছুঁইয়ে আশীর্বাদ করল জেঠিমা।—সিঁথির সিঁদুর বজায় থাকুক, হাতের লোহা অক্ষয় হোক।

বিয়ের পর সুরমার কি যত্ন! বজ্রকান্ত যাব না যাব না মনে করেও নিজের অগোচরেই গিয়ে পড়েছে ও-বাড়িতে। সুরমা থালাভর্তি নানারকমের মিষ্টি এনে, নিজে বসে খাইয়েছে। হাসতে হাসতে গল্প করেছে কত। অন্যমূর্তি একেবারে। বিয়ের আগের দিন অবধি কি ঘেন্না! দেখেই বলেছে, তোমাকে আমার পুরুষমানুষ মনে হয় না। মনে হয় আমার মত একটা মেয়েছেলে তুমি। পুরুষমানুষ কাকে বলে বিনয়দাকে দেখে শেখো। কিরকম ঘোড়া দৌড় করায় বল তো! কিরকম শক্তি শরীরের, কিরকম সাহস!

বাবার ওপর রাগ ধরেছে বজ্রকান্তর। বাবার যত গোঁড়ামি! জ্যোতিষীর কথায় তাকে ভীতু করে রেখে দিল, তার জীবনটা বরবাদ করে দিল। মনে মনে জ্যোতিষীর মুণ্ডুপাত করেছে আর বিনয়কৃষ্ণর বুকের ওপর বাসিহাজরার নাচ নেচে-নেচে হাড়পাঁজরা গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

বাসিহাজরার নাচ দেখেছে শিবের গাজনে। চৈত্রসংক্রান্তির পরদিন।

আগের সন্ধ্যেয় জঙ্গলের ভেতর মাটির বেদিটার ওপর হরগৌরীর পুজো হল। এক অঙ্গে দুটি রূপ! ডানদিকে হর, বাঁদিকে গৌরী। ডাকের সাজে সাজানো মূর্তির অঙ্গ দিয়ে বিদ্যুতের ছটা ঠিকরে পড়ছে।

তিন দিন ধরে উপোসী-ব্রতী লোকটার পুজো দেখতে দেখতে ধ্যানতন্ময় দেহটা থর থর করে উঠল। ভক্তরা সমস্বরে বলে উঠল, শিব এসো, গৌরী এসো। উপোসীর হৃদয় মাঝারে।

দুলছে উপোসী-ব্রতী। আদুড় গায়ে কৌপিন পরা জোয়ানের দুলুনির গতি ক্রমশ বাড়ছে। পুরোহিত গৌরীর পায়ের জবাফুলটা মাথায় বুলিয়ে দিয়ে ব্রতীর মুখে ঠেকিয়ে রেখে দিল।

মেলা দেখে, পুজো দেখে যে যার ডেরায় গিয়ে উঠেছে। উঠল না একজন ব্রতী। সারারাত একাসনে বসে বসে নিজেকেই শিবদুর্গা ভেবেছে মনে মনে। ডান অঙ্গ শিব, বাঁ অঙ্গ দুর্গা।

ভোরে ভক্ত-পুজারীর দল আর পুরোহিত এসে হাজির। পুরোহিত পুজোর প্রসাদীফুল দুহাতে ভরে নিয়ে ব্রতীর মাথায় ছড়িয়ে দিল। একটা ফুল ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিল। ব্রতীর সর্বশরীর ভয়ানক কেঁপে উঠল। যেন একটা প্রবল শক্তি বয়ে গেল ওর শিরা-উপশিরার ভেতর দিয়ে। বুকটা ফুলে উঠল চতুর্গুণ, সেই সঙ্গে সমস্ত অঙ্গ। ওকে বিরাট দেখাচ্ছে। ঢাকের পিঠে কাঠি পড়ল। উন্মাদনার বাজনা উন্মত্ত নৃত্যের বাজনা বেজে উঠল বনভূমি কাঁপিয়ে। কাঁপছে মেলার দোকানপসারী ক্রেতা-বিক্রেতা আগন্তুক-দর্শক। কাঁপুক—এ কাঁপার মধ্যে একটা অব্যক্ত আনন্দ থরে থরে সাজানো। চামড়ার তলায় তলায় আনন্দ চোঁয়াচ্ছে। মনে হচ্ছে এ আনন্দের ভাগ সকলকে দিলেও অফুরন্ত থেকে যাবে।

এর শেষবেশ নেই।

বজ্রকান্তর এ আনন্দেও বিষাদের ছায়া নেমে এলো।

দূরে ঘোড়ার পিঠে বসে দু'জনে। বিনয়কৃষ্ণ আর সুরমা। দু'জনে হেসে কুটিকুটি তাকে দেখে। বেহায়া আর কাকে বলে! বাসিহাজরার নাচ দেখতে এসেছে ওরা তার মত। এই উপোসী ব্রতীর বাসিহাজরা। নাচবে।

ঢাকের তালে তালে দুলতে লাগল বাসিহাজরা। বসে বসেই নাচছে যেন। উঠল আসন ছেড়ে নাচের ভঙ্গীতে। দু'চোখ খুলে তাকাল বড় বড় করে। রক্তজবা চোখ।

নাচতে নাচতে বেরিয়ে আসছে জঙ্গলের ভেতর থেকে। কি নাচ! হিমালয়ের চুড়ো খসে পড়ে বুঝি। কি শক্তি! সামনে যে কেউ পড়বে, হাড়গোড় ভেঙে দ হয়ে যাবে। মাটি থেকে লাফিয়ে উঠছে শূন্যে, শূন্য থেকে লাফিয়ে পড়ছে আকাশ-মাটি জুড়ে নাচ চলছে বাসিহাজরার।

লোকে মুগ্ধ, লোকে তটস্থ।

নাচতে নাচতে এগোচ্ছে নদীর দিকে। যেখানে ঝাঁপিয়ে পড়বে নদীর জলে। শক্তসমর্থ জোয়ানরা জলের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে গোল হয়ে।

নাচতে নাচতে বাসিহাজরা ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলের ওপর। ধরে রাখতে পারে না বিশটা জোয়ান। একজন ঠোঁটের তলায় ফুলটা আঙুল দিয়ে টেনে বার করে নিল। সঙ্গে সঙ্গে বাসিহাজরা নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। বেহুঁশ হয়ে গেছে।

বজ্রকান্ত সকলের অলক্ষ্যে শিবদুর্গার প্রসাদীফুল লুকিয়ে মুঠোয় পুরেছে। বাড়ি ফিরে মুখে পুরেছে। মনে মনে ভেবেছে, সে বাসিহাজরা। নাচছে। নাচতে নাচতে বিনয়কৃষ্ণর বাড়ি গেছে। বিনয়কৃষ্ণর বুকের ওপর নাচছে। কল্পনা কল্পনাই থেকেছে। চোখ খুলে দেখেছে, খাটে যেমন পা ঝুলিয়ে বসেছিল, তেমনি বসেই আছে। বাসিহাজরার মত তার দেহে কোন শক্তির আবির্ভাব হয়নি। আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে নিজেকে। যেমন তেমনই আছে। সেই ছত্রিশ ইঞ্চি ছাতি। সেই মাঝারি গড়ন। খুব লম্বাও নয়, খুব বেঁটেও নয়। তার কিচ্ছু হবে না। কিচ্ছু হতে পারল না সে। না বিনয়কৃষ্ণ, না বাসিহাজরা। সুরমার মন টানবে কি দিয়ে?

ভালো লাগে সুরমার শেল-বেঁধানো ভর্ৎসনা। ভালো লাগে ওর ঘোড়ায় চড়া। সব ভালো লাগার জলাঞ্জলি হয়ে গেল সুরমা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায়।

সুরমাই উঠিপড়ি চেষ্টা করে বিয়ের কথা পেড়েছিল মায়ের কাছে— লক্ষ্মীমন্ত পছন্দসই মেয়ে রাধামণি। মুচকি হেসে বজ্রকান্তকে বলেছে, বজ্রঠাকুর, মাথায় জল দেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে এবার। একটা দজ্জালনীকে দিয়ে তোমার কি করি দ্যাখো না। সদাই রুষ্ট, তুষ্ট হতে আর দেখলুম না। এইবার বুঝবে 'খন।

—কোন দজ্জালনীই ঢিট করতে পারবে না আমায় বৌঠান। একজনই পারত—

খিলখিল করে হেসে উঠেছে সুরমা। বলেছে, তোমার দাদার জলখাবারটা

পাঠিয়ে দি। আমি হাতে করে না দিলে, ওর আবার খেয়ে তৃপ্তি হয় না। এখুনি আবার বেরোতে হবে দু'জনকে। চাষীপাড়ায় বড্ড জ্বরজ্বালা শুরু হয়েছে। ওষুধ নিয়ে যেতে হবে আমাদের।

সদর থেকে বেরোনোর মুখে দাঁড়িয়ে পড়েছে বজ্রকান্ত। ঘোড়ার পিঠে সুরমা-বিনয়কৃষ্ণ। খট খট খুরের শব্দ তুলে ছুটল সাদা ঘোড়াটা।

মনে হল, তার বুকখানা ঘোড়ার লোহার খুরে চিরে-ফুঁড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল।

শয়তান বিনয়কৃষ্ণটাকে—ছুটে গিয়ে, ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে, ঘাড় ধরে মুখ গুঁজরে মাটিতে ফেলে দিতে ইচ্ছে করেছে। সুরমাকে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বিনয়কৃষ্ণকে ঘোড়ার পায়ের তলায় থেঁতলে দিয়ে পিষে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে ইচ্ছে করেছে।

বজ্রকান্তর সর্বক্ষেত্রেই ফাঁকা ইচ্ছেটা সম্বল হয়ে ওঠে। ওই পর্যন্ত। বেশীদূর গড়ায় না। নাগালের বাইরে, ক্ষমতার বাইরে। কবে ইচ্ছেপূরণ হবে—

ঘোড়া থেকে পড়ে অপঘাতে মরবে কবে বিনয়কৃষ্ণ! কবে, কবে?

বজ্রকান্তর আগের সতেরো বছর পেরিয়ে গেছে অনেকদিন। সতেরোয় আট বছর যোগ হয়ে পঁচিশে পেঁছেছে। এখনো দেখে সুরমাকে। ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছে। ওকে একা ভালো লাগে। ছুটে যেতে ইচ্ছে করে কাছে। হাত ধরে নামিয়ে নিয়ে এসে দুটো কথা কইবে একান্তে।

সুরমা তার কাছে এখনো সেই ছোটবেলার সুরমা। বিয়েতেও ছাদনাতলায় শুভদৃষ্টির—চারচোখে চাওয়াচায়ির সময় রাধামণির মুখে সুরমারই মুখ দেখেছে সে। এখনো রাধামণিকে দেখলেই সুরমাকে দেখে। রাধামণি তার মনের জগতে মৃত।

জানলার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে বজ্রকান্ত। সুরমাকে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে চলে যেতে দেখেছে ওদিকে। তবু দাঁড়িয়ে রয়েছে, আসবে আবার এই পথ দিয়েই। না দেখে জানালার ধার থেকে এক পা-ও সরবে না বজ্রকান্ত।

ঘরে ঢুকেছে পা টিপে টিপে রাধামণি। স্বামীকে এখনো একভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক। কাছে যেতে গিয়ে থমকাল। ঘরে একজন ঢুকেছে, মানুষটার সাড়া নেই। ভিজে সপসপে হয়ে গেছে।

কালো মেঘ ঘন ঘন নীল বিদ্যুতের আলো চমকে চমকে উঠছে। বৃষ্টির গতি বাড়ছে। ঝমঝম আওয়াজটা বিশ গুণ জোরে শোনাচ্ছে। মেঘের গুড় গুড় শব্দে বুকের ভেতর গুড় গুড় করে উঠছে রাধামণির। বুক কাঁপছে, বাড়ি কাঁপছে, ঘরখানা বড্ড বেশী কাঁপছে।

বজ্রকান্ত এতটুকুও কাঁপছে না। গোটা দেহটা ধীর-স্থির। একটা পাথরের মূর্তি। খানিক তফাতে পেছনে দাঁড়িয়ে রাধামণি। রাধামণি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে বাইরে একটা বাতাস ঘুরছে বোঁ-বোঁ করে গোল হয়ে। ঠিক জানলার রুজু-রুজু। জামগাছের তালগাছের মাথা ঘুরিয়ে মুচড়ে দিচ্ছে।

একটা অজানা ভয় রাধামণিকে পেয়ে বসেছে। রাতটা কি ভয়ানক হয়ে

উঠেছে ! কি নির্মম হয়ে উঠছে !

অপলক চোখে দেখছে বজ্রকান্ত ।

ফিরে আসছে সুরমা । ঝড়বৃষ্টিতে ঝাপসা ঝাপসা দেখছে । বজ্রকান্ত পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না । ঘোড়াটা কি যেন শুঁকছে । কখনো মুখ উঁচু করে, কখনো মুখ নীচু করে । ভীষণ অস্থির । আসতে আসতে পেছন ঘুরে আবার ছুটল । আবার আসছে আবার ছুটছে । ঘোড়াটা মাথা দোলাচ্ছে এদিক-ওদিক ।

মেঘের আকাশ ফাটানো কড় কড় শব্দে বাজ পড়ল দূরে । চোখ-ধাঁধানো আলোয় আলো হয়ে উঠল পথ ঘাট বন । বুকের রক্ত হিম হয়ে এলো বজ্রকান্তর । সুরমা আসছে, পেছনে বসে বিনয়কৃষ্ণ ।

জানলার ধার থেকে ছিটকে এসে পড়ল বজ্রকান্ত বিছানায় । চিৎকার করে উঠল, জানলা বন্ধ কর, জানলা বন্ধ কর ।

রাধামণি বন্ধ করে দিল জানলা । স্বামী ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে ।

রাধামণি জড়িয়ে ধরল ।

জড়ানো গলায় বজ্রকান্ত বলল, কে—সুরমা ?

সুরমা যা খোঁজে তা পায় না । এ খোঁজার অন্ত নেই তার !

প্রতিদিনের মত আজো ভাবছে । প্রদীপের সলতে উসকে দিয়ে গেল চুমকি । সন্ধ্যে নেমেছে । দুচোখের পাতা ঘুমে ভারী হয়ে উঠছে । এসময়ে এই রকমই হয় রোজ । এত আলস্য জড়িয়ে ধরে, ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে । মাসখানেক ধরে এই ব্যামো ধরেছে তার ।

চুমকি ডাক্তার-কবিরাজ দেখাতে বলে । সুরমা রাজী হয় না । বলে, তুই এত ভাবিস কেন ? ভয় নেই, সহজে মরব না আমি । অদৃষ্টে দুর্ভোগের শেষ নেই রে আমার । বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়ে সুরমা ।

ঘুমোচ্ছে । ঘোড়াটা বারমহলের আস্তাবল থেকে ডেকে উঠল । ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল সুরমা । দুহাতে দুচোখ রগড়ে নিয়ে নামল খাট থেকে ।

ছেলেদের মত মালকোঁচা বেঁধে কাপড় পরল । নেমে গেল নিচে তর তর করে । চুমকি বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছে সমস্ত । দুচোখের জলে ভেসে যাচ্ছে বুক । এ দৃশ্য দেখছে সে নতুন নয় । দেখে প্রতিদিন । রানীদির ভরসন্ধ্যেয় ঘুম, ঘোড়ায় চিঁ-হিঁ-হিঁতে উঠে পড়া, কাপড় পরা, তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া । আস্তাবলে গিয়ে ঘোড়াটাকে বার করে পিঠে মুখ ঘষবে খানিক । তারপর চেপে বসবে । জঙ্গলের দিকে যাবে ।

চুমকি জানলায় এসে দাঁড়িয়েছে । কালকের মত আজ আর আকাশে ঘনঘটা নেই । বোঝাই যায় না দুর্যোগের রাত গেছে কাল । আকাশের নীলে জ্যোৎস্নার ঝলমল ।

চুমকির চোখ ছাপিয়ে গাল বেয়ে জল গড়াচ্ছে । আঁচলে থুপে থুপে মুছে

নিচ্ছে আর দেখছে। যতটুকু দেখা যায়। একটু পরে, সুরমা দৃষ্টির বাইরে চলে যাবে। আবার আসবে, আবার চলে যাবে। আবার আসবে, আবার চলে যাবে। কিছুক্ষণ চলবে এই আসা-যাওয়াটা টানা-পোড়েন পর্ব। তারপর হতাশায় ভেঙে পড়ে, বাড়ি ফিরে বিছানায় ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে কেঁদে কেঁদে বালিশ ভেজাবে।

এ মর্মান্তিক যাতনা দেখা যায় না। চুমকি ঘরে গেলে বলে সুরমা, আমার কাছে আসবি না, একা থাকতে দে আমাকে।

সুরমার ঘোড়াটা মিলিয়ে গেল চুমকির চোখ থেকে। তবু চুমকি দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে থাকবেও বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত।

আজ থেকে একমাস আগে, সেটাও পূর্ণিমার সন্ধ্যে। চুমকির মত জানালায় দাঁড়িয়ে সুরমা। ঘোড়া ফিরে আসার খট খট আওয়াজ শুনে রান্নাঘর থেকে দৌড়ে এলো রোজের মত। বামুনঠাকুর কড়ায় ঘি চাপিয়েছে, বিনয়কৃষ্ণ এসে খাবে। লুচি বেলছিল।

সন্ধ্যের মুখে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ে সুরমা। সেই থেকে আজ অবধি ওই সময়ে সে-ঘুমের ব্যতিক্রম হয়নি একদিনের জন্য। একটু পরে ঘুম ভাঙতেই কেঁদে উঠল। চুমকিকে বলল, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে রে চুমকি।

চুমকি হতভম্ব। শুয়ে বসে ঘুমিয়ে সর্বনাশ দেখল কোত্থেকে! মাথা-টাথা খারাপ হল নাকি? এরকম তো বলেনি কখনো। এমন করে কাঁদেনি কখনো।

চুমকিকে জিজ্ঞেস করতে হয়নি—কেন এমন বলছো? সুরমা নিজেই বলে।

—একি স্বপ্ন না সত্যি রে চুমকি? কি দেখলুম আমি?

জানালায় এসে রাস্তা দেখেছে। বিছানায় ফিরে এসে বসেছে আবার। বলেছে, আমি যেন পরিষ্কার দেখলুম ওকে। স্পষ্ট শুনলুম ঘোড়ার চিৎকার, কি বীভৎস! ঘাড়ের কাছটা দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরোচ্ছে ওর। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে একটু। মুখে কথা নেই, আমার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। চোখ দুটো কি করুণ।

এ স্বপ্ন দেখলুম কেন?

কাজল চোখের কানায় কানায় জল টলমল করছে সুরমার। হু-হু করে বইতে শুরু করল।

—রানীদি, কেন মিথ্যে মিথ্যে অমঙ্গল চিন্তা করছো রাজাদার? স্বপ্ন কারো ফলতে তো দেখিনি আমি।

—স্বপ্নে যা দেখলুম, ঘুম ভেঙেও তাই দেখলুম যে আবার। ও দাঁড়িয়ে। দুচোখে কি যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। নিজে ঘুমিয়ে আছি, কি জেগে—পরখ করার জন্য ঘড়িটার দিকে তাকালুম। সাড়ে ছ-টা। টক টক আওয়াজ কান পেতে শুনলুম ভালো করে। আমি ঠিকই দেখছি, ঠিকই শুনছি। ওকেও ঠিকই দেখছি। ও বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এলুম দালানে। কোথাও নেই। বুকটা ধড়াস-ধড়াস করে উঠেছে।

—ওসব কিচ্ছু নয় রানীদি। তুমি ঠাণ্ডা হও। মদনমোহনের ঘরে গিয়ে একটু বস দিকিনি। ধুলরচাষীর বৌয়ের খুব অসুখ, রাজাদা ফেরার সময় দেখে, ওষুধ দিয়ে আসবে বলে গেছে। একটু দেরী হচ্ছে ওই জন্য।

অস্থির পায়ে জানলায় এসে দাঁড়িয়েছে সুরমা। দেখছে। ঘোড়াটা একা আসছে। ঘোড়ার পিঠের মানুষ নেই। সুরমার বুকে-গলায় অসহ্য যন্ত্রণা ডেলা বেঁধে আটেকে গেছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট, নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট।

নিচে নেমে এলো, পেছু পেছু নেমে এলো চুমকিও।

যা দেখল, সুরমাকে সামলাবে কি, চুমকির নিজেরই মাথা ঘুরে উঠল। ঘোড়ার পিঠে চাপ চাপ জমাট রক্ত।

দেখে অজ্ঞান হয়ে গেছে সুরমা।

জ্ঞান হতে কেবলি দেখেছে, বিনয়কৃষ্ণ তার সামনে দাঁড়িয়ে। অস্পষ্ট, খানিক দূরে। যেদিকেই তাকিয়েছে, সেইদিকেই দেখেছে। তাকে ঘিরে রয়েছে যেন ও। তিনদিন ধরে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বিনয়কৃষ্ণর লাশ পাওয়া যায়নি। চতুর্থদিন চলনবিল থেকে পাওয়া গেল। হেঁসোর কোপ শুধু ঘাড়ে নয়, সর্বাঙ্গে। জলে ফুলে ঢোল, বিকৃত হয়ে গেছে।

দেখে, সুরমার দু'চোখের জল শুকিয়ে গেছে। মৃতদেহটাকে দেখতে দেখতে মানুষটাকেই দেখেছে দাঁড়িয়ে থাকতে।

শ্বশুর চলে যেতে বিনয়কৃষ্ণর ভার সুরমার হাতে ছেড়ে দিয়ে কাশীবাসী হয়েছে শাশুড়ী। যাওয়ার সময় বলে গেছে, বিনয়ের শত্রু অনেক। সাবধানে থেকো, সাবধানে রেখো ওকে! সাবধানে রাখতে হল না আর। সব শেষ হয়ে গেল।

প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সুরমা হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কোন সন্ধান পেল না খুনীর। সন্দেহের পাহাড় গড়ে উঠেছে মনে। কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না, সকলকেই মনে হয়েছে খুনী। বিনয়কৃষ্ণকে ষড়যন্ত্র করে খুন করেছে।

ওবাড়ির খুড়শ্বশুর ওবাড়ির খুড়শাশুড়ী। ওদের প্রজারা, আর প্রজাদের মাথা বজ্রকান্ত। বজ্রকান্তকে সন্দেহ করলেও, সে-সন্দেহ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে হাওয়ায় মিশিয়ে যায় তখুনি।

বজ্রকান্তর দ্বারা একাজ অসম্ভব। ও ভীতু কাপুরুষ। কোন হিম্মতের পরিচয় পায়নি ওর কাছ থেকে কোন সময়। বিনয়কৃষ্ণ নৃশংসভাবে খুন হওয়ায় ও তো কেঁদে কেঁদে পাগলের মত হয়ে গেছে। প্রতিদিন অন্তত একবার করে না এসে পারে না এ বাড়িতে।

কালাপাড় ধুতিপরা নিরাভরণা সুরমাকে দেখে, চেয়ে থাকতে পারে না, চোখ ফিরিয়ে নেয়। উঠে চলে যায় মুহূর্তের মধ্যে কথা-বার্তা না কয়ে। বজ্রকান্তও গাঁয়ের বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করে, অন্তরঙ্গ হয়েও কোন হদিস বার করতে পারেনি খুনীর।

মনমরা হয়ে বলেছে সুরমাকে, বৌঠান, খুনী ধরা পড়বেই একদিন। দেখো,

তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হবে। আমার মন বলছে। দেখো, মিলতে বাধ্য। তুমি স্থির হও একটু।

স্থির হওয়া কি কথার কথা! সুরমার কানে যায় না কারো কোন উপদেশ। স্থির থাকতে পারে না ঘরে। বিশেষ করে সন্ধ্যেবেলায় তাকে জোর করে ঘরের বাইরে নিয়ে যায় কে। কানের কাছে মুখ এনে কে যেন বলে—কার গলা বুঝতে পারে না—তবে কি বলছে, বুঝতে অসুবিধে হয়না মোটে—চ', চ'না, খুনী কে দেখতে পাবি, জানতে পারবি।

চুমকি শুনে ভাবে, কই সে তো কারো কথা শোনেনা। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার একটা লক্ষ্য করছে চুমকি। রানীদির সন্ধ্যের ঘুম, ঘোড়ার ডাকে উঠে পড়া, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া। সব যেন কেমন কেমন!

রানীদিকে বলে বন্ধ করতে পারেনি চুমকি। সত্যিসত্যিই ও সময়টায় রানীদি যেন অন্য পৃথিবীর লোক। এমনভাবে চলে যায়, কে যেন ডেকে নিয়ে যায়। কোথায় নিয়ে যায় কে জানে! কোনদিন রানীদি এসে মুখ খোলেনি। পরেও না, তারপরও না। রানীদির মনে থাকে কিনা, তাই বা কে জানে! একটা কোন ঘোরের মধ্যে দিয়ে রানীদি আসা-যাওয়া করে।

চুমকি দেখতে পাচ্ছে সুরমাকে এবার। আসছে। না, আসতে আসতে লাগাম ধরে ঘোড়ার মুখটা আবার ঘোরাল। যাচ্ছে।

ঘোড়াটা যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুরমা নামল। ঘোড়াটার কানের কাছে মুখ এনে বলল, এখানেই কি? বল না পুষ্পরথ!

পুষ্পরথ নাম রেখেছিল বিনয়কৃষ্ণ। নামটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে গলা ধরে এলো সুরমার। পুষ্পরথের পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। এইখানেই বসত সে। তার রক্তে ভিজে গেছল ও। ঘোড়ার পিঠে মুখ গুঁজে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল সুরমা। ঘোড়াটারও দু'চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

ঘোড়াটা কাছে এলে, স্পর্শ করলে সুরমার একটা নতুন অনুভূতি জেগে ওঠে। যেটা বিনয়কৃষ্ণর সময় হত না। বিনয়কৃষ্ণ চলে যাওয়ার পর হচ্ছে, হয়। যেন বিনয়কৃষ্ণরই কাছে এসেছে, ঘোড়াটাকে ছুঁয়ে বিনয়কৃষ্ণর পরশ পাচ্ছে।

পুষ্পরথ জোরে জোরে ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে। পেছনের পা দুটো দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। আকাশের দিকে মুখ তুলে উৎকর্ষ হয়ে শুনল কি। তারপর সামনের রাস্তা ধরে চলতে শুরু করল। চড়ে বসল সুরমা।

এই ঘোড়ায় চড়া নিয়ে কত টিটকিরি, কত না বিদ্রূপ গাঁয়ের লোকের। বাক্যবাণের বিষ বিঁধিয়েছে তার চেয়ে বিনয়কৃষ্ণর গায়ে বেশী। ধিঙ্গি বৌকে নিয়ে কত বাহাদুরিই না দেখানো হচ্ছে। দু'জনে মিলেছে ভালো। কথায় বলে, যেমন হাঁড়ি তেমন সরা, বিধাতার মিলন করা। হাঘরেব ছেলে আর

হাঘরের মেয়ে, বনেদি ঘরের মর্ম বুঝবে কেমন ক'রে।

আড়ালে-আবডালে বিনয়কৃষ্ণকে ধুনুরি-রাজা বলে কি উপহাস! রাজা যখন রাজকুমার ছিল, বাল্যবন্ধুকে কথা দিয়েছিল, রাজা হলে, কিছুদিনের জন্যও রাজসিংহাসনে বসাবো তোমায়। ভবিষ্যতে কথা রেখেছিল রাজকুমার। হলে কি হবে—ধুনুরির জাতস্বভাব ছুটবে কেমন ক'রে? রোজ মাঝরাতে যখন সবাই ঘুমে মগ্ন—সেই সময় উঠে যেত তুলো ধুনতে, লুকিয়ে তুলো ধুনে না এলে, চোখেপাতায় এক করতে পারত না ধুনুরি-রাজা। এ হল তাই।

ধুনুরি-রাজা লুকিয়ে যেত তবু, বিনয়কৃষ্ণ রাজা বেপরোয়া। সকলের সামনে নিজের স্বভাবের পরিচয় দিয়ে কি কৃতিত্বই না দেখাচ্ছে! অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে উড়ে যাবে······অতি দর্পে হত লঙ্কা।

এদের বিষাক্ত নিশ্বাসে মানুষটা শেষ হয়ে গেল। চাষীদের অসুখে ওষুধ দিতে গেছে, পেটের ক্ষিদে মেটাতে খাবার দিতে গেছে, তাতেও কথা! আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলছে। নিজে সুহৃদ সাজছে, ওদের চোখে অন্য শরিকদের দুশমন করে তুলেছে। কত বড় ধাড়িবাজ! আর দেবে নাই বা কেন? পরের ধনে পোদ্দারি! নিজের কানাকাড়িও নয়। নিজের হলে মরদ জানা যেত।

সারা শরীরের রক্ত চনচন করে ওঠে সুরমার। এদের মধ্যে কেউ না কেউ খুনী। কে—কে? অস্ফুটে বেরিয়ে এলো মুখ দিয়ে। নিজের কথার প্রতিধ্বনি নিজের কানেই শুনল আবার। বিনয়কৃষ্ণর উদ্দেশ্যে বলল, এত ভালোবাসতে তুমি আমায়—আমার কোন কষ্ট হোক—এ তো চাওনি তুমি কখনো। তুমি কি দেখিয়ে দিতে পার না—কে খুনী? তুমি কি প্রতিশোধ নিতে পার না?

সুরমা রোজই বলে একথা। কই—কেউ তো শোনেনা! না শুনুক সুরমার মন আবারো বলে, তোর ইচ্ছে পূরণ হবে। কেন এত নিরাশ হয়ে পড়েছিস! ঘোড়াটা এগিয়ে চলেছে ঝোপঝাড়ের দিকে। হতে পারে মনের ভুল, তবু এ ভুল ভালো লাগে সুরমার। কখনো মনে হয় বেঁচে থাকার মতো বিনয়কৃষ্ণ তার পেছনে বসে আছে, কখনো মনে হয় পেছন থেকে নেমে গেল। সে একা। পেছনে বসে থাকার সময়, সব দুঃখ সব শোক কোথায় হারিয়ে যায় নিমেষে। ক্ষণিকের জন্য হলেও, অতীতের সুখের দিনে সুরমা ফিরে যায় আবার।

ঝোপঝাড় পেরিয়ে এসেছে সুরমা। এলেও একটু ফাঁকার পর ঘন জঙ্গল। চাঁদের আলো পৌঁছয়নি ওখানে। অন্ধকার। ঘোড়াটা অন্ধকারে মুখ ঢুকিয়েছে। বাকিটা আলোয় রয়েছে। হঠাৎ কার যেন দৌড়ে আসার পায়ের শব্দ শুনল। সুরমা ঘাড় ফেরাল। বজ্রকান্ত।

জানলা দিয়ে দেখেছে সুরমাকে। ঘরে থাকতে পারেনি। ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে রাস্তায়। সুরমাকে পাওয়ার উম্মত্ত নেশা পেয়ে বসেছে। পেয়ে বসেছে আরো বিনয়কৃষ্ণকে না দেখে।

বজ্রকান্তর চোখে আনন্দের ঢেউ। সুরমা যেন একটা চাঁদের আলোর ঢেউ। ঘোড়া চলার তালে তালে উঠছিল নামছিল। মুগ্ধচোখে দেখেছে আর হাঁপাতে

হাঁপাতে ছুটেছে বজ্রকান্ত।

মনের সায়রেও খুশীর ঢেউ। কলমগাঁয়ের নৌকোবাইচ খেলার দৃশ্যটা ভেসে উঠছে। পনেরো বছর বয়সের কথা।

কালীপুজোর দিন।

মাঠ উপচে মেলা নেমেছে নদীর তীর অবধি। মেলার বাউলগানের মিষ্টি কলি ভেসে আসছে কানে—'সবার সাথে ডুব দে জলে/তুলবি মানিক পরবি গলে'। একতারার টুং-টুংয়ের সঙ্গে ঘুঙুরের আওয়াজ উঠছে। নাচছে বাউলরা।

নদীতে ছোট ছোট নৌকো সার বেঁধে সাজানো। পেতল-কাঁসার সাজে নৌকোর চোখমুখ গয়না চকমক করে উঠছে। প্রতিযোগীরা পুজোর মালা গলায় দিয়ে যে যার নৌকোয় উঠে বসেছে। বজ্রকান্তও বসল। সে নির্ভয়, হারবে না বাইচ খেলায়। তার যে আসল শত্রু, সে নামেনি প্রতিযোগিতায়। তার ওপর সদয় হয়ে নয়, বাধ্য হয়ে। বেহুঁশ জ্বর।

আসার আগে আকাশ-ছোঁয়া কালীমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে বজ্রকান্ত প্রার্থনা করেছে একান্ত মনে। বিনয়কৃষ্ণর জ্বরটা যেন আরো বাড়ে। উত্থানশক্তি-রহিত হয়ে থাকে যেন, যেমন দেখে এসেছে সে।

কালীমূর্তির নীচের বাঁ হাতে ধরা অসুরমুণ্ডুতে বিনয়কৃষ্ণর মুণ্ডু দেখেছে। চুলের মুঠি ধরে রয়েছে মা-কালী। ওকেও ধরে রাখবে এইভাবে। আসতে দেবে না। বাইচ খেলা শুরু হল।

নিজের নৌকোয় ফুলের মালা জড়ানো দাঁড় বাইছে বজ্রকান্ত বন্ধুদের সঙ্গে। সকলে একসঙ্গে গলায় গলা মিলিয়ে গাইছে। 'ঘরে আইলা সোনার চান্দ, কলসী পাইলা দান'। অন্য নৌকোর ছেলেরাও ওদের গানের প্রতিধ্বনি তুলছে।

নদীর জলে ঢেউ তুলে, জল কেটে কেটে শোঁ-শোঁ করে নৌকো ছুটছে। সবার আগেই ছুটে চলল বজ্রকান্তদের নৌকো। ছেলেদের উল্লাসে-চিৎকারে নদী-ঘাট-মাঠ একাকার হয়ে গেছে।

তীরে এসে ভিড়ল বজ্রকান্তর নৌকো। সব নৌকোই একের পর এক পেছনে। বাইচ খেলায় প্রথম নৌকোর মাথার মণি বজ্রকান্ত ডাঙায় পা দিতেই গুণ-মুগ্ধরা ঘাড়ে তুলে নাচতে শুরু করেছে। চতুর্দিক থেকে ছেলেরা নিজেদের গলার মালা খুলে খুলে ছুঁড়ে দিয়েছে। রজনীগন্ধার মালায় গোটা দেহটা ঢাকা পড়ে গেছে।

বজ্রকান্তর মনে হয়েছে, শুধু বিজয়ী নয় সে আজ, সে বিনয়কৃষ্ণর বিজয়মাল্য নিয়ে নিজের গলায় পরেছে।

ছুটতে ছুটতে দাঁড়িয়ে পড়ল বজ্রকান্ত। বাতাসে সেদিনকার সেই রজনীগন্ধা ফুলের গন্ধ পাচ্ছে। তার আর কোন কাঁটা নেই। নেই বিনয়কৃষ্ণ। সুরমাকে নিয়ে চলে যাবে, যেখানে দু'চোখ যায়। উত্তেজনায় আনন্দে আবার ছুটতে আরম্ভ করল।

আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। কার যেন পায়ের শব্দ, কার যেন নিশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে। চনমন করে তাকাল চারদিকে। কেউ নেই। নিজের পায়ের শব্দ নিজের নিশ্বাস পড়াই শুনেছে।

এবারে আস্তে আস্তে চলছে। ছুটে চলার প্রয়োজন নেই। সুরমার কাছাকাছি এসে গেছে। ঘোড়া দাঁড়িয়ে। আর এগোয়নি। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে পড়েছে সুরমা।

এগোতে আর হল না বজ্রকান্তকে। সুরমার পাশে এসে দাঁড়াল বিনয়কৃষ্ণ। তার দিকেই আসছে। পালাতে চেষ্টা করল।. মাটিতে দুপা আটকে গেছে। তুলতে পারছেনা। ঘেমে উঠছে। চিৎকার করে সকলকে ডাকতে ইচ্ছে করছে, বাঁচাও আমাকে। গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছেনা। গলাটা কে যেন চেপে ধরেছে।

শিউরে উঠল বজ্রকান্ত। তার ধুতি-পাঞ্জাবি লাল টকটকে রক্তে ভিজে গেছে। এ যে বিনয়কৃষ্ণর রক্ত। কি গরম!

ধুলরু চাষীর বৌকে ওষুধ দিয়ে ফিরছিল বিনয়কৃষ্ণ। জঙ্গলের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল বজ্রকান্ত। ও জায়গাটায় লোকজন বড় একটা চলে না দিনে। সন্ধ্যে থেকে রাতভোর নিস্তব্ধ নির্জন। লোকে বলে, ভূতের রাজ্য ওখানে।

এই ভূতের রাজ্যে গোপনে কাজ সাঙ্গ করতে চেয়েছে বজ্রকান্ত। কেউ টের পাবে না কখনো কোনদিন। কেউ সন্দেহও করবে না তাকে কোন সময়ের জন্য।

ভূতপ্রেতের ভয় নেই বিনয়কৃষ্ণর। বজ্রকান্তরও নেই। বিনয়কৃষ্ণ বিশ্বাস করে না যেমন, বজ্রকান্তও করে না। বজ্রকান্ত মনে করে, মানুষের মনের ভূতই ভয় দেখাই বেশী।

সুরমা বলেছে, ভূত থাকুক না থাকুক—সেটা কথা নয়। জায়গাটা আমার ভালো লাগে না। নাই বা গেলে, তোমার প্রায়ই সন্ধ্যে হয়।

বুকে ঘুষি মেরে, আড়চোখে বজ্রকান্তর দিকে চেয়ে, ব্যঙ্গের সুরে বিনয়কৃষ্ণ বলেছে, এ বান্দাকে ভূতও ভয় করে জানবে। দেখলে পথ ছেড়ে দেয়। ভয়ের কোন কারণ নেই তোমার। তোমার সিঁদুর-লোহা অক্ষয় থাকবে গো।

ওদের দুজনের হাসি-কথা আনন্দ-দম্ভ একদম সহ্য করতে পারছিলনা বজ্রকান্ত কদিন ধরে। ও বাড়ির বিষয় হাতছাড়া—কারণ, বিনয়কৃষ্ণ। জ্যাঠামশাই আর জেঠিমার ভালোবাসা হাতছাড়া—কারণ, বিনয়কৃষ্ণ। বিষয় জ্যাঠা-জেঠির ভালোবাসা জাহান্নমে গেলেও পরোয়া করে না বজ্রকান্ত কিন্তু সুরমাকে পেল না, সুরমার ভালোবাসাও পেল না। মহাকারণ—বিনয়কৃষ্ণ।

বিনয়কৃষ্ণ না সরে গেলে তার বেঁচে থাকা মূল্যহীন। এসপার-ওসপার—ভাগ্য-পরীক্ষা করে দেখবে একবার সে। শেষ চেষ্টা। নয় সে থাকবে, নয় বিনয়কৃষ্ণ। এক পৃথিবীতে দুই সূর্য থাকতে পারে না কখনো। পারে না পারে না।

হিজলবনের পেছনে হেঁসো নিয়ে বজ্রকান্ত তৈরী হয়েই দাঁড়িয়েছিল। সন্ধ্যের মুখে, বিনয়কৃষ্ণ ফিরছে তখন। বনের কছে বরাবর আসতেই পেছন থেকে ঘাড় লক্ষ্য করে হেঁসো ছুঁড়ে মারল সজোরে। আর্তনাদ করে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল বিনয়কৃষ্ণ। ছুছে এলো বজ্রকান্ত। হেঁসোটা কুড়িয়ে নিয়ে কোপের পর কোপ মেরে চলল বিনয়কৃষ্ণর সর্বাঙ্গে। ওকে বাঁচতে দেওয়া হবে না। কিছুতেই

না, কিছুতেই না……

মরে গিয়েও মরেনি বিনয়কৃষ্ণ। সুরমার কাছে এলেই দেখতে পায় বজ্রকান্ত। নিজের ঘরের দরজায়ও দেখেছে। এখনো আসতে দেখছে।

একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ভীষণ ঠাণ্ডা। ভেতরের রক্ত জমাট হয়ে উঠছে, বজ্রকান্ত বুঝতে পারছে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। পড়ে গেল। সমস্ত দেহটা বরফের বড় বড় চাঁই দিয়ে কে যেন ঢেকে দিচ্ছে। সরাতে পারছে না। কি ঠাণ্ডা কি ভারী। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

আশ্চর্য হয়ে দেখল সুরমা, বজ্রকান্ত পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটু ছটফট ক'রে উঠল। কাছে যাওয়ার আগেই স্থির হয়ে গেছে একদম। ওর নিষ্প্রাণ দেহটার পাশে বিনয়কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে।

দুই

মরা মানুষের মতো ভূপতিচরণের দু'চোখ ঘোলাটে। বয়সের ভারে বেশ
.জা হয়ে গেছেন। লোল চামড়ার কাঁপা হাতে লাঠি ঠক ঠক করে সেই
খানায় আমায় নিয়ে এলেন। কুসুমিকার থাকার ঘর, গানের ঘর।

ঘরখানার বিভিন্ন জায়গায় বালি খসা। দু' একখানা নোনাধরা ইঁটও উঁকি
রছে। এমনিতেই বাড়িটার জীর্ণ দশা। হলুদ রঙের 'হ' চিহ্নও নেই। এটা
রে। ঘরের ভেতরে সাদা রঙ কালো। কোন্ কালে যে সাদা ছিল বোঝার
ায় নেই।

আমাকে নিয়ে ভাঙা জানলার ধারে এসে দাঁড়ালেন উনি।

আকাশ-মাটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে সেই জলাভূমি। উঁচু
ু ঘাসে ঢাকা। দেখে মনে হয় না মরণ-ফাঁদ পাতা রয়েছে ওর তলায়। ওই
া মাড়িয়ে ওর ওপর দিয়েই ছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করে। সত্যিই কি
কর্ষণ।

এ পাড়ে সরোজ আসে। পেরুতে গিয়ে পেরুতে পারে না। বসে পড়ে,
মোবার আগে দেখতে পায় কুসুমিকা আসছে, কুসুমিকা বারণ করছে তাকে
পা এগোতে।...

এখান দিয়ে দিনের বেলায়ই বড় একটা যায় না কেউ। পথ-মাঠ খাঁ-খাঁ করে।
রণ জানে সরোজ, তবুও কেন সে পা বাড়াল তা নিজেও বুঝতে পারছে
এখন।

সন্ধ্যে হতে না হতেই চতুর্দিক অন্ধকারে ডুবে গেছে। স্পষ্ট কিছু দেখা
চ্ছ না। কৃষ্ণপক্ষ হয়েই আরো মুশকিল বাধিয়েছে। অন্ধকার হাতড়ে হাতড়ে
ুতে চেষ্টা করছে সরোজ। পায়ে পায়ে ঠোক্কর খাচ্ছে। ঠোক্কর খেলেও চলতে
চ্ছ তাকে। চলতে হবেও।

ঝিঁঝির ডাকের সঙ্গে কার পায়ের শব্দ শুনছে যেন। শব্দটা আসছে পেছন
কে। পেছু ফিরে তাকাল। একজন নয়, দুজন আসছে পাশাপাশি, পরিষ্কার
খা যাচ্ছে না। আবছা আবছা। মনে হয় শক্ত-সমর্থ যুবক ওরা। চলার
অতি দ্রুত।

ওরা ঠিক কাছে এলো না, পাশ কাটিয়েও গেল না। খানিক তফাতে মাঝখান
য় এগিয়ে গেল। অনেক আগে চলেছে ওরা। সরোজের মনে হচ্ছে, তার
শ পাশেও কে যেন চলছে। বুঝতে পারছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না কাউকে।
কয়েক মুহূর্তের মধ্যে জায়গাটা কেমন হয়ে উঠল। চারদিক থমথমে, বাতাস

ভারী। সরোজের ভেতর একটা অজ্ঞাত অস্বস্তি।

আগের লোক দুটির হয়তো তারই মতো অস্বস্তি, হনহন করে হাঁটছে কোনরকমে গন্তব্যস্থলে গিয়ে পৌঁছুতে পারলে বাঁচে। সরোজ সপ্তমে গলা বলল, মশাইরা একটু থেমে চলুন! আপনাদের নাগাল পাচ্ছি না আমি, যাবো।

মনে হল, ওরা থমকালো। কিন্তু পেছু ফিরে দেখল না। কোন উ দিল না। ফাঁকা জায়গায় সরোজের নিজের কথা নিজের কানে এসেই স্রেফ। কেমন আশ্চর্য মানুষ ওরা। যাক, ডাক শুনে যে দাঁড়িয়ে পং সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ পেয়েছে—এটাই যথেষ্ট।

যত জোরে সম্ভব, পা চালিয়ে চলতে শুরু করল। সরোজের পা সঙ্গে ওরাও এগুতে আরম্ভ করে দিল। আবার সেই বাতাসের বেগে চলা। দিয়ে সরোজ পেরে উঠবে না। দৌড়ানোর মত চলছে। এর চেয়ে আর ক্ষমতা নেই তার। যেমন চলছে, তেমনিই চলুক। দূর থেকে, ওদের দৃষ্টি রেখে অনুসরণ করলেই পথ পেয়ে যাবে ঠিক।

ওদের অনুসরণেও প্রতি পদে পদে বাধা এসে উপস্থিত হতে লাগল। যে অদৃশ্য পায়ের শব্দ শুনছে, সেই বাধা। এ পায়ের শব্দ কখনো সামনে আসতে লাগল, কে যেন এগিয়ে আসছে সামনাসামনি। দাঁড়িয়ে পড়তে পাকেপ্রকারে ওদের দুজনের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে থাকতে হচ্ছে।

একটা জায়গায় গিয়ে ওরা দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। এগোয়ও না পেছোয়ও না আর। কি হল কে জানে, কি দেখল ওরা কে জানে! চিৎকার করে বলে উঠল, মশাইরা দাঁড়ালেন কেন? এবারে নিজের কথা শোনা ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না। ওদের কাছ থেকে ফিরে এলো কোন জবাব।

সরোজ অবাক হয়ে গেল লোক দুটির অদ্ভুত আচরণে। সৃষ্টিছাড়া মুখে কথা বললে, কি এমন অশুদ্ধ হয়ে যাবে মহাভারত ওদের। মনে ম ভাবল, দাঁড়িয়ে আছে যখন, নড়নচড়ন নেই, গিয়ে ঠিক ধরা যাবে, দেখা যাক কেমনতর লোক।

কেন এসেছে, কোথায় এসেছে, কোথায় যাচ্ছিল, সরোজের মাথা থেকে উ গেল সমস্ত। মানুষ দুটোকে দেখার জন্য একটা নেশা পেয়ে বসল কেবল।

মাঘের শেষাশেষি। ঠাণ্ডা বাতাসে কণাতের ধার। হাড়পাঁজরা কেটে টুক টুকরো করে ফেলার দাখিল। এমন অবস্থায়ও চলার পরিশ্রমে ঘেমে উঠে সরোজ। হাঁপাচ্ছে। নিজের ওপর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ওদের দিকে দৌড়াচ্ছে ঝিঁঝির ডাক কমে আসছে। বন্ধ হয়ে গেল। এদিকটায় একেবারে গাছপা শূন্য। শুধু কাদা আর কাদা। ঝড় জল নেই, কাদা হল কেমন করে। জু ডুবে যাচ্ছে। কাদায় পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে চলেছে সরোজ। লোক দুটি একই ভা দাঁড়িয়ে আছে পেছন ফিরে। ভুল করে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল, লোক দুটির দিক থেকে কে যেন আসছে এদিবে

। চোখ বড় বড় করে তাকাল। বিস্ময়-বিমূঢ়। কুসুমিকা। ছুটতে
তে আসছে। কুঁচনো শাড়ী ঘুরিয়ে পরা। মাথায় ওড়না। মুখ ঢাকা।
ইশারায় আরো পেছনে সরে যেতে বলছে। এগুতে বারণ করছে।
কাদা ভেঙে পেছনে সরে এলো সরোজ। শক্ত মাটির ওপর এসে দাঁড়াল।
মিকা আসছে। এবারে আর ছুটতে ছুটতে নয়, খুব আস্তে আস্তে। ক্লান্ত
র টেনে টেনে নিয়ে আসছে অতি কষ্টে। সরোজের বুকের ভেতর মোচড়
উঠছে। ইচ্ছে করছে উঠে গিয়ে নিয়ে আসে। ওঠার চেষ্টা করলেই,
বার হাতের ইশারা। যেমন বসে আছো, তেমনি থাকো, উঠতে চেষ্টা করবে
মোটে। আমি তো যাচ্ছিই।

সেদিন এসেছিল সরোজ। মেঘমেদুর শ্রাবণের সন্ধ্যেয়। কিন্তু ট্রেন থেকে
ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ভেঙে পড়ল। যেমন মুষলধারে বৃষ্টি তেমনি শোঁ শোঁ
ব্দ বাতাস বইছে। জনপ্রাণী নেই স্টেশনে। অমলের বাড়ি থেকে ঘোড়ার
ড় পাঠাবে বলেছিল, লোক পাঠাবে বলেছিল। কিচ্ছু না। না গাড়ি,
লোক।

সরোজ যেদিকেই চোখ ফেরাচ্ছে, ঘুটঘুটে অন্ধকার। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের
ক, আকাশ মাটি জুড়ে আঁকাবাঁকা নীল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। জলে
থৈ করছে রাস্তা। রাস্তা-পুকুর একাকার। বোঝার উপায় নেই কোথা দিয়ে
ব।

স্টেশন-মাস্টারের ঘরে টিমটিমে হ্যারিকেনের আলো। ঝড়ের দাপটে তাও
ভু নিভু। ওই ঘরেই আশ্রয় সরোজদের। সরোজ আর বন্ধু নীহারের।
হারের মুখ গম্ভীর, কপালে বিরক্তির রেখা, চোখে রোষ। তারায় আগুন
টকোচ্ছে। মনে মনে গজরাচ্ছে। না এলেই ছিল ভালো। পাড়াগ্রামে
স অঘোরে প্রাণটা যাবে দেখছি। আসবে না, নাছোড়বান্দা সরোজ। হতভাগা
াথাকার।

অমলের ওপর দরদ উথলে উঠল।—না গেলে কি ভাববে রে! মেসের এত
লের মধ্যে তুই আর আমিই তো ওর প্রাণের বন্ধু। এক তো বরযাত্রী যাওয়া
া না। বৌভাতে না গেলে, মেসে এসে একতিল তিষ্ঠতে পারবে ও আর?
লেরা পেছু লেগে জ্বালিয়ে মারবে না ওকে। কি হে, ঝড় হোক, জল হোক
যাবেই ওরা—ওরা যে আমার প্রাণের বন্ধু—বড্ড বড়াই করে গেলে—গেল?

সরোজের দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে নীহার। পারলে, চোখের আগুনে ভস্ম
র ফেলে। বিড়বিড় করে বলল, আপদের সঙ্গ ছাড়লে বাঁচে। এ যাত্রা কি
র বেঁচে ফিরবে—তা-ও জানে না। পরমায়ুর ইতি এখানে না টেনে, বিধাতা
ারো বাড়িয়ে রেখে থাকে যদি, অশেষ ধন্যবাদ। করুণাময়ের করুণা-কীর্তন
'রে বেড়াবে সে, যতদিন ধড়ে প্রাণ থাকবে। শেষনিশ্বাস পড়ার আগে পর্যন্ত।

ঝড়ের দৌরাত্ম্যে মড়মড় শব্দে অশথ গাছের পাতা-ঝরা শুকনো ডালটা ভেঙে

পড়ে গেল। কড়কড় শব্দে বাজ পড়ল নারকেল গাছের মাথায়। গাছটা এ
ধরে একবার মাটিতে নুইয়ে পড়ছিল, একবার মাথা তুলছিস আকাশের
মাথাটা জ্বলে খাক হয়ে গেল। এত বৃষ্টি এত ঠাণ্ডা বাতাস, তবু
মাথার জ্বলুনি থামছে না। মেসে ফিরুক একবার, তারপর সরোজকে দে
দেবে—সে কি রকম ছেলে। হাড়ে হাড়ে টের পাবে তখন।

দরজার ফাঁক দিয়ে একবার করে বাইরে মুখ বাড়াচ্ছে সরোজ—অমল কা
ওদের খোঁজে পাঠাল কিনা দেখছে। আবার তখুনি বৃষ্টির ঝাপটা থেকে
রক্ষার জন্য, মুখ ঢুকিয়ে কপাট বন্ধ করে দিচ্ছে। অপরাধী মুখে চেয়ে
মাঝে মাঝে নীহারের দিকে।

দাঁতে দাঁত ঘষছে নীহার। গালের হাড় দুটো উঁচু নিচু হচ্ছে থেকে
মরণ আর কি—ভালোমানুষ সাজা হচ্ছে! বাইরে মাথা বাড়াচ্ছিস,
গাছটার দশা দেখেও আক্কেল হল না। ঘটে যদি এতটুকু বুদ্ধি থেকে
মাথায় বাজ পড়লে কি আর প্রাণে বাঁচবি?

সব কথাই নীহারের মনে মনে। মুখ খোলেনি একদম। মুখ খুলল
না খুলে পারল না।—বলি এই সরোজ হচ্ছেটা কি? আমায় আরো
না ফেললে কি শান্তি নেই তোর? এবারে মর, মরে আমার মুখ পোড়া
বলুক, নীহারটা এমন অপয়া, সরোজের সঙ্গে গিয়ে প্রাণ খোয়াল। নাইবা
এ বদনামটা দিলি আমার, দরজায় খিল দিয়ে, চুপ করে বস দিকিনি। বে
পাশে এসে বসল সরোজ। স্টেশন-মাস্টার মিটি মিটি হাসছে। হাসতে
বলল, অত ছটফট করছেন কেন? বৃষ্টি না থামে, রাতভোর এখানে
কোথায় যাবেন? সকালে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দোব'খন। বিপদের ব
মাথায় নিয়ে বেরুনোর কি দরকার মশাই? আগে এসেছেন কোনদিন?

না। মৃদুস্বরে বলল সরোজ।

তাহলে তো আরো ভালো। হলুদবাড়ির নজরে পড়লে তো আর রক্ষে
হলুদবাড়ি!

স্টেশন-মাস্টার সচেতন হয়ে উঠল। নিজের অগোচরে মুখ ফসকে যে
বেরিয়ে গেছে, তাকে ঘোরানোর চেষ্টা করল। বলল. না, না। ওসব কিচ্ছু
আমি এমনি একটু রগড় করছিলুন। বৃষ্টি-বাদলের দিন। রাতও বাড়ছে,
বসে কি আর করা যায় বলুন? চেয়ারে গা এলিয়ে দিল স্টেশন-মাস্টার।
করে হাই তুলল একটা। দু'বার টুসকি দিল। মুখে বলল, জীব জীব।

এত রাগেও নীহারের হাসি পেল। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে। তবু
দীর্ঘজীবন কামনা নিজেই করছেন।

নীহারের ভাবান্তর লক্ষ্য করেছে সরোজ। সরোজ জানে, কোন
গভীরে প্রবেশ করে না নীহার। হালকা মনের মানুষ ও। একটুতেই র
হলুদবাড়ির কথাটা নীহারের মনেই নেই। কিন্তু সরোজের আছে। সে
মাস্টার বলতে গিয়েও বলল না। চেপে গেল। যাক গে, অমলের কাছে
নেবে। নামটা শোনার পর, জানার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠছে। শেষের বিশে

যা যোগ করল স্টেশন-মাস্টার—নজরে পড়লে তো আর রক্ষে নেই—এতেই বাড়িটা দেখার আকর্ষণ বেড়ে উঠেছে সরোজের।

সরোজের মনে হচ্ছে, হলুদবাড়ি এমনি কোন নিছক রসিকতা নয়। স্টেশন-মাস্টার জানে সমস্ত, বলবে না। 'হলুদবাড়ি' কথাটা সরোজের ভেতরে-তোলপাড় করতে লাগল। বসে থাকতে পারছে না। অস্থিরতা বাড়ছে। উঠল। দরজা খুলে দেখল বৃষ্টি কমেছে, থামে নি একদম। তা হোক, এতে যাওয়া যায়। একটা গাড়ি পেলেই হল। বাতাসের তেমন দাপট নেই আর। অন্ধকারে ডুবতে ডুবতে সবদিক থেকেই আশার আলো পাচ্ছে একটু। আকাশ বাতাস অনুকুল। একখানা রিকশাও এগিয়ে আসছে স্টেশনের দিকে। সাইকেল রিকশা।

মুখ ফিরিয়ে বলল নীহারকে, বেরিয়ে আয় শীগগির। দুর্যোগে ঘোড়ার গাড়ি পাঠাতে পারেনি অমল আমাদের দু'জনের জন্য, রিকশা পাঠিয়েছে বোধহয়।

বলাও যা, কাজও তা। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সরোজ। বসে থাকতে ইচ্ছে থাকলেও বসা গেল না আর। সরোজের জন্য উঠে পড়তে হ'ল নীহারকে। ...প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে দু'জনে।

দু'হাত নেড়ে দুলিয়ে উর্ধ্বে তুলে রিকশা ডাকছে সরোজ। এসবে চোখ নেই রিকশাঅলার। ডাকাডাকিতেও কান নেই! চোখের সামনে দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে গেল। নীহার বলল, কিরে—অমল পাঠিয়েছে না? তার ভারী মাথা ব্যথা।

সরোজ চুপ করে রইল। কোন কথা কইল না।

আর একটা রিকশা আসছে। জোরে নয়। গদাইলশকরী চালে। মাটি মাড়িয়ে মাড়িয়ে আসছে। সরোজ ডাকল না। একদৃষ্টে দেখছে শুধু।

প্ল্যাটফরমের ধারে রিকশা থামল।

রিকশাঅলা চেয়ে চেয়ে দেখছে দু'জনকে।

নীহার বলল, এটা বোধ হয় অমলদের পাঠানো। রিকশাঅলা খুঁজছে তাদের।

দু'জনে রিকশায় চাপল। কে, কোথায় যাবে—একটা কথাও জিজ্ঞেস করল না রিকশাঅলা। সওয়ারী উঠতেই, চালাতে শুরু করে দিল।

সরোজ-নীহারও কিছু বলল না। অমলের রিকশাঅলা যখন, সবই তো জানে। বলার কি-ইবা আছে।

জল জমা রাস্তায় জল কাটতে কাটতে রিকশা চলছে। কালিকাপুরের অনেক ভেতরে এসে গেছে। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, বাড়ছে আবার। ঝমঝম আওয়াজ। বিদ্যুৎ চমকে উঠল। দূরে একটা বাড়ি দেখা গেল অস্পষ্ট।

বাড়িটা অন্ধকারপুরী মনে হল। বৌভাতের বাড়ি নয় ওটা, এ বিষয়ে নিশ্চিত। কোনদিক দিয়ে কোন আলোর রেখা বেরিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে না বাইরে। গাঁয়ের বাড়ি হলেও হ্যাজাকের আলো তো জ্বলবেই ভেতরে।

সবে রাত নটা। এর মধ্যে নেমতন্ন বাড়ি কি ঘুমিয়ে পড়ে? কুটুম্বজন

গানবাজনা হৈ-হুল্লোড়ে তো জমজমাট থাকবে সারা রাত।

যমদূতের মতো রিকশাঅলাটা তড়াক করে লাফিয়ে পড়ল রিকশা থেকে। ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। দুজনের মুখে কি দেখল, কি এমন পেল, কি এমন না পেল কে জানে! উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। রিকশা পড়ে রইল, আর ফিরেও তাকাল না একবারের জন্য। ডাকাডাকি হাঁকাহাকিই সার হল দুজনের। রিকশাঅলাকে মনে হল, রহস্যময় মানুষ। নিজের খপ্পরে এনে ফেলেছে হয়তো। অমলের পাঠানো হলে এভাবে ছেড়ে যেত না এ অবস্থায়। বাড়ি পেঁাছে দিত। দিল না! মনে দুরভিসন্ধি আছে নিশ্চয়। দুর্যোগের রাতে শিকার ধরে নিয়ে আসে। দলবল নিয়ে এসে পড়বে বোধ হয় এখুনি।

বোতাম আংটি ঘড়ি দেখে রেখেছে বিদ্যুতের আলোয়। আর দেরী নর, বসে থাকা একদণ্ড উচিত নয়। যে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে, ওখানে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে অন্তত। কাছাকাছি অন্য কোন বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে না আর।

সরোজ রিকশা থেকে নেমে পড়ল। হাত ধরে জোর করে টেনে নামাল নীহারকে। সরোজ জানে নীহার মুখে শের মারলেও মনের দিক দিয়ে ভীষণ ভীতু। ও যে ভয় পেয়ে গেছে, মুখ দেখেই মালুম হচ্ছে। মুখে কথা নেই। জবুথবু হয়ে গেছে।

বাড়িটা লক্ষ্য করে প্রাণপণে দৌড়চ্ছে সরোজ, নীহারের হাত ছাড়েনি একদম। শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে আছে।

বাড়ির দোরগোড়ায় এসে নীহারের হাত ছেড়ে দিতেই ধড়াস করে পড়ে গেল নীহার। বেঁহুশ। দুমদুম করে দরজায় ঘুষি মারছে সরোজ। ভেতর থেকে দরজায় খিল আঁটা।

খটাস করে পাশের জানালাটা কে খুলল। গম্ভীর গলায় বলল, কে? ধড়ে প্রাণ এলো, মনে সাহস এলো সরোজের। উঁকি মেরে বলল, আমরা।

কে আপনারা?

লণ্ঠনের আলো খোলা জানলা দিয়ে রাস্তায় এসে পড়ছে জানলার ধারে এসে দাঁড়াল সরোজ। বলল, অমলদের বাড়িতে নেমন্তন্ন এসেছি। বড় বিপদে পড়েছি। দয়া করে একটু খুলুন না।

ভেতরের মানুষ লণ্ঠনের আলোয় সরোজকে দেখে নিল ভালো করে একবার। তারপর লণ্ঠন হাতে নিয়ে খড়মের খটখট আওয়াজ তুলে, এলো সদর দরজায়। কপাট খুলেই আঁতকে উঠল নীহারকে দেখে।—একি খুন নাকি?

না, অজ্ঞান হয়ে গেছে ভয়ে।

ভূপতিচরণ মেঝেয় লণ্ঠন নামিয়ে রাখল। সরোজ আর ভূপতিচরণ দুজনে মিলে নীহারকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে এলো। ভূপতিচরণ শুইয়ে দিল তক্তপোষে পাতা বিছানার ওপর। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দৌড়ে। সদর দরজায় ভাল করে খিল ছিটকিনি এঁটে ঘরে ফিরল আবার।

মাথায় মুখে চোখে জল ছিটতে ছিটতে নীহারের দুচোখ খুলল। উঠে বসল আস্তে আস্তে! ঢকঢক করে এক গেলাস জল খেয়ে একটা লম্বা নিশ্বাস

টেনে নিল বুক ভরে।

আশ্বাসবাণী শোনাল ভূপতিচরণ নীহারকে।—এখানে কোন ভয় নেই আপনার। নিশ্চিন্তে-নির্ভয়ে বিশ্রাম করতে পারেন। বলেই প্রৌঢ় আনমনা হয়ে পড়ল একটু। কি যেন কি ভাবল। নিমেষে মুখের সব রক্ত সরে গেছে। সাদা ফ্যাকাশে। ওপরের বারান্দায় তোড়া পরে চলছে কে। ঝুমঝুম আওয়াজ শোনা যাচ্ছে নিচে থেকে। থামল আওয়াজ। ভূপতিচরণের মুখের এ ভাবটা কেটে গেল।

ঢোঁক গিলে বলল ভূপতিচরণ, অমলরা তো বাঁড়ুজ্যেপাড়ার নাম করা ঘর, কে না চেনে! খুঁজে পেতে দেরী হবে না আপনাদের। তবে ঘোরা পথে এসে পড়েছেন, রাত্তিরে মহাঅসুবিধে। তার ওপর ঝড়বৃষ্টির রাত। আজ পেঁছিনো মুশকিল। কাল ভোরে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবো'খন।

কেমন করে হয়? আজ বৌভাত, আজ না গিয়ে, কাল করবোটা কি? আজই এখুনি পাঠিয়ে দিন আমাদের। সরোজের গলার স্বরে অস্থির উৎকণ্ঠা।

ঝড়বৃষ্টি তাণ্ডব শুরু হয়েছে বাইরে।

জানলা খুলে দেখল ভূপতিচরণ। বলল, অসম্ভব। দেখছেন তো অবস্থাটা। গরীবের যা খুদকুঁড়ো আছে, সেবায় লাগলে ধন্য মনে করবো।

কি বলছেন আপনি? আপনার মতো মহৎ কে আছে বলুন তো? চেনা নেই জানা নেই—রাতে আশ্রয় দিয়েছেন দুজনকে বাড়িতে। কে দেয়? নীহার বিনয়ের সুরে বলল। বলল, আমি যাচ্ছি না, অমলকে পরে বুঝিয়ে বললেই হবে। ও এত অবুঝ নয়, সমস্ত ঘটনা জানলে রাগ করবে না।

সরোজের দিকে ফিরে বলল, সব তাতেই তোর বাড়াবাড়ি। গোঁয়ার্তুমি করে এসে, যা হল ভালো রকম মালুম হয়েছে তো। আর কেন? এবার স্থির হ'। ভদ্রলোক যা বলছেন, শোন। শোন! আর না না করিস না।

তোড়ার মিষ্টি আওয়াজ সিঁড়ি বেয়ে নামছে এবার। উৎকর্ণ হয়ে শুনছে সরোজ, শুনছে নীহার। চঞ্চল হয়ে উঠল ভূপতিচরণ। স্থির হয়ে বসে থাকতে পারল না আর। ভেতরে চলে গেল। তোড়ার আওয়াজ নামতে নামতে থেমে গেল। নিচের দিকে নামল না আর। কিছুক্ষণ থেমেই রইল। আবার শোনা যাচ্ছে। ওপর দিকে উঠছে বোধ হয়। উঠল। মিলিয়ে গেল। শোনা যাচ্ছে না আর।

খানিক বাদে এসো ভূপতিচরণ। দুহাতে দুটি কাঁসার থালা। আলু ছেঁচকি আর লুচি। থালায় একটা করে ছোট বাটিতে আখের গুড়। বছর বারোর বাচ্চা চাকরের ঘুমের ঘোর কাটে নি। দু'চোখ ঢুলঢুলু। দু'হাতে জলের গেলাস, কাঁধে দু'টো আসন। উলে বোনা কার্পেটের। একটাতে ময়ূর পেখম খুলে নাচছে, আর একটাতে দুটি হাঁস পদ্মফুলের পাশ দিয়ে দিয়ে সাঁতার কাটছে পুকুরে। কি রং ফলানো! শিল্পীর চোখ আছে বলতে হয়। দেখলে সত্যি মনে হয়। চোখ জুড়িয়ে যায়।

আসন পেতে সামনে বসে যত্ন করে খাওয়াল দু'জনকে ভূপতিচরণ। বলল,

পেট ভরল না—ঘরে যা ছিল—

এ তো রাজার খানা মশাই। কি এমন খাই আমরা মেসে? যা ছিরি। অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে নাড়িভুঁড়ি পাক দিয়ে।

সরোজের কথা শুনে হেসে উঠল ভূপতিচরণ।

ঘোড়ার গলায় ঘণ্টা বাজছে ঝমর-ঝমর। একখানা গাড়ি আসছে। ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারার সপাং-সপাং আওয়াজ।

সরোজ আসন ছেড়ে উঠে পড়ে জানলায় এলো! গাড়িটা স্টেশনের দিক থেকে আসছে। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সরোজ। নিশ্চয় এটা অমলদেরই গাড়ি। কোন ভুল নয়। অমল নিজেই বলেছে তাকে, গ্রামে ওই একখানাই গাড়ি ওদের, আর কারো নেই।

রাস্তায় তিনজনে দাঁড়িয়ে।

ভূপতিচরণ পেছনে। মুখখানা বিবর্ণ। সামনে সরোজ আর নীহার। ওরাই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ডাকছে সইসকে।

আড়চোখে ওদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে উঠল সইস। আরো জোরে জোরে চাবুক মারতে লাগল ঘোড়ার পিঠে। গাড়ির ভেতর থেকে দু'জন মুখ বাড়িতেই সট করে ঢুকিয়ে নিল ভেতরে। আশ্চর্য ব্যাপার। ঝড়ের বেগে চলে গেল গাড়ি।

তিনজনে ভিজে সপসপে হয়ে গেছে বৃষ্টিতে। মৃদুস্বরে বলল ভূপতিচরণ, আর কেন—ভেতরে গিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ুন, সকাল ছাড়া উপায় নেই।

ঘরের দু'ধারে দুটো তক্তপোষ পাতা। একটাতে ভূপতিচরণ শোয়। আর একটা এমনিই খালিই থাকে, আত্মীয়-স্বজন কেউ এসে পড়লে ব্যবহার হয়। ওদের দুজনকে দুটো ছেড়ে দিয়ে ভূপতিচরণ মেঝেয় শোয়ার জন্য বিছানা পাততে চাইল, রাজী হল না দুই বন্ধুতেই। একটাতেই হবে। বড় তক্তপোষ, দুজনের শোয়ার কোন অসুবিধে হবে না। মেসে তো একটা সরুফালির ওপর শুয়ে থাকে। একটু এপাশ-ওপাশ করবার উপায় নেই। প্রতিরাতেই পড়ে যাওয়ার ভয়। কোনদিন না ঘুমন্ত অবস্থায় পড়ে গিয়ে নাক-মুখ থেঁতো হয়ে যায়।

শোয়া মাত্র নাক ডাকতে শুরু করল নীহারের। ওর ওই রকমই অভ্যাস। কুম্ভকর্ণ। ভূপতিচরণেরও জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে। ঘুমিয়ে পড়েছে। সরোজের পোড়া চোখে ঘুম আসছে না। কেবল অমলের মুখখানা মনে পড়ছে। বড্ড জ্বালাচ্ছে। এত স্পর্শকাতর—যাওয়া হল না—জানলার রেলিং ধরে হয়তো দাঁড়িয়ে থাকবে রাস্তার দিক চেয়ে।

ভিজে হাওয়ায় মাটির সোঁদা গন্ধ। কিন্তু একটা মিষ্টি সুরের রেশ বয়ে নিয়ে আসছে। রেশ নয়, গান। কোন বাজনা নেই এক তানপুরার সুর ছাড়া। কোন পুরুষের গান নয় এ। নারীকণ্ঠ। পাপিয়া না কোয়েলিরা—কার কণ্ঠের সঙ্গে তুলনা করবে সরোজ—ভেবে পাচ্ছে না। এমন মধুর স্বর কি সত্যিসত্যিই

কোন মেয়ের হয়—হতে পারে ?

মায়ের গান শোনাবার শখ খুব। নিজেও গাইতে পারে ভালো। বাবা মারা যাবার পর মা দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছে তাকে নিয়ে। ঘরে মন বসাতে পারতো না মোটে। যেখানে যখন গানের জলসা হয়েছে, গেছে। তাকে সঙ্গে নিয়েছে। এরকম গলা তো শোনে নি কোথাও। ঘুম পাড়ানো গলা। এ ঘুম নীহারের ঘুম নয়। এ ঘুম সুরের অতল তলে ডুবে থাকা। তন্ময়তা।

সন্তর্পণে বিছানায় উঠে বসল সরোজ। চৌকির মচমচ আওয়াজে ঘুম না ভেঙে যায় কারো। শুনছে মন-কান এক করে। মনে হচ্ছে এই বাড়ির ওপরে কেউ গাইছে !—শাওন আইলন সঁখিয়া, না আইল শ্যাম···।

এতদিন শুনে এসেছে সরোজ গানের বিষয় নিয়ে অনেক অবিশ্বাস্য কথা। এখন সেসব বিশ্বাস হচ্ছে। গানে বনের পশুও বশ মানে। হিংস্র হিংসা ভোলে, ক্রোধীর ক্রোধ নিভে যায়, লোভীর লোভ থাকে না। কামনাকাতর মানুষও ঈশ্বরের ভক্ত হয়ে ওঠে। গান দূরের মানুষকে কাছে টানে। সম-বয়সীর মন ভরে দেয় বিশুদ্ধ আনন্দে। দুঃখ-শোক কোথায় ভেসে যায়, ঠিকানা নেই।

সব ক'টি পাচ্ছে সরোজ এই একটি গলায়। এ গলার অসম্ভব সম্ভব করার ক্ষমতা রয়েছে।

ঠিক সময় ঠিক গান গাইছে গায়িকা। স্থানকাল ভুলেছে সরোজ গান শুনতে শুনতে। অচেনা জায়গা, অচেনা বাড়ি। সুরের রাজ্যে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে। নিজের অগোচরেই চৌকি থেকে নামল। দরজা অবধি এলো। লণ্ঠনের আলো নেভানো। কেরোসিন পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে আছে ঘরময়। অন্ধকারে বুঝতে পারেনি অত। উঁচু চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। চোর চোর বলে ভূপতিচরণ চিৎকার করে উঠল। নীহার উঠে পড়ল ধড়মড়িয়ে। মাথার তলা থেকে টর্চ বার করে জেবলেছে তখুনি ভূপতিচরণ !

সরোজের সুরের ধ্যান ভেঙেছে। আনন্দলোক থেকে অসুরলোকে আছড়ে পড়েছে। সচেতন হতে লজ্জার একশেষ।

মেঝে থেকে ধরে তুলেছে ভূপতিচরণ। বলেছে, মাপ করবেন। এমন অভ্যাসের দোষ—পাড়াগাঁয়ে থাকি তো—চোরের ভয়—চোরকে জেগে আছি জানান দেয়ার জন্য ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চোর চোর করে উঠি মাঝে মাঝে।

নীহার আপাদমস্তক হাত বুলিয়ে দেখছে—কোথাও চোট-টোট লেগেছে কিনা। বলল, তেমন কিছু নয়। হাঁটুর নিচটা একটু ছড়েছে যা।

টিনচার আছে এনে দেবো ?

ফিরে তাকাল সরোজ। এই গলারই গান শুনছিল সে। কিন্তু বাঙালী বাড়িতে—রাজপুতানীর মতো ওড়না ঢাকা কেন তরুণীর মুখে। সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। বাঙালী ঢঙে গায়ে ব্লাউস, কুঁচনো শাড়ী ঘুরিয়ে পরা। গোলাপী জামা গোলাপী শাড়ী। ওড়নার রঙটা মিশমিশে কালো। মুখ দেখা যাচ্ছে না। হাতে চুড়ি-বালা, পায়ে তোড়া। ওড়নায় গলা ঢাকা। হার আছে কিনা বুঝতে পারা গেল না। বাঁহাতে লণ্ঠন ঝুলছে। ডানহাতে সিঁড়ির রেলিংয়ে।

সরোজ চোখ নামালো। বলল, আমার জন্য আপনার সাধনায় বাধা পড়ল।

সরোজের দিকে একবার কুসুমিকার দিকে একবার অবাক চোখে দেখল ভূপতিচরণ। অমন স্নেহস্নিগ্ধ মুখখানা মরার মতো হয়ে গেল। নিচুস্বরে বলল কুসুমিকাকে, ওপরে যাও। টিনচার আমি গিয়ে নিয়ে আসছি।

রাতের স্মৃতি সকালেও ভুলতে পারেনি সরোজ। নিজের মনে গুনগুন করে কুসুমিকারই সুর ভাঁজছে শুধু। কুসুমিকারই গান গাইছে।—অমলের বাড়ি এসেও।

যে মানুষ অমলের বাড়ি আসবার জন্য এত উদ্গ্রীব—অমলের বাড়িতে যে সরোজ এসেছে—এ যেন সে মানুষ নয়।

সকাল হতেই সূর্য ওঠার আগে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে অমলের বাড়িতে ভূপতিচরণ। কথা দিয়েছিল, কথা রেখেছে। আসবার সময় আবার আগের মতো অস্বাভাবিক পরিবর্তন হতে দেখেছে সরোজ। দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে কুসুমিকা।

কি মনে করে ভূপতিচরণ ওপর দিকে তাকাল। সেই সঙ্গে সরোজও ভূপতিচরণকে অনুসরণ করল। রাতেই সেই বেশবাসে দাঁড়িয়ে তরুণী। সরোজ তাকিয়ে আছে। নজর এড়ায় না ভূপতিচরণের। একট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, আমার লোকটি দূর থেকে বাড়ি দেখিয়ে দিয়ে চলে আসবে। আর দেরী হলে লোকটির অন্যকাজে যাওয়া মুশকিল হবে আবার।

মেয়েটি কে—পরিচয় দিল না ভূপতিচরণ। জিজ্ঞেস করার সুযোগ দেয়নি রাত্তিরে। দিলনা এখনো। মাথা নিচু করে যাত্রাপথে পা বাড়িয়েছে সরোজ। বন্ধুর হাবভাব কেমন কেমন লাগছে অমলের। আনন্দের ছোঁয়া নেই কথাবার্তায়। বৌ দেখতে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যেতে হল। সতেজ-সবল মানুষটা শক্তিহীন হয়ে পড়েছে একেবারে। এখানে যে ওর ভালো লাগছে না, দেখলেই বোঝা যায়। নির্জনে একলা থাকতে চাইছে। অমলও যে আসুক গল্পগুজব করুক—যেটা মেসে হত—পছন্দ করছে না।

রাত্রে গাড়ি পাঠানো নিয়ে রাগ-অভিমান করলেও বা ঠিক মানুষটাকে পাওয়া যেত তবু। গাড়ি পাঠিয়েছে অমল। অবিশ্যি ঝড়জলের দরুন একটু দেরী হয়ে গেছে। সইকে দুটো রাস্তারই খোঁজ করে দেখতে বলা হয়েছে। সোজাপথে যাবে ঘোরাপথে আসবে। অচেনা জায়গা ওদের, কোন্‌পথ ধরে বলা তো যায় না।

সইস এসে জানিয়ে দাঁড়িয়ে ভেবেছে অমল। সরোজ বেপরোয়া দুর্দান্ত। ভয়ডর বলে কোন লেখা নেই ওর কুষ্ঠিতে। না করে মানুষের ভয়, না করে ভূতের। নিজের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস। বলেছিল, ঝড়বৃষ্টি হোক না, ওসব কিছু করতে পারবে না। মনের জোরের কাছে সমস্ত তুচ্ছ। কথার মানুষ ও। ও এলো না কেন? নীহারের কথা ভাবে নি। ও না এলেও, না আসতে পারে।

ঘরকুনো গোছের।

সকালে সরোজ আসতে, সহিসের মুখে আর যে দু'জনকে আনতে পাঠানো হয়েছিল ওদের মুখে ত্রাসের ঘনছায়া দেখে, ওদের ফিসফিসানি শুনে, হৃৎকম্প হয়েছিল অমলের। এই দুজনকেই তো ভূপতিচরণের সঙ্গে দেখেছিল! দাদাবাবুরা বন্ধুরা দাদাবাবুর মতোই ভূপতিচরণকে জানবে নিশ্চয়। ওখানে যাবে কেন? ভূপতিচরণ খুনী, কুসুমিকা খুনী, এ গাঁয়ের কে না জানে! ওদের নিশ্বাস যেখানে পড়ে, সে বাতাস নিতেও ভয়। ঘোড়াটা পশু, সেও বোঝে। কিছুতেই বাড়ির কাছ দিয়ে যাবে না। কি চাবুকই না চালাতে হয়েছে—বাপ্‌স, যাদের কথায় কান দেয়নি, দেখছে তারাই দাদাবাবুর বন্ধু।

ভূপতিচরণের বাড়ির ভেতরে খবরটা নীহারের মুখে শুনেছে।

কেন মরতে সরোজকে প্রতিশ্রুতি করিয়ে নিয়েছিল অমল আসার জন্য? কুসুমিকার নাম করতেও ভয় পায় লোকে। ভূপতিচরণেরও নাম করতে। নামেরও নাকি এমন মোহ, লোকের মনে কৌতূহল জাগায়। এমন আকর্ষণ ওদের কাছে টেনে নিয়ে যাবেই যাবে। কেউ রুখতে পারবে না তাকে। বিধাতার বিধিলিপিও উল্টে দেয় ওরা, এত ক্ষমতা ধরে। এ ক্ষমতা দেবতার নয়, পিশাচের।

যে ভয়ে পালাও তুমি, সামনে সে ভয় আমি। এ ঠিক তাই হল। যার জন্য বন্ধুর কাছে, কারো কাছে প্রকাশ করে না, করেনি আজ অবধি অমল—পাছে সাবধান করতে গিয়ে নিজেই না বিপদের মুখে ফেলে দেয় ওদের।

মুখে চাবি দিয়ে রেখেও পারা গেল না। সবচেয়ে আপসোসের বিষয়, যে বন্ধু তার প্রাণের চেয়ে প্রিয়, সেই-ই ওদের কবলে পড়ে গেল! এর চেয়ে দুঃখের আর কি আছে অমলের! দু'টো ঘটনা জানে। ভূপতিচরণের কুসুমিকার মরণ-গহ্বর থেকে বেরুতে পারে নি তারা। দুনিয়া থেকে চলে যেতে হয়েছে তাদের। সে কি ভয়ঙ্কর মৃত্যু!

শিউরে উঠল অমল।

বন্ধুর ভাবগতিকে তার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসছে। আর একতিল এদেশে রাখা উচিত হবে না সরোজকে। এদেশের মাটিতে বিষ ঢালছে কুসুমিকা। আকাশে-বাতাসে—সর্বত্র ওদের নিশ্বাসের বিষ ছড়াচ্ছে। সরোজকে এখুনি পাঠিয়ে দিতে হবে এখান থেকে। ভেবে সময় নষ্ট করলে, সর্বনাশ চুপ করে বসে থাকবে না একটুও।

অফিসে মন বসে না সরোজের, মেসেও না। ভেতরটা হু-হু করে কেবল। অসীম শূন্যতা। বন্ধুবান্ধবদের মনে হয় দুশমন। এতদিন ভেবেছিল, ওরা তার মন বোঝে, ব্যথা বোঝে। এসমস্ত বুঝুক না বুঝুক অন্তত তাকে বোঝে। বিশ্বাসের ভিত ধসে পড়েছে। অমলই উঠিপড়ি লেগেছে তার সঙ্গে! তার মাসতুতো বোন পূর্ণিমার সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে ছাড়বে না কিছুতেই।

সরোজ স্পষ্ট বলে দিয়েছে, সে গুড়ে বালি। বিয়ে যদি করতে হয় কুসুমিকাকেই করবো। জীবন থাকতে অন্য কাউকে নয়। ওর গলা আমায় পাগল করেছে। রাতের ঘুম কেড়েছে, অফিসের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। ও ছাড়া আমি আর বাঁচতে পারবো না।

অন্যলোক হলে হেসে ফেলতো সরোজের কথা শুনে। বলতো, একটা গান শুনে এত, এ ভাবটা টেকে কদিন দেখা যাক আগে। তারপর উত্তর যা দেবার দোব। প্রথম প্রথম আবেগ-উচ্ছ্বাসে অনেকে অনেক কিছুই বলে এমন বয়সে, শেষ রাখে ক'জন ?

অমল বলতে পারল না। অমল যে জানে। এই একই বুলি বেরিয়েছিল আগের দু'জনেরও মুখ দিয়ে। তারা অন্য বিয়ে করতে চায় নি কুসুমিকাকে ছেড়ে। সরোজের সিদ্ধান্ত শুনে খুব মুষড়ে পড়ল। মাথায় সর্পাঘাতে ওঝা তাগা বাঁধবে কোথা ?

তবু কুসুমিকার ওপর যাতে ঘেন্না আসে, যাতে বিতৃষ্ণা আসে, চেষ্টা করে চলল অমল। সরোজের মন ঘোরাতে পারলে, বেঁচে যাওয়া কিছু অসম্ভব নয় !

যা জানে, যা শুনেছে কুসুমিকার সম্বন্ধে গুছিয়ে গুছিয়ে বলে সরোজের কানভারী করে মোহমুক্ত করতে চাইল। বলার সময় বিবেকের দরজায় ধর্ণা দিয়েছে বিশবার। বাড়ির শিক্ষা ছিল কারো সমালোচনা করতে হয়, সামনে করবে। আড়ালে কারো আলোচনা কারো নিন্দা করা শোভন নয়। যার সুশিক্ষা আছে, সে এরকম করে না কখনো।

নিজের বিবেকের কাছ থেকে উত্তর পেয়েছে অমল। সব ক্ষেত্রে এক উপদেশ খাটে না। জায়গা বিশেষে মত পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যেখানে একটা মানুষ খুন হতে চলেছে, সেখানে তাকে বাঁচানোই প্রধান ধর্ম, মরণের মুখে ঠেলে দেয়া নয়। কুসুমিকা সম্বন্ধে বললে, এখানে দোষের নয়।

বলল, কুসুমিকা বেনারসের বাইজী। ভালো মেয়ে নয় ও। বেনারস থেকেই ভূপতিচরণ নিয়ে আসে ওকে। ওর গান শুনে বুঝিস নি ? কোন বাঙালী মেয়েকে গাইতে শুনেছিস ?

না। মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল সরোজ।

একজনের স্ত্রী হয়ে থাকলে ওর ব্যবসা চলবে না। তাই যে ওর জন্য পাগল, তার সর্বস্ব নিয়েথুয়ে, লোক দিয়ে খুন করে ফেলে। ও রাক্ষুসী। বেনারসে অনেক সাধুসন্তের আড্ডা। তাঁদের কাছে মানুষ বশের কোন মন্ত্র পেয়ে থাকবে হয়তো, নয়তো এমন কোন জাত গুণিনের কাছে এমন কিছু শিখেছে, যে ক্রিয়াটা গানের আগে করে নিয়ে গায়। যে শোনে সে কিন্নরী-কণ্ঠ শোনে। মনে হয় ভূ-ভারতে কোন মানুষের এমনতর গলা শোনেনি সে। মোহিত হয়ে যায়। শয়নে-স্বপনে ওই গলাই কানে বাজে শুধু। ও গলা ছাড়া অন্য কারো কথা কানে যায় না। সে ভালোই হোক, মন্দই হোক। গানের গলা শুনতে শুনতে আত্মীয়-স্বজন ভোলে। নিজের অস্তিত্ব ভোলে। বিস্মৃতির উজানে বয়ে যেতে থাকে। স্মৃতিতে থাকে কেবল একটি মাত্র বস্তু—মায়াবী-গলা, মানুষ-খেকো গলা !

নির্বাক মুখে বসে থেকেছে সরোজ। মুখে কোন প্রতিক্রিয়ার ছাপ ভেসে ওঠে নি। শুনল কি না শুনল, কিছু বোঝা গেল না। তবে একেবারের জন্যও প্রতিবাদ করেনি যখন, হয়তো ওষুধ ধরলেও ধরতে পারে।

অমলের ভুল ধারণা। ওষুধ ধরে নি। তার ওষুধ রুগীর মুখে পড়েনি, পড়েছে জলে। উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে, মেসের জানলায় যা-ও বা বসে থাকতো সরোজ চুপচাপ, অমলের বলাবলির ফলে, সে জায়গায় আর দেখা গেল না।

মেসসুদ্ধ লোকের চোখে ঘুমনিদ্রা নেই। গেল কোথা ?

অফিসে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, যায়নি।

কুসুমিকাদের বাড়িতে এসেছে সরোজ। হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে, ঘরে নিয়ে এসে বসাতে গিয়ে, মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেছে ভূপতিচরণের। আয়নায় কুসুমিকা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে! চোখের ইশারায় কি বলল কে জানে, কুসুমিকা ওপরে উঠে গেল।

ঘরের দরজা ভেজানোর সময় উল্টোদিকে দেয়াল ঝোলানো আয়নাটা দেখল একবার ভূপতিচরণ। কুসুমিকা আসেনি আর। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিল। আবার মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, বসুন না। দাঁড়িয়ে কেন ? ভেবেছিলুম আর এ-মুখো হবেন না।

কেন ? বরং না হওয়াটাই তো অকৃতজ্ঞতা। সে রাতে যা করেছেন, সহজে কি ভোলা যায় ?

আচ্ছা, আমার আচার-ব্যবহারে কোন সন্দেহ আসে না আপনার মনে ?

না।

না! ভূপতিচরণের গলার স্বরে বিস্ময়। মুখখানা বিষণ্ণকাতর হয়ে উঠল। —এই প্রথম শুনলুম 'না'। আমাদের অনেক বদনাম। কারণও আছে। কিছু শোনেন নি ?

কতক কতক শুনেছি।

তবুও এসেছেন ?

হ্যাঁ। বিশ্বাস করিনি।

বিশ্বাস করুন। আমি আপনাকে বলছি, এ পথ মাড়ালে অমঙ্গল হতে পারে।

গুজবে আমি কান দিই না। লোকেরা এক হয়, রঙ চড়িয়ে বলে এক।

যা রটে, তার কিছুও বটে—বিশ্বাস করেন তো ?

কোন ব্যাপারে মিলে গেলেও, সব ব্যাপারে মেলে না।

মেলে, আমাদের ব্যাপারে মেলে। দুটো মানুষ গায়েবের কথা শোনেনি নি।

গায়েব নয়, খুনের কথা শুনেছি।

হ্যাঁ, শুধু খুন নয়, গায়েবী খুন যাকে বলে, তাই। প্রায় সবই তো শুনেছেন দেখছি। আশ্চর্য মানুষ আপনি! বলিহারি দুঃসাহস!

আরো কি কি বলতে যাচ্ছিল, দরজায় টোকা মারার আওয়াজ শুনে বিরক্ত মুখে দরজা খুলে দিল ভূপতিচরণ। রেকাবি আর জলের গেলাস হাতে কুসুমিকা। রোদ্দুরে এসেছেন ভদ্রলোক। কিচ্ছু নয়, গোটা চারেক মোয়া মাত্র এনেছে। জোর করে কেড়ে নেয়ার মতো কুসুমিকার হাত থেকে মোয়ার রেকাবি আর জলের গেলাস নিল ভূপতিচরণ নিজের হাতে। গম্ভীর স্বরে বলল, ওপরে যাও। কথাটা বলেই ফিরে তাকাল সরোজের দিকে। বাইরের লোকের সামনে এ ভাবটা প্রকাশ করে ফেলা ভালো হল না তার। মোলায়েম গলায় বলল, ভদ্রলোকের খাওয়ার ব্যবস্থাটা করে ফেল গে। এত বেলায় জল খেয়ে থাকতে পারবে কতক্ষণ। ভূপতিচরণের ঠোঁটের কোণে কৌতুকের হাসি।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে আগের প্রসঙ্গে ফিরে এলো আবার। বলল, কুসুমিকার জন্য যে দুটি যুবক প্রাণ হারাল, জানি না—এটা কুসুমিকার ওপর ঈশ্বরের আশীর্বাদ না অভিশাপ।

ভূপতিচরণ যা বলছে, কোন কথা সরোজের কানেই ঢুকছে না, নিজের কথা বলার জন্য উসখুস করছে। দরজার দিকে চোখ ফেরাচ্ছে বার বার। লক্ষ্য করছে ভূপতিচরণ। বকে বকে মুখের ফেনা উঠে গেলেও এ ছেলে বুঝবে না। নিয়তির টান কি একেই বলে? কথার মোড় ঘোরাল। বলল, আপনি কি কিছু বলতে এসেছেন?

হ্যাঁ, আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগছে। সেটার সমাধান করার জন্যই ছুটে আসা আরো। সহজ-সরল গলায় বলল সরোজ।—আমি যেটা ভাবছি, ঠিক কি না জেনে যাবো।

কৌতুহল বিস্ময় দুটোই একসঙ্গে উঁকি মারল ভূপতিচরণের চোখের তারায়। সরোজের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল।

সরোজ কোন দ্বিধাসংকোচ না রেখে বলে যাচ্ছে মুখস্থের মতো। একমনে শুনছে ভূপতিচরণ। শুনতে শুনতে দু'চোখ খরখরে হয়ে উঠছে কখনো, কখনো সজল। শোনার আগে ভেবেছে, এর কি প্রশ্নের কি সমাধান? অন্যদের মতো মামুলি ধরনেরই হবে।

না, মামুলি কথা বলে নি সরোজ। যেটা বলা উচিত ভেবে নিয়েছিল ভূপতিচরণ। কুসুমিকার গানের গলার জন্য ঘরণী করে নিয়ে যাবে—একথার ধার ঘেঁষেও যায় নি।

বলেছে, মামারা যখন কলকাতায় থাকত, সেও থাকতো মামার বাড়ি। চোদ্দ বছরের কিশোর, স্কুলে পড়ছে। ডালিমতলার রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় মন কান চলে যেত একটা বাড়ির দিকে। বইপত্তর বগলে করেই সামনের বাড়ির লাল রকের ওপর বসে পড়ত। স্কুলের পড়া বন্ধ হয়ে যেত অনেকদিন। দেয়াল ঠেসান দিয়ে বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছে কতবার।

সামনের বাড়িতে গান গাইত কোন মেয়ে। কি মিষ্টি গলা! ওই বয়সে নেশা ধরত তার। রোজ শোনার জন্য মন ছটফট করেছে। গানের মেয়েকে কোনদিন চোখে দেখে নি। চোখে দেখে নি বলছে এই জন্য, বসে গাওয়া দেখতে

ইচ্ছে করেছে। সম্ভব নয় জেনেও এত দিনে পৃথিবীতে আছে কিনা—এমন দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও দেখার ইচ্ছেটা থিতিয়ে যায় নি একটুও। লোকের কাছে বললে, হেসে উড়িয়ে দেবে, পাগল ঠাওরাবে তাকে। তাই বলে নি কাউকে। মা যখন বেঁচে ছিল, মাকেও না।

সরোজ সেই ছেলে না হয়ে যায় না। বয়স বাড়লেও মুখের আদল, চাউনি —যেমন ছিল, তেমনি রয়েছে।

পিসতুতো বোন পূর্ণিমা এসেছিল কদিন। পূর্ণিমা তাকে ছাত থেকে প্রথম দেখায়। সেদিন তাড়াতাড়ি গানটা শেষ করতে বলে রেখেছিল ও আগে থেকে। পূর্ণিমার কথা মতো কাজ করেছে কুসুমিকা। ছাতে উঠে দেখে ওরা, ও বাড়ির রকে বসে সরোজ। এ বাড়ির দিকে তাকিয়ে। মুখ দেখে মনে হয়, আবার গান শুনতে পাবার আশা।

ঠাট্টা করে বলছে পূর্ণিমা, শ্রোতা বটে। যেমন বাচ্চা গায়িকা, তেমনি তার বাচ্চা শ্রোতা। কুসুমিকার চেয়ে এক বছরের বড়। বছর পনেরো। হলে কি হবে, পঁচিশের মেয়েরাও ওর সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশায় পেরে ওঠে না। কুসুমিকা প্রতি-উত্তর দিল না কোন। ঘাঁটিয়ে কাজ নেই।

সেই থেকে রোজ একবার না দেখলে সে দিনটাই যেন বিফল মনে হত। কাটতে আর চায় না। কোনদিন ছাতে আলসের ঘুলঘুলি দিয়ে, কোনদিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে, কোনদিন খড়খড়ির পাখি তুলে দেখেছে সরোজকে।

সরোজ যা বলল, মিলেছে। তবু চিন্তা করছে ভূপতিচরণ। 'হ্যাঁ' বলবে, না, 'না'? 'হ্যাঁ' বললে, আসবে ঘন ঘন। বসে বসে কুসুমিকার গান শুনবে। কুসুমিকাকে তো জানে ভূপতিচরণ। তার চোখের সামনে আর একটা ফুলের মতো ছেলে মায়ের কোল খালি করে চলে যাক—এ আর সহ্য হয় না। সরোজকে বাঁচাতেই হবে কুসুমিকার দৃষ্টি থেকে। সরোজের ধ্যান-জ্ঞান মন থেকে মুছে ফেলতে হবে।

'না' বলেও কি কুসুমিকার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে পারবে সরোজকে? যে অবস্থায় এসে গেছে এখন, গান যখন কানে পেঁছিছে, তখন অসম্ভব। ছেলেটার মুখখানা মায়ামাখানো। কুসুমিকার কি অখণ্ড পরমায়ু? মৃত্যু নেই! ও গেলেই তো সব ঝামেলা চুকে যায়।

আবার দরজায় টোকার আওয়াজ। কুসুমিকা এসেছে। দরজা খুলতে উঠতে যাচ্ছে ভূপতিচরণ, সরোজ বলে উঠল, কিছু বললেন না তো?

বিষণ্ণের হাসি হেসে ভূপতিচরণ বলল, একটু চিন্তা করতে দিন, পরে বলবো।

দরজা খুলল।

ভূপতিচরণকে খবর দিয়ে গেল কুসুমিকা—ওপরে ভাত বাড়া হয়ে গেছে দুজনের, ভূপতিচরণের আর সরোজের।

সরোজকে নিয়ে এলো ওপরে ভূপতিচরণ।

শোওয়ার ঘরেই খাওয়ার জায়গা করা। দেয়ালে তানপুরা ঝোলানো। গানের সমস্ত সরঞ্জাম রয়েছে ঘরে। হারমোনিয়াম বাঁয়া-তবলা, মায় সারেঙ্গী।

একদিকে একখানা সেকেলে খাট। আয়না বসানো আলমারী একটা। দেয়ালে কোন ছবি নেই। না মানুষের না দেব-দেবীর।

দু'জনে খাচ্ছে, পর্দার আড়াল থেকে খাওয়ার তত্ত্বাবধান করছে কুসুমিকা। কালো ওড়নায় ঢাকা। আজ আর সেদিনের মতন গোলাপী শাড়ী গোলাপী ব্লাউজ পরনে নেই। তবে আজো রং মেলানো জামা শাড়ী—সবুজ। কিন্তু ওড়নার রং বদলায় নি। সেই কাজল কালো। মুখ কেমন দেখা যায় না। এমনি বেশ ফর্সা।

ভূপতিচরণের নিষেধ সত্ত্বেও আবেগ চাপতে পরেনি কুসুমিকা। ভাত আর চাই কিনা জিজ্ঞেস করতে পরদার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে, অন্য কথা জিজ্ঞেস করে বসল সরোজকে !—

আচ্ছা, ডালিমতলার ওধারে কি যাতায়াত ছিল কখনো আপনার ?

ভূপতিচরণ হতভম্ব।

যেটুকু খেয়েছিল, ঐ অবধিই ইতি হয়ে গেল। মাছ দিয়ে মাখা ভাত আর মুখে উঠল না।

আনন্দে আত্মহারা সরোজ। কুসুমিকার মুখে 'ডালিমতলা' শুনে, মনে হল ডালিমতলার যে বাড়ি থেকে গানের আওয়াজ ভেসে আসত তার কানে, সেই বাড়িতেই এসেছে যেন সে। যার গান শুনত, সেই যেন জিজ্ঞেস করছে !

সারা শরীরে আনন্দ ঠাসা। গলার স্বর বেরুনোরও রাস্তা নেই। কয়েক মুহূর্ত লেগেছে অভিভূত ভাবটা কাটাতে। কাটার সঙ্গে সঙ্গে মুখে নয়, মাথা নেড়ে জানিয়েছে 'হ্যাঁ'।

দু'জনেই দু'জনের ছোটবেলায় ফিরে গেছে ছোটবেলার ঘটনা বলার মধ্যে দিয়ে, একজন অন্যজনের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। সরোজ শ্রোতা, গায়িকা কুসুমিকা।

কলকাতা থেকে সরোজ আসে। গান শোনে। কুসুমিকাই পাঠিয়ে দেয় আবার মেসে। বলে, দেশে মা রয়েছে। বাবা নেই। গান শোনার জন্য কাজকর্ম ছাড়লে চলবে না।

বিপদ হয়েছে ভূপতিচরণের। সরোজ আসার সময় স্টেশনে গিয়ে আনতে হয়। যাওয়ার সময় পৌঁছেও দিয়ে আসে আবার। সরোজ বলে না, বরং আপত্তি করে।—আপনি এত স্নেহ করেন, বড্ড বাচ্চা ভাবেন আমাকে। ঝড় নেই বৃষ্টি নেই রোদ্দুর নেই—রোজ আসা যাওয়া—কত কষ্ট বলুন তো ? আমার বড্ড লজ্জা করে। রাস্তাঘাট তো আমি চিনে গেছি।

রাস্তার ওদিকটায় বিরাট জলাভূমি। ভূপতিচরণ চেয়ে থাকে।

সরোজ বলে, ওটা কি—আমি তো জানি। আপনার কোন ভয়ের কারণ নেই।

ভয়ের কারণ নেই বললেই কি মন মানে ? ভূপতিচরণের যে স্বচক্ষে দেখা।

অন্যমনস্ক ভাবে বলে ওঠে, না, না। কোন কষ্ট নয়। দিন-রাতই তো বাড়িতে বসে আছি। বয়স হয়েছে। একটু নড়াচড়া না করলে একেবারে পঙ্গু হয়ে যাবো যে। আমি কি আর নিয়ে যেতে পেঁাছে দিতে আসি? নিজের স্বার্থে। এটাই উপলক্ষ্য করে নিজের একটু চলাফেরা বেড়ানো, এই যা।

ভূপতিচরণের হাসির প্রলেপ লাগে ঠোঁটে। এ হাসি ভেতরের নয়! বিষাদের ছায়া মেশানো। ভদ্রতার অভ্যস্ত হাসি।

রাস্তা চলতে চলতে দু'টি তরুণের মুখ ভেসে ওঠে। জলাভূমির ওপরে ভাসে কেবল। ভূপতিচরণকে পাগল করে তোলে। দু'টো মুখের ঠোঁট নড়ে ওঠে একসঙ্গে। বাতাসে ফিস ফিস করে বলে ওরা।—কতদিন আগলে আগলে রাখবে সরোজকে। আমাদের কাছে তো আসতে হবেই ওকে। তার চেয়ে ছেড়ে দাও না!

যতদূর চোখ যায়, ভূপতিচরণের চোখ থেকে দু'টি যুগল মুখ মুছে যেতে চায় না কিছুতেই। স্টেশন অবধি ভেসে ভেসে চলে জলাভূমির ওপর দিয়ে। ফেরার সময়ও ওই একই জ্বালা। বাড়ি পেঁাছনো পর্যন্ত।

ওরা বলে, জানি, আমাদের নিয়ে তোমার জ্বালা। ইচ্ছে করে দিই না ..মরা। আমরা যে ডুবে যাচ্ছি, ধরে তুলতে পারছো না তুমি? কেন—চুলের মুঠি ধরে টেনে তোল না। আমরা যে ধরার কিছু খুঁজে পাচ্ছি না কোনদিক দিয়েই। কাদায় তলিয়ে যাচ্ছি। কাদার পাতালে নামছি। নামছি নামছি। বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও!

দু'চোখে হাত চাপা দেয় ভূপতিচরণ। অস্থির গলায় বলে ওঠে সরোজ, কি হ'ল—চোখে কিছু পড়ল নাকি? দেখি, দেখি দেখি।

ভূপতিচরণের কান্নাভেজা কথা। বলে, না। কিছু না। চোখটা ডাক্তারকে ..াতে হবে একবার। হঠাৎ জ্বালা করে ওঠে ভীষণ।

চোখ বলে কথা, দেরী করবেন না মোটে। আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। ..ল কলকাতায় চলুন। উত্তরের আশায় ভূপতিচরণের মুখের দিকে চেয়ে ..য়েছে সরোজ।

ভূপতিচরণ হাসতে হাসতে বলে, ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। এ চোখ অন্ধ ..য়ে গেলে বাঁচতুম। তা হওয়ার নয়। আর দিনকতক দেখে তারপর একটা ব্যবস্থা ..া করতে হবেই। কলকাতার ডাক্তার দেখানো কেন, বাড়িটা বেচে দিয়ে ..লকাতায় গিয়ে ডেরা বাঁধলেই তো হয়। এবার একটা কোন ব্যবস্থা না করলেই ।

মুখে বললেও, বাড়ী বিক্রি যে করা যাবে না জীবনে—এটা ভালোরকমই ..নে ভূপতিচরণ। ভিটের মাটিতে ইঁটের গাঁথুনিতে অতৃপ্ত মানুষের চোখের ..ল শুকিয়ে রয়েছে, ব্যথার নিশ্বাস সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমনি দিলেও নেবে কেউ। তলায় তলায় চেষ্টা কি আর না করেছে ভূপতিচরণ? হয়রানই ..য়েছে। খদ্দের এলেই গাঁয়ের লোকের কানভাঙানি। কুসুমিকার জীবনের দু'টি ..ত্য ঘটনা ঘিরে এমন ডালপালা বিস্তার করবে ওরা, আগন্তুকরা ত্রাসে হাজার ..ত দূরে পালাবে। কুসুমিকার জীবনে যে ঘটনা এসেছে, সেই ঘটনার শিকার

হতে হবে সকলকেই।

ভূপতিচরণ ভাগ্যগণনা করতে জানে না। বলতে পারে না। কিন্তু ভাগ্যগণনা করে, তারা তো কুসুমিকাকে সৌভাগ্যবতী সুলক্ষণা অনেক কি বিশেষণে ভূষিত করেছিল। মিলল কই!

বিনা কলঙ্কে কলঙ্ক রটল চতুর্দিকে। যে পাত্র দেখতে আসছে, বিয়ে ... চাইছে, তাকেই নাকি কুসুমিকা গিলে খায়।

কুসুমিকার গানের গলা ভালো—এই কি ওর অপরাধ?

প্রথম এলো সুশান্ত।

এই গাঁয়েরই ছেলে। গানের টানে আলাপ জমাল ভূপতিচরণের সঙ্গে। ও গান শুনতে আসে রোজ। রাস্তায় চলে, গুন গুন করে কুসুমিকার গান গায় গানপাগল সুশান্ত কুসুমিকাকে পরিণয়ের বাঁধনে বাঁধতে চাইল। বাড়ির লোকে অমত ছিল না। মেয়ের একটা মস্ত খুঁত আছে সত্যি, কিন্তু সব খুঁত ঢেকে দে ওই কিন্নরীকণ্ঠ। বিয়ের দিন ঠিকঠাক। দুবাড়িতে—কুসুমিকার আর সুশান্তর— আনন্দের ফোয়ারা ছুটছে। গ্রামসুদ্ধ লোকও পাতপাড়ার জন্য বিয়ের দি গুনছে ক্ষণ গুনছে।

কানে কানে মুখে মুখে চোখে চোখে কত কথাই না হাঁটছে চলাফেরা করছে গুণ না থাকলে কি আর হয়! কুসুমিকা গুণী মেয়ে। বছর ছয়েক হল বা কিনল ওরা এখানে। ছ-বছর তো নয়—যেন ছ'পুরুষের বাস ওদের এ গাঁয়ে ছোট বড় সকলেরই সঙ্গে কি মেলামেশা কি ভাবভালোবাসা। সমস্ত লোকই তে হাতের মুঠোয়।

ডালিমতলার বাড়িটা দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গেল। ঋণ শোধের প যেটুকু পাওয়া গেল, কলকাতায় থাকা যায় না। গাঁয়ে বাস করতে বাধ্য হ ভূপতিচরণ।

বিয়ের দিনের ঘটনা মর্মান্তিক ঘটনা

গায়েহলুদ—হয়ে যাওয়ার পর বারণ করেছিল সুশান্তকে বাইরে বেরু সকলে। শুনল না। দড়িছেঁড়া হয়ে বেরুনো যাকে বলে, সেইরকম বেরি এলো। গুরুজনদের অমান্য, বন্ধুদের হেনস্থা—দুর্ব্যবহারের চরম করল সকলে সঙ্গে। এরকম বড় একটা করে না সুশান্ত। ঠাণ্ডা গোছের মানুষ বিবেকবু হারিয়ে ক্ষেপে উঠল। কারণ—কারণ একবারটি কুসুমিকার একখানা গান শু আসতে চেয়েছিল সুশান্ত। বাড়ির আপত্তি রাত্তিরে তো বাসরঘরে শুন পাবেই, এখন আবার যাওয়া কেন—এ অবস্থায় যাওয়াটা আচার বিরুদ্ধ। ছাড়া লোকসমাজ বলেও তো একটা আছে। ভালো দেখায় না। লোকে বল আদেখলা। যেতে হবে না।

আর দেখে কে! যাবেই—পৃথিবী একদিকে সে একদিকে। সুশান্ত শুভদি অশান্তির ঝড় তুলে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। চান না করেই। গায়ে তেলহলু মাখানো। কোরা লালপাড় ধুতি পরা। কোমরে নতুন গামছা বাঁধা। সে অবস্থায়।

মৃত্যু টেনে নিয়ে এলো সুশান্তকে সকলের অগোচরে। দৃষ্টিবিভ্রম ঘটল
র। রাস্তায় চলতে চলতে যেমন কুসুমিকার গান গায় রোজ, তেমনি গাইছে!
াস্তার ওদিকটায় জলাভূমি জানে। ওদিকে কেউ যায় না। ও গেল সেদিন
লাভূমিকে দেখল রাস্তা, আর রাস্তাকে জলাভূমি। পেছনে যাদের নজরে পড়েছে,
ারা চিৎকার করে বলেছে, সুশান্ত জলাভূমির দিকে যাচ্ছো। রাস্তায় চলে এসো।
টা রাস্তা নয়, ওটা রাস্তা নয়।

সুশান্ত সপ্তমে গলা চড়িয়ে উত্তর দিয়েছে, তোমরা মিথ্যে ভয় দেখালে, ভয়
াব না আমি। আমি ঠিকই যাচ্ছি।

পেছনের লোক ধরার জন্যে ছুটে আসছে। প্রাণপণে দৌড়তে লাগল
শান্ত।

জলার কাদামাটিতে পা ডুবল। ডুবে যাচ্ছে সুশান্ত।

রাস্তার গোলমালে ভূপতিচরণ বেরিয়ে এসেছে বাইরে। দৃশ্য দেখে চক্ষুস্থির,
কের রক্ত জমাট! কুসুমিকা এসে দাঁড়িয়েছে জানলায়। আর্তনাদ করে উঠল
হূর্তের জন্য সুশান্ত—মাথাটা ডুবে যাওয়ার আগে। পৃথিবী থেকে শেষ বিদায়
ওয়ার আগে।—কুসুমিকা! বাঁচাও, বাঁচাও।

অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে জানলার ধারে কুসুমিকা।

জ্ঞান হওয়ার পর কুসুমিকার মুখে একই কথা—আমাকে ছেড়ে দাও! সুশান্ত
কছে। ওকে বাঁচাতে হবে।

এটা একটা রোগে দাঁড়িয়ে গেল কুসুমিকার।

ডাক্তাররা পরামর্শ দিল একটু বাইরে ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে। জানলার ধারে
ড়িয়ে জলাভূমি দেখবে এখানে থাকলে। সুশান্তর মৃত্যুর দৃশ্য ভেসে উঠবে
খুনি ওর চোখের সামনে।

বড় দিদিমার কাছে কুসুমিকাকে নিয়ে গেছে ভূপতিচরণ বেনারসে।

ডালিমতলার বাড়ি যেতে ভূপতিচরণ মেয়েকে নিয়ে এসেছে একবার বিধবা
শুড়ীর কাছে। পিতৃভিটে বিসর্জন দেয়ার জ্বালা জুড়তে। তখন মাস
াষ্টেক ছিল।

থাকতে হয়েছিল কুসুমিকার জন্য। জ্বালা জুড়তে এসে জ্বালা বেড়েছে।

শিবরাত্তিরের দিন কুসুমিকার উপোস। বিশ্বনাথ দর্শন করেছে। তার
াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে পাহাড় প্রমাণ সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে গঙ্গায় মাথা
বিয়েছে। কোন নিত্যকৃত্যের ত্রুটি হয়নি। দিদিমা বাড়িতে এসে বলল,
বার জল খা। নাতনি উত্তর দিল, তোমার খিদে পায়, তুমি খাও না দিদা।
মার এখনো যে পুজো বাকি!

দিদার দুচোখে বিস্ময়।—বলিস কি লো? তুই কাঁচা মেয়ে শুকিয়ে থাকবি,
ার আমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে—লাজলজ্জার মাথা খেয়েছি কি—
ামি খেয়ে বসে থাকবো! পুজো তো করিয়ে নিয়ে আনলুম। আবার

কিসের পুজো ?

—ঘরের শিবের বাতি বাকি। ঘি-ভর্তি মাটির প্রদীপে থালা সাজিয়ে হাসতে হাসতে নিচে নেমে গেল কুসুমিকা।

উঠোনে শিবমন্দির। দিদিমার শ্বশুরের প্রতিষ্ঠা করা। পর পর চোদ্দ বাতি জ্বালাল। পাথরের কালো কুচকুচে তেল চকচকে শিবলিঙ্গের সামনে এক একটা করে সাজিয়ে দিল। মাথা নিচু করে প্রণাম করছে। প্রদীপের শিখায় শাড়ীর আঁচল জ্বলল ।

মজুরনী ভুলুয়ার মায়ের—বহিনজি জ্বল গ্যায়, বহিনজি জ্বল গ্যায় চিৎকারে তরতরিয়ে ওপর থেকে নেমে এলো ভূপতিচরণ। ততক্ষণে মেয়ের বাঁ অঙ্গটা ঝলসে গেছে। মুখখানাই বেশী। অমন সুন্দর মুখের বাঁদিকটা বি কুশ্রী হয়ে গেছে।

কুসুমিকা বাঁচল।

কিন্তু এ বাঁচা যে মরারই সামিল হল তার। বিয়ে হবে কি করে, কে নেবে এ মেয়েকে ?

ভাবনায় ভাবনায় ভূপতিচরণ দিশেহারা হয়ে পড়তে লাগল। কত ডাক্তারি ওষুধ কবিরাজী ওষুধ মায় টোটকা—সাধুসন্ন্যাসীর স্বপ্নে পাওয়া ওষুধ—কিছু আর লাগাতে বাকি রাখেনি মেয়ের মুখের বাঁদিকটা সুশ্রী করে তুলতে।

কিছুতেই কিছু হল না।

কালো ওড়নায় গোটা মুখটাই ঢেকে রাখত কুসুমিকা। মুখ বিকৃত হয়ে যেতে যত না দুঃখ পেয়েছে কুসুমিকা, তত দুঃখ পেয়েছে গানের গলা যেতে কান্না-ভেজা গলায় বলেছে বাবাকে, একটা পয়ার কর বাবা! গলা গেলে বেঁচে কি লাভ আমার ?

বাবাও নীরবে আড়ালে চোখের জল মুছেছে রুমালে। গাইতে গেলে গলা বসে যায়, স্বর বেরোয় না একদম। সুর বেরুনো তো দূরের কথা। দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ভূপতিচরণ। ভূপতিচরণ নিরুপায়। চিকিৎসকরা রায় দিয়েছে, অনেক ওষুধ খাওয়ান হল, কিছু হল না। তাদের করবার কিছু নেই আর। একই ওষুধে রুগী বাঁচছে, আবার সেই ওষুধে অন্যের কিছু হল না —মারাই গেল। চিকিৎসকের কি হাত আছে কিছু করার ? চেষ্টা শুধু।

ভগবানের ওপর ছেড়ে দিতে উপদেশ দিল চিকিৎসকেরা। যাকে দেখা যায় না। জানা যায় না। মনে হয় নির্দোষ মেয়েটার এমন হল—কেউ থাকলে রক্ষে করল না কেন ? এসব চিন্তায় মাথা গুলিয়ে যায় ভূপতিচরণের। কাকে আর বলবে ? শাশুড়ীকেই বলে মনের কথা।

নাক-কান মলে শাশুড়ী বলে, বাবা বিশ্বাস রাখো। তুমি যদি নেই-নেই ভাবো—তোমার কাছে তিনি নেই। আবার আছে ভাবলে তিনি আছেন প্রার্থনা কর, শুধু প্রার্থনা। বাবরের প্রার্থনায় হুমায়ুন কি সুস্থ হয়ে ওঠে নি

ভূপতিচরণ প্রার্থনা করেছে। মনে মনে বলেছে, পৃথিবী জুড়ে যে বিরা শক্তির খেলা চলেছে, সেই শক্তির কাছে প্রার্থনা করছি আমি। আগের মতো হ

উঠুক কুসুমিকার গলা।

প্রার্থনায় হল কি সাধুর দৌলতে হল কিছু বুঝতে পারা গেল না। আবার আগের গলা ফিরে এলো কুসুমিকার।

সন্ধ্যের দিকে দশাশ্বমেধ ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে বাপ-মেয়ে বেড়াচ্ছে। একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী একটা লোহার ছড়ের ওপর একটা লোহার টুকরো ঠুকে ঠুকে জলতরঙ্গের সুন্দর মিষ্টি বাজনা তুলছে। ভজন গাইছে। বৃদ্ধের গলাটিও এমন, কানে যেন অমৃত ঢালছে।

কাছে গিয়ে পা মুড়ে বসল কুসুমিকা। শুনছে, ঠোঁট নাড়ছে। মনে মনে গাইছে। দু'চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে।

চোখ বুজে গান গাইছিল সন্ন্যাসী। গান শেষ হতে চোখ খুলল। সামনে কুসুমিকাকে দেখে বলল, কিঁউ বেটি, রোতি কিঁউ?

ভূপতিচরণ বলল, কেন কাঁদছে।

সন্ন্যাসী হাসল। বলল, হামারে সাথ গানা গাও।

অনেক চেষ্টা করল। পারল না কুসুমিকা। কান্নায় ভেঙে পড়ল।

আপন মনে কি ভাবল খানিক সন্ন্যাসী। তারপর কাঁদতে বারণ করল। ভূপতিচরণকে বুঝিয়ে বলে দিল! সদাসর্বদা কুসুমিকা যেন ভাবে, নিশ্চয় আগের গলা ফিরে আসবে তার। ঘুমনোর আগে যেন অন্তত আট-দশবার করে বলে রোজ। কোনদিন ব্যতিক্রম না হয়।

ভূপতিচরণের কানে কানে বলেছে, মেয়ের বিয়ে বিয়ে করে ভেবে অত সারা হচ্ছিস কেন? মানুষের সঙ্গে ওর বিয়ে নাই বা হল। নাই বা ওকে পছন্দ করল কেউ। কি এসে যায়? গানই ওর স্বামী গানই ওর সন্তান গানই ওর প্রাণ। এই ধ্যানজ্ঞানে গানের ভজনা করুক ও। গান ওর হবেই। ওর গান বনের পশুপক্ষীও কান খাড়া করে শুনবে। ভাবতে হবে আমার গান লোকে শোনামাত্র মুগ্ধ হয়ে যাবে। আমার গান—গলা লোকের মনে বাজবে। ঘুমন্ত অবস্থায় জাগা অবস্থায়—সদাসর্বদা।

একটু থেমে সন্ন্যাসী আবার বলেছে, যা হয় ভালোর জন্য—বুঝলি? মুখখানা ওরকম হয়েছে, ভালো। ঈশ্বরের ইচ্ছে, বিয়ে না হওয়া। গানের মধ্যে দিয়ে তাঁকে চাওয়া তাঁকে পাওয়া—এটাই হয়তো ওর এ জীবনের সাধনা। সংসার হয়তো হওয়ার নয় ওর।

সংসার হয়তো হওয়ার নয় ওর—কথাটা সত্যি হোক, নিছক স্তোকবাক্য হোক কিন্তু এ সময়ের জন্য মস্ত সান্ত্বনা একটা। বেনারসে আবার এসেছে ভূপতিচরণ কুসুমিকাকে নিয়ে। আশা—সুশান্তর জন্য মেয়ের যে পাগল পাগল অবস্থা—সেরে যেতে পারে। আগের বারে সন্ন্যাসীর নির্দেশ মেয়ে মনেপ্রাণে পালন করেছে। এখনো করে যায়। গলা ভালো হয়ে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছেয় ভালো হয়েছে। চাক্ষুষ প্রমাণ।

গঙ্গার ধারে ধারে মেয়েকে নিয়ে ঘুরেছে, সে সন্ন্যাসীটির দেখা মেলে নি

আর। কিন্তু মনের পরিবর্তন হয়েছে কুসুমিকার। সংসার হয়তো হওয়ার নয় ওর—অনবরত তাই মনে হয়েছে। কুসুমিকা শান্ত হয়েছে। বাবা শুনিয়েছে, গানই তোমার স্বামীপুত্র। গান ধরেছে আবার কুসুমিকা।

মাসচারেক বাদে বেনারস থেকে বাপ-মেয়ে ফিরছে কালিকাপুরে।

যা-তা রটনার জ্বালায় কান পাততে পারেনি। একঘরে হয়ে থেকেছে নিজেদের বাড়িতে। গানই ওদের সঙ্গী। গানই ওদের শান্তি।

কিন্তু শান্তিতে থাকতে পারল কই বরাবর? বছরচারেক যা ছিল, তারপরেই আবার বিপত্তি। এলো বিনয়। বিনয়কে নিয়ে এলো কুসুমিকার পিসতুতো বোন পূর্ণিমা। নিজের দেওর। গান খুব ভালোবাসে। কুসুমটার আইবুড়ো নাম যদি খণ্ডায়—চেষ্টা করতে দোষ কি?

ভূপতিচরণ রাজী হয়নি। কুসুমিকার ওপর আর তার ওপর গ্রামের লোকের মনোভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। স্মরণ করিয়ে দিয়েছে সুশান্তর ব্যাপার। আর বলতে ভোলেনি বেনারসের সেই সন্ন্যাসীর সান্ত্বনাবাণী—'সংসার হয়তো হওয়ার নয় ওর'…গানই স্বামী-সন্তান…।

পূর্ণিমা বলেছে, পিসেমশাই, ওনারা মানুষকে স্থির রাখবার জন্য যখন যেমন উপদেশ দেয়া বোঝেন, দেন। বাস্তবে ওসব ধরে থাকলে চলে না চিরদিন। একটা নতুন ক্ষতের ওপর সাময়িক একটা প্রলেপ ওঁদের উপদেশ। তুমি আজ আছো, তারপর? মেয়েছেলের একটা অবলম্বন না হলে চলে নাকি? গানে শান্তি আসতে পারে আনন্দ আসতে পারে—স্বীকার করি। তা বলে গান অভিভাবকদের গদি দখল করতে পারে কেমন করে?

পিসে কোন কথার জবাব দিচ্ছে না, চিন্তামগ্ন। চিন্তা করতে সুযোগ দেয়া উচিত। পূর্ণিমা চুপ করে বসে রইল খানিক। পিসের জোরে নিশ্বাস পড়ার শব্দ শুনে বুঝল, কথাটা দাগ কেটেছে মনে। অন্য দিকে একটু-আধটু দ্বিধা পাছে—সেটা থাকা সম্ভব। কি দ্বিধা জানে পূর্ণিমা। পূর্ণিমা বলল, কুসুমের বদনামের কথা আমি কি আর ওকে বলতে বাকি রেখেছি নাকি? পুড়ে যাওয়ার কথাও গোপন করিনি। সব বলে-কয়েই তো এনেছি। সব জেনেশুনেই তো এসেছে বিনয়।

কুসুমিকার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছে বিনয়। আসা-যাওয়া শুরু করেছে প্রতিদিন। কুসুমিকার গান তার জপমালা হয়ে উঠেছে, একেবারে দ্বিতীয় সুশান্ত। সুশান্তর কথা মনে হলে, বুকের ভেতর ছাঁৎ করে উঠত ভূপতিচরণের। কেবলি মনে হ'ত একটা অমঙ্গল ঘুরেফিরে সাজপোশাক পাল্টে আবার আসছে হয়তো।

হ্যাঁ, সাজপোশাক পাল্টেই এলো।

সুশান্তের মতো গায়েহলুদের দিনে নয়, বিয়ের মাসখানেক আগে বিনয় চলে গেল। ঠিক ওইভাবে ওইখানে। জলাভূমির যে জায়গাটায় কাদায় ঢাকা মরণগহ্বর।

তখন দোতলার ঘরে বসে কুসুমিকা গাইছিল—যে গানটা শুনতে ভালোবাসত বিনয়। পহছানো জী আপনেকো, কৌন হ্যায় তুম, আর কৌন হ্যায় হম, হম হ্যায় তুম, আউর তুম হ্যায় হম···।

বিনয় আসছিল, শুনতে শুনতে একই ভুল করল। জলাভূমিকে রাস্তা দেখল, রাস্তাকে জলাভূমি।

ডুবে যাওয়ার সময় বিনয়ও কুসুমিকার নাম ধরে আর্তনাদ করে উঠেছিল। বাঁচাও-বাঁচাও বলে আকুলি-বিকুলি করেছিল।

তানপুরা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল কুসুমিকা। জানলায় এসে বিনয়ের ভয়-কাতর মুখখানাকে হারিয়ে যেতে দেখেছে। এখারেও চতুর্দিক অন্ধকার দেখে, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে কুসুমিকা।

কুসুমিকার জীবনের প্রথম দ্বিতীয় অধ্যায়ের মতো তৃতীয় অধ্যায়েরও যবনিকা পড়বে। চিন্তায় চিন্তায় পাগল হ'তে বসেছে ভূপতিচরণ। যে ভাবে দ্রুত এগোচ্ছে সরোজ। বিধাতার রোষ নেমে এলো বলে ওর মাথায়।

ভূপতিচরণ এই ভয়ই করেছিল। গোড়া থেকে সতর্ক হয়ে চলেছিল। দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল কুসুমিকাকে। পারেনি। নানারকম বুঝিয়ে, ভয় ঢুকিয়ে সরোজের আসা বন্ধ করতে চেয়েছে, পারেনি।

নিজের কপাল চাপড়ে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে ভূপতিচরণের। কেমন করে বাঁচাবে সরোজকে? পথ নেই—নেই সরোজের বেরুনোর কোন পথ। কুসুমিকা যে সাক্ষাৎ কাল হয়ে দাঁড়াল ছেলেদের। লখিন্দরের লোহার ঘরেও মৃত্যু হয়েছে। কালনাগিনী ছেঁদা রাখার ব্যবস্থা করেছিল ঠিকই। রেহাই নেই কালনাগিনীর হাত থেকে। গানের টানে মানুষের মন আটকে রাখার চিন্তা কুসুমিকা যদি না ছাড়ে, কারো মুক্তি নেই। রুদ্ধশ্বাস মৃত্যু শিয়রে ঘোরাফেরা করবেই টপ করে গিলে ফেলার জন্য।

কুসুমিকাকে গান বন্ধ করতে বলবে ভূপতিচরণ? খোলাখুলি বলবে সব? না বলেও তো আর কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না। কুসুমিকাকে কিছু বলতে গেলেই ওর মায়ের মুখখানা ভেসে ওঠে অমনি। মেয়েটার মুখের আদল কতকটা মায়েরই মতো। মুখের দিকে তাকাতে পারে না ভূপতিচরণ। মনে পড়ে যায় স্ত্রীর শেষের কথা।—তুমি ইচ্ছে করলে বিয়ে করতে পারো—আমার কোন দুঃখ নেই। তবে একটু দেখেশুনে মেয়ে এনো। কুসুম বড় অভিমানিনী। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য যেন না হয় ওর।

ভূপতিচরণ স্ত্রীর হাত ধরে বলেছে, তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারো। কথা দিচ্ছি, ও আমার প্রাণের জিনিস তোমার মতো। জীবন থাকতে ওর কোন কষ্ট হতে দেবো না। আর কথা দিচ্ছি বিয়ে আমি করবোই না।

অনেক আদরের কুসুমিকা। ভূপতিচরণকে এমনভাবে বলতে হবে, কোন ব্যাপারে অভিমানের ক্ষোভের ছায়া যেন ঢেকে না দেয় ওর মনকে। জীবনে কিছুই পেল না হতভাগিনী। শুধু আঘাত আর আঘাত। গানটা ওর একমাত্র সম্বল। সেটা বন্ধ করতে চাইছে ভূপতিচরণ। ক্ষণিকের আনন্দ যেটুকুও বা

পেত, তাও হারাতে হবে ওকে। আর ভূপতিচরণ নিজে হাতে তুলে দেবে সেই নির্মম দণ্ড।

বিধাতার কি নিষ্ঠুর পরিহাস। স্ত্রীর জলভরা চোখ দেখছে। বিড় বিড় করে বলল ভূপতিচরণ। —এই যে একটা ছেলে অকালে চলে যাচ্ছে, সব দোষ ঘাড়ে পড়ছে কুসুমিকার ওপর। কুসুমিকা খুনী। বলো, মেয়ের নামে এই কথা শুনে কোন্ বাপের না বুক ফেটে যায় ?

পায়ে পায়ে এগুল ভূপতিচরণ। কুসুমিকার ঘরে যাবে। সরোজকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা। কুসুমিকাকেও আর একটা নতুন বদনামের হাত থেকে রক্ষা করা। ঘরে এলো।

কুসুমিকা মেঝেয় কার্পেটের ওপর বসে তানপুরার ছেঁড়া তার খুলে ফেলে নতুন তার লাগানোর তোড়জোড় করছে।

ভূপতিচরণ বসল। দরজা দিয়ে দুচোখ চক্কর দিয়ে এলো বারান্দায়। কেউ আছে কিনা, কেউ আসছে কিনা। চাপা গলায় বলল, মা, তোমার সঙ্গে একটু বিশেষ কথা ছিল। এখন সুবিধে হবে ?

সুর বাঁধার গোল করে পাকানো সরু তারটা খুলল না আর কুসুমিকা। হাতের আঙুল থমকাল। পাশে রেখে বাবার মুখের দিকে তাকাল।

ভূপতিচরণ সমস্ত বলল। বলল, সুশান্ত বিনয়ের মতো সরোজও কি শেষে চলে যাবে মা! ওকে কি বাঁচানো যায় না ? গানটা যদি—আর তোমার ইচ্ছেটা যদি—

বাকিটা আর বলতে পারল না ভূপতিচরণ। কে যেন হাত চেপে ধরল মুখে। বাবা কি বলতে চায়, বোঝার অসুবিধে হয়নি কুসুমিকার।

ভূপতিচরণ ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে, তানপুরাটা দেয়ালের হুকে ঝুলিয়ে রাখল কুসুমিকা। সুর বাঁধা আর হল না, গলা সাধা আর হল না। গম্ভীর হয়ে গেল কুসুমিকা।

দেয়ালে তানপুরা রাখার সময় বেসুরো তারের ঝংকার দুলে উঠল বাতাসে! কুসুমিকা শুনল বেনারসের সন্ন্যাসীর কথা…সংসার হওয়া নয় ওর, নয় ওর, নয় ওর…।

জানলায় এসে দাঁড়াল।

জলাভূমির দিকে তাকিয়ে আছে। মায়াবী পানায় ভর্তি। যেন মাটির ওপর মাথা নীচু গাছে গাছে ছয়লাপ।

কুসুমিকা দেখছে, কাদা-পানা দুহাতে ঠেলে দিয়ে কে যেন মাথা তুলছে। যে মাথা তুলল, তার মুখ অচেনা নয়। সুশান্ত। পাশে আর একজনের মুখ দেখা যাচ্ছে! বিনয়ের। ওরা দুজনে একসঙ্গে দুহাত তুলে চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

—কুসুমিকা আমাদের বাঁচাও।

দুচোখে হাত চাপা দিয়ে কুসুমিকা বসে পড়ল। তবু নিস্তার নেই। হাত চাপা অবস্থায় দেখছে, সরোজ ডুবছে, বাঁচানোর জন্য হাত নেড়ে ডাকছে ওকে।

বাবার কথা শুনছে, সুশান্ত বিনয়ের মতো সরোজও কি শেষে চলে যাবে মা ? ওকে কি বাঁচানো যায় না ?

নিজে নিজেই বলে উঠল কুসুমিকা, না, না। সরোজকে মরতে দেয়া হবে না কিছুতেই। ঘর থেকে বেরিয়ে এলো দৌড়ে, ভূপতিচরণের অলক্ষ্যে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকেই।

জলাভূমির সেই খুনে জায়গাটার কাছে এসেছে কুসুমিকা। ওইটাই কুসুমিকার জুড়নোর স্থান, চিরশান্তির স্থান। তার গানের জন্য গলার জন্য চিন্তার জন্য আর কোন ছেলেকে চলে যেতে হবে না। সে চলে গেলেই, এ অমঙ্গল নিঃশেষ হয়ে যাবে এ গাঁও থেকে।

কুসুমিকা দেখছে, সুশান্ত-বিনয়ের মুখ ওপরে ভেসে উঠেছে। ওরা ডুবে যাচ্ছে আবার। ডুবতে দেবে না কুসুমিকা, ওদের চুলের মুঠি ধরে তুলে নিয়ে আসবে। ঝাঁপিয়ে পড়ল কুসুমিকা জলাভূমির ওপর।

কুসুমিকা কোথায় চলে গেল, কেউ জানতে পারল না। লোকে বলে, কুসুমিকা রহস্যময়ী। কোথায় অদৃশ্য হয়েছে কে জানে। দুষ্টু মেয়েছেলেরা ওই রকমই হয় থেকে থেকে। সর্বনাশী আর যেন এ গাঁয়ে না আসে। গ্রামটা বাঁচুক, শান্তিতে ঘুমুক। ভূপতিচরণ তানপুরায় হাত বুলতে বুলতে জানলার দিকে চোখ ফেরায়। দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে ব্যথার নিশ্বাস ঝরে পড়ে—নিদারুণ যন্ত্রণা। মন বলে, অভিমানিনী নিরুদ্দেশ হয়নি কোথাও। সরোজকে বাঁচানোর জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছে ওই জলাভূমিতেই।

সরোজ আসে মাঝে মাঝে গাঁয়ে। তার ধারণা একদিন না একদিন ফিরে আসবে কুসুমিকা নিশ্চয়ই।

প্রতিবারই চলতে চলতে জলাভূমির দিকে এগিয়ে যায়। অনেক—অনেক আগে। ডাকলে সাড়াশব্দ দেয় না! জলকাদায় পা ডুবতে শুরু করে সরোজের।

ঠিক সেই সময়ে কুসুমিকাকে সামনের দিক থেকে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসতে দেখে! কুসুমিকা হাতের ইঙ্গিতে এগুতে বারণ করছে, পেছিয়ে যেতে বলছে। বলছে, আমি তো যাচ্ছি।

ঘুমের ঘোর আসে সরোজের চোখে। শক্ত মাটির ওপর শুরে পড়ে। বসে থাকতে পারে না এক মুহূর্ত।

সকালে গ্রামের বয়সী মেয়েরা চলার পথে সরোজ ঘুমুচ্ছে দেখে, চেঁচামেচি করে। হাত ধরে টেনে তোলে।

জেগে ওঠে সরোজ।

ফিরে যায় কলকাতায়।

আবার আসে কুসুমিকাকে দেখার জন্য! এটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন সরোজের কাছে। জানে গাঁয়ের লোক, জানে ভূপতিচরণ। ভূপতিচরণ উতলা

হয় না সরোজের জন্য আর। ওর কোন প্রাণের ভয় নেই। যার জন্য মৃত্যু হত ওর—সেই তো ওকে বাঁচাচ্ছে।

আজো এসেছে সরোজ।

জলাভূমির কাছ থেকে সরিয়ে দিয়েছে ওকে কুসুমিকা। কুসুমিকা এগিয়ে আসছে। শক্তমাটির ওপর বসে আছে সরোজ। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। ভারী হয়ে উঠছে দু'চোখের পাতা। ঘুম নামছে। একটা শান্তির আমেজ সারা শরীরে ঘুমের নরম পালক বুলিয়ে দিচ্ছে আস্তে আস্তে।

অনেক দূর থেকে কুসুমিকার গলার স্বর ভেসে আসছে যেন সরোজের কানে। আমি আসছি, আমি আসছি···মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে গলার স্বর। মিলিয়ে গেল।

তিন

সুলভার কাজলদীঘি চোখের তারায় কত অজানা-অতলের বিস্ময়-রাজ্য ভেসে বেড়াচ্ছে, যার দেখার চোখ আছে, সেই শুধু দেখতে পাবে।

আমাকে কিছু বলতে চায় নি প্রথমে। বলেছে, নাই বা শুনলেন আর ওসব কথা।

অনেক দেখা ঘটনার কাহিনী জমা থাকে মানুষের বুকের তলায়। মাথার মধ্যে অনেক দৃশ্য। এত কাহিনী এত দৃশ্য—একটা শরীরে একটা মনের পক্ষে এই নিদারুণ বোঝা বওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে সময়ে সময়ে। তখন কিছু প্রকাশের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, নিজেকে হাল্কা করে তোলার জন্যে নিজেকে স্বাভাবিক করে তোলার জন্যে। এ না হ'লে মনের সুস্থ ভাব বজায় থাকে না!

সুলভার মুখখানা বিষণ্ণ হয়ে উঠল, দৃষ্টি করুণ। কি যেন কি ভাবল একটু। আমাকে বলল, জানতেই যখন এসেছেন একটুও শুনে যান তা হ'লে।

সে রাতে পথে পা বাড়াতে বার বার নিষেধ করেছেন মিশ্রজি।

আমি শুনি নি। জিদ করেই বেরিয়ে পড়েছি।

সুলভার কথা শুনতে শুনতে আমিও যেন ওর সঙ্গে সে রাতের সেই রোমাঞ্চকর ট্রেনযাত্রার সঙ্গী হয়ে পড়েছি।...

মোকামার কাছ বরাবর আসতেই, বৃষ্টি নামাল মুষলধারে। ট্রেনের ঝকঝক আওয়াজের সঙ্গে বৃষ্টির ঝমঝম মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে?

জায়গাটা খারাপ—আগে থেকেই সুলভা শুনেছে। শুনেছে কেন—প্রত্যক্ষদর্শী আর ভুক্তভোগীরা তাদের দুর্দশার অভিজ্ঞতার বিবরণ পেশ করেছে যা—যে কোন মানুষ হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে মরণের কোলে ঢলে পড়তে পারে মুহূর্তে!

বাড়ি থেকে বেরোনোর মুখে মিশ্রজি সচেতন করে দিয়েছিল। বলেছিল, বেটি, হুঁশিয়ার হয়ে থাকবে। একা একা যাওয়াটা ভালো হল না। কাউকে সঙ্গে দিতুম, তর সইল না তোমার। বলার সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া চাই-ই।

নিজের দীর্ঘনিশ্বাসে বিপদের আভাস অনুভব করল বোধ হয় মিশ্রজি। নিঃশ্বাস ফেলার সঙ্গে বলে উঠল, ভেতরটা আমার খাঁ-খাঁ করছে কেন—বুঝতে পারছি না। আজ না গেলেই কি নয়?

বাপুজি, ঘাবড়াবেন না। আপনার এ মেয়ের জান বড় কড়া। তুলে আছাড় মারলেও মৃত্যু হবে না। হলে তো বাঁচতুম বাপুজি। সুলভার গলা ঘরে এলো।

না বেটি, ওসব ভাবছি না। বিশ্বনাথের দয়ায় তুমি ঠিক পেঁছে যাবে। ভালো খবর নিয়েই ফিরে আসবে।

মিশ্রজি সুলভার মুখের দিকে তাকাতে পারল না। দু'চোখ ছলছল করছে। সুলভারও চোখ জলে ভরতি। টাঙার পাদানিতে পা রাখল সুলভা।···

টাঙা ছুটছে, সাঁহিস শূন্যে চাবুক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সপাং করে বসিয়ে দিচ্ছে ঘোড়ার পিঠে। কালো, কুচকুচে তেজী ঘোড়াটা পিচের রাস্তায় খুরের খট-খট আওয়াজ তুলে, লাফাতে লাফাতে দৌড়োচ্ছে স্টেশনের দিকে।

স্টেশনে ভীড় থাকলেও, ট্রেনে উঠতে অসুবিধে হয়নি বিশেষ! কম্পার্টমেন্টে একটাও ছেলে নেই। সব কটাই মেয়ে বসে আছে। ছোট বড়—সব বয়সী। লেডিস কম্পার্টমেন্ট নয় এটা। কিন্তু উপস্থিত মেয়েদের দখলে গিয়ে, মেয়েদের কামরাই হয়ে গেছে বললে হয়।

বেনারস ক্যান্টনমেণ্ট থেকে ট্রেন চলতে শুরু করল। চলছে। সকলের ঝিমুনি আসছে। তন্দ্রা-তন্দ্রা ভাব।

বেশ খানিক এগিয়ে যাওয়ার পর—মোকামার কাছাকাছি আসতেই, একটা বিভীষিকার রাজ্য হয়ে উঠল কামরার ভেতর।

রাতের ট্রেন, সমস্ত মেয়েছেলে। ট্রেনের জানলা-দরজা এঁটে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ভেতর থেকে। নিজেদের মধ্যে আপসে কথাবার্তা হয়েছে—কেউ দরজা জানলা খুলবে না বাইরে থেকে কেউ ডাকাডাকি করলেও।

ট্রেন চলার পর থেকে কতবার যে জানলায় ঘা পড়ল ঠিক নেই নেই। একই গলার স্বর একজনই ডাকছে শুধু।—ম্যাঁয় গির যাঁউ। খোল দিজিয়ে মেহেরবানি করকে।

সুলভা দেখছে সকলের মুখে-চোখে ত্রাস ছেঁকে ধরেছে। সকলের ত্রাসে ভেতরটা থমথমে। রুদ্ধনিঃশ্বাসে বসে আছে সবাই।

সুলভা ভেবেছিল, দুষ্টু-বদমাশ যেই হোকনা—সাড়াশব্দ না পেলে, এ কামরার মোহ ছাড়বে। এরপর সারা রাস্তা নির্বিঘ্নে কাটাবে তারা।

তা হ'ল না।

বিপদ অনুসরণ করে চলছিল এতক্ষণ, এবার নিজমূর্তিতে প্রকাশ হওয়ার জন্য প্রস্তুত। হতে লাগল। জানলার ধাক্কাটা বেশ জোর জোর। যে দিকে বসেছিল সুলভা, সেই দিকের জানলাটা ভেঙে পড়ে বুঝি। কাঁপছে থর থর ক'রে।

কথা কইতে বারণ, তবু কথা না কয়ে উপায় ছিল না সুলভার।

ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে। এরকম অসভ্যতাও করতে পারে মানুষ! তীক্ষ্ম কণ্ঠে বলে উঠল, কৌন বেআদব। খোলেঙ্গী নহী।

বাইরে থেকে কর্কশ গলা—দেখা দেতা হুঁ।

দড়াম-দড়াম ক'রে জানলায় লাঠির ঘা, কি কিসের ঘা পড়ল কে জানে! জানলাটা খুলে গেল। চক্ষের নিমেষে কালো প্যান্ট-শার্ট পরা একটি জওয়ান ছেলে লাফিয়ে পড়ল ভেতরে।

হাতে রিভলভার। বলল, কেউ চিৎকার করেছো কি—বেঁচে ফিরতে হবে না আর।

দরজা খুলে দিল জওয়ান। পিল পিল করে ভেতরে ঢুকতে লাগল ওর সঙ্গীরা। প্রত্যেকের হাতে মজবুত লাঠি একখানা করে।

সুলভা দেখল, জওয়ানের যত আক্রোশ তার ওপর। সেই অসভ্য বলছে, খুলবো না বলেছে। জওয়ানের দুচোখ রক্তবর্ণ। কটমট করে তাকাচ্ছে। বলল, তোর লাশটাকে ছুঁড়ে ফেলে দোব মাঠে। ওই তোর উচিত সাজা।

কথাটা কানে প্রবেশ করতেই সুলভার স্নায়ু শিথিল হয়ে এলো। আত্মরক্ষার চেষ্টা, পালানোর চেষ্টা, বৃথা। কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে মানুষ যুঝে পেরে উঠবে না বলে কি যুঝবে না ?

সুলভা মরার আগেই মরেছে। দেহ পড়ে আছে তার। অসাড় নিষ্প্রাণ। এইরকম একটা ভাব এলো সুলভার। হঠাৎ নীলাঞ্জনকে দেখে চমকে উঠল। নীলাঞ্জন ওদের দলের লোকের সঙ্গে ভেতরে ঢুকছে।

সুলভা বিস্মিত। এদের দলে নীলাঞ্জন! এ যে স্বপ্নেও ভাবতে পারা যায় না। জেগে জেগে চিন্তাও আসতে পারে না কারো কোনদিন। নীলাঞ্জনকে দেবতার আসনে বসিয়েছিল সুলভা। যা দেখছে, ও দৈত্যদের পথ বেছে নিয়েছে। ও ডাকাত ও খুনী ও লুটেরা ও বর্বর।

ভালোমানুষের, ভদ্রতার মুখোশ পরে বেড়ায়। ও জানে না, এ কামরায় সুলভা আছে। জানলে, হয়তো বা ঢুকত না।

নীলাঞ্জনের চোখ দুটো আগের মতো ঠাণ্ডা নয়। আগুন জ্বলা চোখ এখন। চেয়ে থাকা যায় না। জওয়ান হাত বাড়িয়েছে সুলভাকে তোলার জন্য, নীলাঞ্জন জওয়ানের সামনে দাঁড়াল। ওর চোখে কি দেখল কে জানে! হাত সরিয়ে তক্ষুনি।

ভয়ে কাঁটা হয়ে গেছে। মুখের রক্ত সরে গিয়ে কাগজ—সাদা।

এ অবস্থা শুধু একা জওয়ানের নয়, যারা যারা ঢুকেছে সকলেরই একই দশা। নীলাঞ্জনের চোখে ওরা কি দেখছে, কি দেখল ওরাই জানে!

কামরা থেকে সরে পড়ল এক এক করে। ওদের পেছু পেছু নেমে গেল নীলাঞ্জনও।

···ট্রেন চলছে, ঝড়ের গতি। বৃষ্টির জোর কম। টিপ টিপ করে পড়ছে।

প্রভাসের জন্যই তো অনিচ্ছাসত্ত্বেও নীলাঞ্জনের খপ্পরে পড়তে হয়েছিল সুলভাকে।

প্রভাস এসে হাজির হত যখন-তখন।

ঠাকুমা চলে যাওয়ার পর সুলভাদের বাড়িতে প্রভাসদের আনাগোনা বেড়েছে। ছোটকাকিমা এ নিয়ে তুমুল কাণ্ড করে গেছে। তার ভাই

এ বাড়িতে আসুক, এ পছন্দ নয়। মাকে বলেছে, ধিঙ্গি মেয়েকে যা হোক তৈরী করেছো বটে। প্রভাসের মাথাটা নাই বা চিবিয়ে খেতে দিলে। বাড়িতে অনেক ছেলেই আসে। মা-বাপকে যে ছেলে অত মানত, তার কি তিরিক্ষি মেজাজ! সুলভাদের বাড়ি যেও না বললে, মারমুখী হয়ে তেড়ে যায়। মেয়েকে যদি না সামলাও, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। কেমন করে শায়েস্তা করতে হয়, আমরা জানি।

গান শিখিয়ে ফিরেছে সুলভা। সিঁড়ির ধাপে ধাপে পা ফেলে ফেলে উঠছিল ওপরে! কাকিমার কথা কানে গেল। দাঁড়িয়ে পড়ল চাতালে। ঘরে ঢুকতে গিয়ে ঢুকল না।

খোলা দরজা দিয়ে দেখছে, বাবা শুয়ে আছে খাটে। অসুস্থ। বুকের যন্ত্রণাটা বেড়েছে ক'দিন হ'ল। মা খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে। দুচোখের জল পড়ছে টপটপ ক'রে।

কাকিমা বলছে, কেঁদে পার পাওয়া যাবে না জেনো। মেয়ের গান শুনিয়ে শুনিয়ে প্রভাসকে বশ করতে চেষ্টা করবে না একদম! যা ছিরি মেয়ের! পেতনী!

ঘর থেকে বেরোনোর মুখে চোখ পড়েছে সুলভার ওপর। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। খ্যান খ্যানে গলায় বাড়ীসুদ্ধ লোককে শুনিয়ে চিৎকার করে বলছে, প্রভাসের সঙ্গে মেলামেশা করবে না বলে দিচ্ছি। ওর মা-বাবা তোমার সঙ্গে বিয়ে দেবে না। তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেছে কাকিমা।

শোয়ার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে সুলভা। বুকফাটা যন্ত্রণা। বুকে বালিশ চেপে পড়ে রইল বিছানায়।

ঠাকুমা চলে যাওয়ার পর ভিটে ছাড়া করেছে ওই কাকিমা। বাবার অংশ বিকিয়ে গেছে নাকি ছোটকাকার কাছে। কতবার টাকা ধার নিয়েছে। বারো-মাসই তো অসুখ! সুদে সুদে সমস্ত শেষ।

ক'টা বাড়িতে আর স্কুলে গান শিখিয়ে ক'টাকাই বা পায় সুলভা! তিন বোনের মধ্যে আর দু'বোন অফিসে ঢুকেছে সবে। কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটে। পুরোনো বাড়ির একখানা ঘরে দয়া করে থাকতে দিয়েছে কাকিমা। কাকিমা নতুন বাড়ি করে চলে গেছে অন্য জায়গায়।

বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেছিল। মা কেঁদে হাতে ধরে অনুরোধ করেছে, আর কিছুদিন থাকতে দিতে। বড় গান শিখিয়ে যা পায়, কর্তা তিন মেয়ে আর সে দুবেলায় আটটা পাত। ওর টাকায় একবেলাই হয় না বোন, দু'বেলা হবে কোত্থেকে? এর ওপর ঘর ভাড়া নিতে গেলে, পেটে দানা যাবে না কারো। মেজ-সেজ কাজ করলে কিছু কিছু ভাড়া তোমায় নিশ্চয় দোব।

মায়ের প্রতিশ্রুতি পেয়ে রেখেছে কাকিমা।

সেই কাকিমা ক্ষেপেছে।

প্রভাসকে আসতে দেবে না। প্রভাস ভালোবাসে কিনা সুলভা জানে না। জানে প্রভাসের সহানুভূতি আছে তাদের ওপর যথেষ্ট।

বরাবরই ক্ষীণজীবী সুলভা। রংও চাপা। পাত্রপক্ষেরা দেখে মুখ ফিরিয়েছে। এই করে করে চোদ্দ থেকে চব্বিশে পড়েছে সুলভা। বিয়ের কথা তো ওঠেই না। বিয়ে করবো না বলে স্থির করে ফেলেছেই সুলভা। বিয়ে কেউ করতে চাইলেও, তার আর করা চলে না। সংসার চলবে কি করে?

প্রভাসের পাশে সত্যিই তাকে মানায় না। প্রভাস ফর্সা সুপুরুষ। প্রভাস অবিশ্যি তাকে বলে, তোমার মতো এরকম ক'টা মেয়ের চোখ নাক চুল আছে? গলা—তুলনা নেই।

যখন ঠাকুমা চলে গেল, প্রভাসই এসে সান্ত্বনা দিয়েছে তাকে। ঠাকুমাই আগলে রেখেছিল এতদিন। দায়ে-অদায়ে গায়ে আঁচ লাগতে দেয়নি। বাবা তো বয়স থাকতেই অথর্ব হয়ে গেল। সুলভার লেখাপড়া-গান—সবেতেই ঠাকুমার অকৃপণ-হাত এগিয়ে এসেছে নির্দ্বিধায়। সকলের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের পাত্রী ঠাকুমার চোখে ভাবময়ী শ্রীরাধা মীরা।

যে পাহাড়ের আড়ালে ছিল, ঠাকুমা যেতে সে পাহাড় ধসে মাটিতে মিশে গেল। চতুর্দিক অন্ধকার দেখল সুলভা। প্রভাস বুঝিয়েছে, ঠাকুমার আশীর্বাদে ঠিক দাঁড়িয়ে যাবে।

ঠাকুমা গো! একলা ঘরে কেঁদে উঠল সুলভা।

মনে পড়ছে ঠাকুমার কথা।—সুলভা সব তাতে তুই অস্থির হয়ে পড়িস! অত ভাবিস কেন? ভগবানের আশীর্বাদ তোর ওপর—ভগবানদত্ত গলা অমন—ক'জনের ভাগ্যে হয়? তোর গানই ধনসম্পত্তি অভিভাবক।

বুকে বালিশ চেপেই খাটে উঠে বসল সুলভা। মা এসে দরজায় টোকা মারছে। বালিশ রেখে উঠল। আলনা থেকে তোয়ালে নিয়ে, মুখ-চোখ মুছে নিল থুপে থুপে। দরজা খুলল।

মা ভেতরে ঢুকেই বন্ধ করে দিল। অভিমানে ঠোঁট ফুলে উঠছে, চোখে জল। মায়ের চোখে জল দেখে, মেয়েরও চোখের পাতা ভিজল আবার। যা বলতে এসেছে মেয়েকে, মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে না। গলা বুজে রয়েছে কান্নায়।

সুলভা হাত ধরে নিয়ে এসে খাটে বসাল মাকে। নিজে বসল। নির্বাক মুখে মা-মেয়ে বসে রয়েছে। কেউ কোন কথা বলছে না। কাটল কিছুক্ষণ। খাট থেকে নামল মা। দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

মা কি বলতে এসেছিল, না বলে গেলেও, সুলভা বুঝতে পেরেছে। কাকিমা যদি তাড়িয়ে দেয় দাঁড়াবে কোথা! প্রভাসকে এড়িয়ে চলতে হবে সুলভার। যতটা পারা যায়, বাইরে বাইরে কাটাবে ওর আসার সময়।

চার পাঁচ দিন ধরে দেখা হচ্ছে না কিছুতেই সুলভার সঙ্গে প্রভাসের। হন্যে হয়ে ঘুরছে প্রভাস সুলভাকে ধরার জন্য।

ধনুক ভাঙা পণ করে বসে আছে, যত রাতই হোক—আজ আর না দেখা করে যাবে না। এদিকে মায়ের বুক ঢিব ঢিব করছে ভয়ে।

কাকিমা এসে দেখলে, ঝেঁটিয়ে বাড়ি থেকে বার করে দেবে তাদের এখুনি। ছোট বোন নীতা মায়ের অবস্থা লক্ষ্য করেছে। দিদি কোথায় জানে। দিদির

বন্ধু উষাদির বাড়িতে। খবর দিতে চলে গেল।

বোনের মুখে শুনল সুলভা। উসকো খুসকো চুল। পাগলের মতো প্রভাস। ক'দিন না দেখা করে, নিজে যে কত দুর্বল—বুঝতে পেরেছে পরিষ্কার। প্রভাস তার ভেতরের সব জায়গা দখল করে বসে রয়েছে।

প্রভাস তাকে দেখার জন্যে অস্থির হচ্ছে, সে-ও কি না হচ্ছে? উষার বাড়িতে দেহ থাকলেও মন পড়ে থাকে ওরই কাছে। কতবার মনে হয়েছে ছুটে চলে যায়, কাকিমার মুখ ভেসে উঠতেই পা দু'টো আটকে গেছে মেঝেয়। মা-বাবা আর বোনদের নিয়ে কোথায় দাঁড়াবে সে!

সুলভা আকুল পাথারে ভাসছে। কি করবে?

এত ভাবছিস কি দিদি? একবার দেখা হলেই চলে যাবো বলেছে।

সুলভা সচেতন হয়ে উঠল। নীতার সঙ্গে দুরু দুরু বুকে গেল বাড়িতে।

চোখাচোখি হতে দু'জনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। কারো মুখে কোন কথা সরছে না। কেউ কারো কাছে এগিয়েও যাচ্ছে না। দু'জনের মনের একই অবস্থা। কত বছর বাদে যেন ওরা ফিরে পেয়েছে ওদের হারানো দু'জনকে। এত আনন্দে বিভোর যে দু'জন দু'জনকে দেখেও দেখার তৃপ্তি মিটছে না। সুলভা কি সত্যিই দেখছে প্রভাসকে? প্রভাসের সামনে কি সুলভা?

ওদের নিশ্বাসে আনন্দলোক, মনে আনন্দলোক, চোখে আনন্দলোক। বেশীক্ষণ বেঁচে রইল না এ আনন্দলোক। হিংসুটে অন্ধকার টুঁটি টিপে ধরল ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কাকিমার চরেরা খবর দিয়েছে—প্রভাস এসেছে।

হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির কাকিমা। রণচণ্ডী মূর্তি। রাগে কাঁপছে। গলার স্বর সপ্তমে চড়েছে।—কোন কথা শুনবো না। এক্ষুনি বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে। যার শিল যার নোড়া, তারই ভাঙছো দাঁতের গোড়া! শয়তানী কোথাকার। দয়া করে রেখেছি বলে?

ঝাঁপিয়ে পড়ল সুলভার ওপর। চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল। বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা! ত্রিসীমানায় এসেছিস কি—তোর গুষ্ঠিসুদ্ধু বার করে দোব। টেনে ফেলে দোব সমস্ত জিনিস রাস্তায়। বল্ কোনটা চাস? বেরোবি, না জিনিস ফেলবো?

সুলভার দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। বলল, আমি চলে যাচ্ছি আর আসবো না এ বাড়িতে।

চুলের মুঠি ছেড়ে দিল কাকিমা।

কাছে এগিয়ে এলো প্রভাস।—দিদি, অকারণ ওর ওপর অত্যাচার করলে। কোন দোষ নেই ওর। আমি নিজেই এসেছি।

থাম দিকিনি। তোকে কেউ সালিশী করতে আসতে বলেনি। দরদ দেখাতে এসেছেন উনি। যা বুঝেছি করেছি। যা বুঝবো, করবো। স্বয়ং ভগবান এসেও বাধা দিতে পারবে না আমায়।

বাড়ি যাওয়া বন্ধ সুলভার।

উষাও ছাড়ে না। বলে, আমার যদি একবেলা জোটে, তোরও একবেলা জুটবে। অত কিন্তু করিস কেন? বাবা যা রেখে গেছে—বাড়ি, কারবার—খাওয়া-পরার অভাব হবে না। তুই এমন করে এ জিনিস ও জিনিস কিনে আনিস কেন?

কি আর আনতে পারি ভাই! আনার ইচ্ছে থাকলে, হওয়ার উপায় কোথায়? মাথা নিচু করে বলল সুলভা।

থাম্! অত লজ্জায় মাটির সঙ্গে কুঁকড়ে যেতে হবে না ওই তো আয়, বাড়িতে দিতে হয়। যখন বেশী আয় হবে—দিস্—আমি নিজেই চেয়ে নোব।

সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বসে আছে উষা। সামনের সোফায় সুলভা। মধ্যিখানের টেবিলে ইংরেজি বাংলা খবরের কাগজ। সুলভা ইংরেজি কাগজ তুলে নিল, চাকরি খালি কোথায়—চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে।

হাত বাড়িয়ে উষা টেনে নিল। বসল, থাক। কাগজ দেখতে হবে না অত। বাইরে গিয়ে সুবিধেটা হবে কি বলত?

প্রভাস বাঁচবে। যে ভাবে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—ওর জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। পুরুষ নারীর বল—দেশের বল। আমার জন্যে একটা শক্তির অপচয় হয়ে যাচ্ছে!

ও মা গো। এত যদি টনটনে জ্ঞান—আগে আগে হলায় গলায় করতে গেছলি কেন রে মুখপুড়ি? মনে ছিল না তখন?

ভাবি নি এরকম হবে।

কথার মোড় ঘোরানোর জন্য উষা বলল, শোন, কোন্ সিনেমায় যাবি—কাগজ দেখে বল!

সত্যি বলছি, কোন সিনেমায়ই যেতে ইচ্ছে করছে না উষা। আজ দু'মাস হ'তে গেল, কোন পরিবর্তন হয় নি প্রভাসের। নীতার মুখে শুনছি, খালি খালি আমারই নাম ওর মুখে। বাড়িতে বিয়ের ব্যবস্থা করেছে। করবে না। সময় সময় মনে হয় কি জানিস? শুনলে, হাসবি—পাগলামি বলবি। আমি একটা বিয়ে করে ফেলি। তাহলে ওর মোহ ভাঙবে। রেগে গিয়ে বিয়ে করবে, ঘরবাসী হবে। আমায় ভুলবে, আমার নাম ভুলবে।

কথাটা মনে মনে লুফে নিল উষা। একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। নীলাঞ্জনদা বলেছিল সেদিন, সুলভা বিয়ে করলে, দু'পক্ষেরই বাড়ির অশান্তি মিটে যায়। প্রভাসও মা-বাবার অশান্তির কারণ হয়ে ঘুরে বেড়ায় না আর। সুলভার অন্তর জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে গেলেও, প্রভাসকে বাঁচানোর জন্য প্রভাসকে বিয়ে করবে না সুলভা কিছুতেই—প্রতিজ্ঞা করেছে। মা-বাবা বোনেদের আশ্রয় ভাঙতে ও চায় না মোটে। সুলভার ওপর আকর্ষণ আছে নীলাঞ্জনদার। প্রায়ই বলে, সুলভার মুখখানা মায়া মাখানো। দেখলে কষ্ট হয়। সত্যিই অন্যের সুখ-শান্তির জন্য মেয়েটার কি ত্যাগ—দেখার মতো। এ মেয়ে যার ঘরে থাকবে,

তার শান্তির সংসার গড়ে তুলবে।

তুই যখন বিয়ের কথা বললি, একটা কথা বলবো—রাগ করবি না? উষার কণ্ঠস্বরে সংকোচ।

প্রথমটায় সুলভা হতভম্ব হয়ে গেল। মনের দুঃখে বলেছে বলে সত্যিসত্যি কি আর বিয়ে করবে সে? চিরকুমারী হয়ে থাকবে—সে-ও ভালো। তবে প্রভাসের চোখের বাইরে যেতে হবেই তাকে।

এবার উষা বলল, থাক গে! তুই যদি শুনতে না চাস—বলবো না!

শুনবো না কেন রে! বলনা—কি বলতে যাচ্ছিলি।

নীলাঞ্জনদাকে পছন্দ তোর?

আকাশ থেকে মাটিতে আছড়ে পড়ল সুলভা। কি উত্তর দেবে?

নীলাঞ্জনদা কথায় কথায় নিজেই বলেছে, তার ক্ষয়রোগ ভালো হয়ে গেলেও, ডাক্তাররা বিয়ের অনুমতি দিলেও—বেশীরভাগ সময় সাবধানে থকেতে বলেছে। যতখানি পারা যায়, সংযমী থাকা ভালো। আবার ধরলে, বিপদ। উষার কি মাথা খারাপ?

সুলভা বলল, নীলাঞ্জনদার অসুখের কথা জানতে বাকি নেই তো তোর?

জানি বলেই তো বলছি। এ বিয়ে বিয়ে নয়। নার্স-রুগীর সম্পর্ক। সেবা করার কেউ নেই।

কথাটা ঠিক বলেছে উষা। নীলাঞ্জনের নিজের কোন ভাই-বোন নেই। উষা মাসতুতো বোন। এই বাড়িতেই মানুষ। শ্বশুরবাড়ি থেকে মাঝেসাঝে আসে যায়। দিনকতক করে থাকে।

নীলাঞ্জনের মা শয্যাগত যখন—মরার আগে বিধবা বোনকে—উষার মাকে এবাড়িতে এনে রাখে। বাপমরা নীলাঞ্জনকে দেখাশোনা করার কেউ নেই। সেই থেকে রয়ে গেছে এ বাড়িতে উষার মা।

মাসীকে বাইরের সকলে জানে নীলাঞ্জনের নিজের মা। উষা নিজের বোন। সুলভাও জানত তাই। এ বাড়িতে আসার পর উষা বলেছে সমস্ত কাহিনী।

যেদিন রাস্তায় বার করে দিয়েছে সুলভাকে কাকিমা, আশ্রয় দিয়েছে নীলাঞ্জনদা। বলেছে, আমার এখানে নির্ভয়ে থাকো তুমি। কোন দ্বিধা ক'রো না। জানবে—এটা তোমার বাড়ি।

...এ বিয়ে বিয়ে নয়—রুগী আর নার্স। উষার কথাটা ঠাট্টা কিনা জানে না সুলভা—কিন্তু কথাটা মন থেকে মুছে ফেলতেও পারছে না। অবাস্তব ব্যাপার। তবু মনে হচ্ছে, তার এই পরিস্থিতিতে এইটাই বাস্তব। মনে মনে হাসল সুলভা। কি ছেলেমানুষি—এ আবার হয় নাকি? সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, হ'লে কিন্তু মন্দ হত না। প্রভাস বাঁচত, এদিকে নীলাঞ্জনদারও মন ভরে থাকত —সেবার জন্য বাঁধা রইল ঘরে একজন।

সুলভা হেসে বলল, ভালো মতলব দিয়েছিস তুই। নীলাঞ্জনদা কি রাজি?

কথাবার্তায় মনে হয় তাই।

নীলাঞ্জন ঢুকল ঘরে। হেসে কুটিকুটি উষা।

নাটকের চেয়েও মানুষের জীবনে অনেক নাটকীয় মুহূর্ত ঘটে। যেখানে বিস্ময়ের অতল তলে ডুবে যায় মানুষ। যা ভাবার নয়, তাই ভাবিয়ে তোলে। যা ঘটার নয়, সহজেই ঘটে যায় তাই। মানুষের বুদ্ধি-বিবেক-মন নিস্তব্ধ হয়ে থাকে। নেপথ্য থেকে কেউ যেন কলকাঠি নেড়ে সব কিছু করাতে থাকে হাসতে হাসতে। সে হাসি নির্মম না করুণার—তখন বোঝা যায় না। দেখা যায় পরে—কার্যকলাপের মধ্যে।

নীলাঞ্জনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল সুলভার।

হালকা কথার বাঁধন শুভপরিণয়ে সাতপাকের বাঁধনে বাঁধা পড়ল।

নীলাঞ্জন খুশি। খুশি মাসীও। কখন বলতে কখন ডাক পড়ে—বলা যায় না। এবার শান্তিতে মরতে পারবে। ছেলেটাকে দেখার ভাবনা নেই আর। নীলাঞ্জনের মাথায় জল পড়ার কথাই ছিল না। জল যে দিতে পেরেছে মাসী, এটা কম ভাগ্যের কথা নয়।

ফুলশয্যার রাত। খাটের ছতরিতে ফুলের ঝালর। বাজুতে ফুলের মালা পাক দিয়ে দিয়ে ওপর অবধি উঠে গেছে। বিছানায় ফুলে ফুল। জ্ঞাতিস্বজনরা এসেছিল। লোকলৌকিকতা করে বাড়ি ফিরেছে।

খাটের ওপর নববধূর সাজে বসে আছে সুলভা। পায়ে পায়ে কাছে এলো নীলাঞ্জন। বাজু ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মৃদুস্বরে বলল। বড্ড রাত হয়ে গেল। তোমার কোন কষ্ট হয়নি তো? কত লোক এল গেল। তোমায় ঠায় বসে থাকতে হয়েছে।

না। আপনার শরীর ভালো আছে তো? যা দৌড়ঝাঁপ—ওপর নিচে করাকরি।

না, না। একটুও ক্লান্তি আসেনি আমার।

শুয়ে পড়ুন গে! আর রাত করবেন না।

ঘরের বাইরে গিয়েই, তখুনি আবার ফিরে এসেছে নীলাঞ্জন। আমতা আমতা করে বলেছে, ঊষা ও ঘরে শুতে যেতে বারণ করল। আজকের দিনটায় নাকি এ ঘরেই শোয়া নিয়ম।

মুখের দিকে তাকাল সুলভা। মানুষটা ছলকপট নয়। বাচ্চার হাসি মুখে! দেখলে, না জেগে পারে না। বলল, আপনি খাটে শোন। আমি না হয় ওঘরে যাচ্ছি।

পরদার আড়ালে দাঁড়িয়ে ঊষা। শুনেছে। চৌকাঠের এপারে পা দিয়ে হাতের ইশারায় সুলভাকে ডাকল। গেল সুলভা।

কানে কানে বলল ঊষা, আজকের দিনে দু'জনে আলাদা আলাদা ঘরে শুলে অমঙ্গল হয়। এখানেই শো তুই।

চলে গেছে ঊষা।

সোফায় এসে বসলো সুলভা।—আমি এখানেই শুচ্ছি। আপনি বসে থাকবেন না আর। শুয়ে পড়ুন।

আমি না হয় ওখানে যাই, তুমি এখানে এসো।

তা হয় না। বাবার অসুখে প্রায়ই রাত জাগতে হয়েছে আমার। কখনো সোফায় বসে থেকেছি, কখনো ঘুমিয়ে নিয়েছি একটু। আমার অভ্যাস বহুদিনের। নির্ভাবনায় ঘুমুন আপনি।

ফুলশয্যার রাতের রাত সব রাতেই হয়ে উঠল নীলাঞ্জনের জীবনে।

বছরখানেক সুলভার মন বদলাল না। ফুলশয্যার রাতে তবু একঘরে শুয়েছিল দু'জনে, যদিও শয্যা আলাদা। সে রাতের পরের রাত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘরে দু'জনে। দক্ষিণের ঘরে নীলাঞ্জন। মধ্যিখানে চাতাল। উত্তরের ঘরে সুলভা।

মাসীর মনোদুঃখ ঊষার মনোদুঃখ। নীলাঞ্জনের তো কথাই নেই। মাঝে মাঝে মনটা কি রকম হয়ে ওঠে। রাত্তিরে যায় উত্তরের ঘরের দরজায়। টোকা মারে কিছুক্ষণ। দরজা খোলে না সুলভা। সাড়াও দেয় না।

বিয়ের দিন সাতেক পরে একবার মনে হল ওঘরে যাবে। গেছল। রাত খুব বেশী হয় নি। পৌনে এগারো কি এগারো। রোজ যেমন করে সুলভা, সেদিনও তাই করেছে। কোন কাজেই ত্রুটি রাখে নি। খাওয়াদাওয়া দেখা, নীলাঞ্জনকে বাঁধা সময়ে খাওয়ানো।

কাজ সেরে ঘরে ঢুকেছে সবে। দরজায় টোকার আওয়াজ। দরজা খুলে, নীলাঞ্জনকে দেখে অবাক সুলভা। —আপনি? শরীর ভালো তো?

মুচকি হেসে, না ডাকতেই ঘরে প্রবেশ করল নীলাঞ্জন। বসতে বলার অপেক্ষা না করেই বঁসে পড়ল খাটে। বলল, এমনি এলুম। একা ঘরে ভালো লাগছিল না। একটু গল্প করবো বলে চলে এলুম।

রাতজাগা উচিত নয় আপনার। চলুন, ঘুমের ট্যাবলেটটা না হয় খাইয়ে দিয়ে আসছি আমি।

এলুম, একটু বসি-ই না। তাড়িয়ে দিচ্ছো কেন?

আপনার বাড়ি, আপনাকে তাড়িয়ে দেবো কি আমি!

আজ এইখানেই থাকি। ওঘরে যেতে ইচ্ছে করছে না!

আপনি এ ঘরেই থাকুন, তাহলে আমাকে ওঘরে যেতে হচ্ছে।

সুলভা বেরিয়ে যাচ্ছিল, হাত ধরে টেনে বসাল পাশে নীলাঞ্জন। নীলাঞ্জনের দেহের উত্তাপের ছোঁয়া লাগছে সুলভার দেহে। ঘন ঘন উষ্ণ-নিশ্বাস পড়ছে ওর। নীলাঞ্জনের দু'চোখে উপোসী লালসা।

হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল সুলভা।

আঁচলে চাবির গোছা ঝোলানো। পর পর চাবি সরিয়ে আলমারীর চাবিটা বার করল। আলমারী খুলে প্রভাসের ফোটোটা দেখিয়ে বলল, একজনকেই স্বামী বলে মনেপ্রাণে মেনে নিয়েছি আমি। আমার জন্য বিয়ে করল না সে। আজো করে নি, করবেও না। আপনি আমার কাছে স্বামীর চেয়েও অনেক বড়। শ্রদ্ধেয়-দেবতা। আশ্রয়দাতা। আপনার নার্স আমি। আপনি আমার আদর্শ। আদর্শের

মূর্তি ভেঙে খানখান করে ফেলবেন না। তার চেয়ে আমায় বিদায় দিন।

একটা দমকা নিশ্বাস ফেলে, বেরিয়ে গেল ঘর থেকে নীলাঞ্জন।

সকালে রাতের মানুষ মনেই হল না। সহজ-সরল হাসিখুশী।

দিন চার পাঁচ বাদে আবার দরজায় টোকার শব্দ। দরজা খোলে নি সুলভা। প্রতিজ্ঞা করেছে খুলবেও না। মানুষটার বিবেক আছে। সব চাপা পড়ে যায় রাতের অন্ধকারে। রিপুর প্রবল তাড়না জেগে বসে থাকে শুধু। ভেতরে ছোটাছুটি করে। ওর অগোচরেই ওকে টেনে আনে সুলভার দরজা গোড়ায়!

যেদিন রাত্তিরে দরজায় টোকা পড়ে, পরের দিন সকালে নীলাঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে সুলভা খেতে দেওয়ার সময়। না, কামের গন্ধ নেই। নিপাট ভালোমানুষেরই মুখ।

প্রায় রাত্তিরেই সুলভা নীলাঞ্জনের আসার শব্দ পায়। ফিরে যাওয়ারও। ভয় ধরে সুলভার। অন্য কোন কিছুর জন্য নয়। ওর জীবনের জন্য। শরীর অসুস্থ হয়ে পড়লে, কালব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করতে পারা যাবে কি আর? প্রভাসকে বাঁচানোর জন্য নীলাঞ্জনের আশ্রয়ে এলো, বিয়ে পর্যন্ত ক'রে বসল। কিন্তু নীলাঞ্জন যে তাকে নিয়ে কামনার আগুনে জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যায়! নীলাঞ্জনকে বাঁচানোর জন্য কোথায় যাবে—কার কাছে যাবে?

রাতে ঘুম নেই সুলভার। চিন্তায় চিন্তায় আরো দিশেহারা। দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে এইভাবে। হঠাৎ চিন্তার সমাধান হয়ে গেল একদিন।

ঊষা আসছে। মা হবে এবার। এই সুযোগে সরে পড়বে গানের গুরুদেবের কাছে—মিশ্রজির কাছে। বেনারসে চলে যাবে। গুরুদেবের কাছে গানের পুঁজির থলি ভরভরতি। দেওয়ায় জন্য উৎসুক। কতবার চিঠি লিখেছে, কবে বলতে কবে নেই। যা কিছু সঞ্চয় হারিয়ে যাবে। সুলভা, তুমি এসে নিয়ে যাও!

সেই চিঠি দেখাবে সুলভা নীলাঞ্জনকে। নীলাঞ্জনের মনে কোন খটকা লাগবে না। ছেড়ে দেওয়া সহজ হবে। বাধা দেবে না।

সুলভার যাওয়ার দিনে ঘরে এসে বসেছে খাটে পা ঝুলিয়ে। বলেছে নীলাঞ্জন, কেন যাচ্ছো, মুখে না বললেও আমি জানি।

ট্রাংকে কাপড় গুছোতে গুছোতে চমকে উঠে ফিরে তাকিয়েছে সুলভা।

চমকালে কেন? আমি জানি। আমার উৎপাতের জ্বালায় তুমি টিঁকতে পারছো না। আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করছি, রাত্তিরে এদিক মাড়াবো না। তুমি যেও না! তুমি আমার শরীরের জন্যই দরজা খোল না, বুঝি। আমাকে ক্ষমা কর।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ! একি বলে অপরাধী করলেন আমায়! ক্ষমা আমি চাইবো আপনার কাছে। আপনি আমার নমস্য। গলায় আঁচল জড়িয়ে, মেঝেতে কপাল ঠেকিয়ে সুলভা প্রণাম করেছে।

ট্রাংকটা খাটের তলায় ঠেলে রেখে বলেছে, আচ্ছা, আজ না হয় নাই গেলুম। অন্য দিন যাবো। আপনি নিজে পাঠিয়ে দেবেন মিশ্রজির কাছে।

সে যাত্রা যাওয়া বন্ধ করল সুলভা—যদি মন বদলায় নীলাঞ্জনের। দেখতে দোষ কি! যেভাবে কাকুতি-মিনতি করে বলল, খুব নির্দয় মনের না হলে ছেড়ে যাওয়া যায় না।

এরপর প্রকৃতই নির্দয় হতে হয়েছে সুলভাকে।

প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেননি নীলাঞ্জন। চার পাঁচ দিন যেতে না যেতেই আবার এসেছে রাত্তিরে। আগের অভ্যেস মতো দরজায় আওয়াজ করে ফিরে গেছে আবার।

আর কিছুতেই থাকবে না সুলভা। সকাল হলেই বাড়ি থেকে বেরোবে। মনকে এক কথা বুঝিয়ে বুঝিয়ে শক্ত করেছে। যত অনুরোধ করুক, কাল সকালে যেতেই হবে, যেতেই হবে যেতেই হবে।

যাওয়ার সময় এসে আটকেছে ফের নীলাঞ্জন। সেই আগের অনুরোধ আগের প্রতিশ্রুতি, কিছুতেই কিছু হল না। সুলভা দোতলা থেকে নামছে। সামনে এসে দাঁড়াল উষা।—একটু ভেবে দ্যাখ সুলভা। মস্ত ভুল করছিস! যে ভয়ে পালাচ্ছিস, তাই না হয়ে বসে নীলাঞ্জনদার। তুই বুঝছিস না, দারুণ আঘাত পাবে। সামলাতে পারবে কিনা জানি না। ওঘরে মায়ের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাউ হাউ করে বাচ্চা ছেলের মতো কাঁদছে আর বলছে, মা, তুমি হলে কি এভাবে চলে যেতে পারতে আমায় ছেড়ে?

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেছে উষা। বলেছে, এত পাষাণ হোস্ না রে! ও যে বড় অসহায়।

কেঁদেছে সুলভাও। কান্না চাপতে দাঁতে ঠোঁট চেপে রক্তারক্তি করেছে। বলেছে, আমি থাকলে একটা সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে রে উষা। একজন জ্বলছে, এও জ্বলছে। উষা, আমি আগুন। জ্বলে-জ্বলে নিজেকে পুড়ে মরতে দে! ওরা দু'জন বাঁচুক। ওদের বাঁচতে দে রে!

সুলভা চলে এসেছে বেনারসে।

এসেও মন বসাতে পারছে না। প্রভাস আর নীলাঞ্জনের দুটো মুখ ভাসছে কেবল চোখের সামনে। সদাসর্বদা। ঘরে তিষ্ঠনো দায় হয়েছে। পালাই-পালাই ভাব। কোথা গেলে শান্তি পাবে, কি করলে শান্তি পাবে? মিশ্রজিকে বলল সুলভা।

মিশ্রজি বলল, বেটি, ঘাবড়াও মত। মীরা বন যাও? শান্তি মিলেগি।

মীরাবাঈ একজনই হয়েছিল।

একজন কেন বেটি, সব মেয়ের মধ্যেই মীরা রয়েছে। গানের সাধনায় জাগিয়ে তুললে, তবে না মীরা হবে।

সে কি সহজ ব্যাপার?

চেষ্টার অসাধ্য কিছু কি? মনকে ডুবিয়ে দাও গানের মধ্যে—ভজনের মধ্যে

কত আনন্দ, কত শান্তি। এ আনন্দ এ শান্তি কেড়ে নিতে পারবে না কেউ কখনো। এ জীবনভোরের।

গান যখন গাইত, ঠাকুমা শুনে ভাবে বিভোর হয়ে যেত। থামলে বলত, কেন থামালি রে! স্বর্গরাজ্যে ছিলুম এতক্ষণ। সংসারের বিষের জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলুম খানিকটা সুলভ, তুই আমার রাধা, তুই আমার মীরা।

দু'চোখ মুছে ঠাকুমা সুলভার চিবুক ধরে আদর করে বলেছে, গুরুদেব বলতেন কি জানিস? গানের মতো গানে স্বয়ং ভগবান খেলা করেন। খেলা না করলে কি আর অমন আনন্দ পাওয়া যায়? সংসারে নিজেকে জড়াস নি রে। বড় অশান্তি। তুই দেবতার ফুল। ফুল হয়েই থাক।

তখন মনে করেছিল সুলভা, পর পর বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে বলে, ঠাকুমার সান্ত্বনা। এখন দেখছে, সান্ত্বনা নয়, সত্যিই বলেছে। সংসারে কি সুখ পেল সে? গরলই পান করল কেবল। অমৃত খুঁজে পেল না।

ঠাকুমা বলত, সংসার কি সকলের সয় রে? সয় না, নীলা যেমন সহ্য হয় সবার। সংসার সহ্য হ'ল না সুলভার। মিশ্রজিও বলছে, গানে ডুবে যাও। কিন্তু কেমন করে ডুববে? তানপুরায় সুর বাঁধতে গেলেই যে মনটা চলে যায় প্রভাসের কাছে, ছুটে চলে যায় নীলাঞ্জনের কাছে।

তারে সুর উঠতে চায় না। শুধু বেসুরো। মিশ্রজিকে বলল, তানপুরা নিয়ে বসতেই ইচ্ছে করে না, কি করে গান গাইবো?

আমার সঙ্গে এসো। গানের ঘরে নিয়ে গেল মিশ্রজি। দেয়াল থেকে তানপুরা পাড়ল। মেঝেয় সতরঞ্চি বিছানো। তানপুরা রেখে গেরুয়ার ঘেরা-টোপ খুলে ফেলল। সুর বেঁধে, নিজেই তানপুরার তারে আঙুল চালাচ্ছে। বলছে, গাও বেটি। আমি গলা দিচ্ছি, আমার সঙ্গে গাও!

আমি পারছি না। কান্না আসছে।

ভালো লক্ষণ। যে কাঁদতে পারে, সেই গান গাইতে পারে। কান্নাতেই তো আসল সুর খোলে। হৃদয়ের সুর। দেবতার পুজোর অর্ঘ্য। গানেতে না কাঁদতে পারলে, গানের দেবতা ধরা দেয় না। মিশ্রজি গান ধরল ঃ

> অগর প্রেম কি জিস দিলমে লগী
> ঘাত ন হোতী
> তো সাচ্ হ্যায় কি মোহন সে
> মোলাকাত ন হোতী।
> দ্রীগবিন্দু বতাতে হ্যায় কি
> ঘনশ্যাম হ্যায় দিল মে,
> ঘনশ্যাম ন হোতে তো
> এক বর্ষাত ন হোতী।
> যবে আঘাতে আঘাত প্রাণে
> বাজিবে তোমার,

তখুনি বুঝিবে শ্যামের
মিলন বিহার।
কৃষ্ণ-মেঘ আসে যথা,
বরষা নামে গো তথা,
আঁখিবারি তার—
প্রভু কৃষ্ণ হৃদে যার।

মিশ্রজি তন্ময় হয়ে গাইছে। মুখে দিব্যজ্যোতি। ধ্যানের চোখে কাকে যেন দেখছে, কাকে যেন কাছে ডাকছে। দু'চোখ বোজা। জলের ধারা নামছে নিঃশব্দে গাল বেয়ে। যাকে ডাকছিল, সে বুঝি এলো। মিশ্রজির ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসি।

নিজের অজান্তে গুনগুন ক'রে গেয়ে চলেছে সুলভা। সুলভার মনপ্রাণ দেহে আবদ্ধ থেকেও যেন মুক্ত। সকলের ধরাছোঁয়ার বাইরে। দুঃখকষ্টের আঁচ লাগার বাইরে। সুলভা কত হালকা। একটা সাদা পালকের মতো আনন্দের আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে।

মিশ্রজির সঙ্গে যতক্ষণ গান গায় সুলভা, ততক্ষণ দুনিয়ার সব জ্বালার ঊর্ধ্বে থাকে। কিন্তু গান থামলেই আবার বুকের কষ্ট। যেন কত উঁচু থেকে ধপাস করে পড়ে গেল নিচে। বুকটায় লাগল খুব। দম বন্ধ হয়ে যেতে যেতেও হ'ল না। হ'লে ভালো হ'ত। দগ্ধে দগ্ধে মরতে পারছে না আর।

চিঠি আসছে প্রতি সপ্তায়। মাস দুয়েক একটা সপ্তা বাদ নেই। ঊষা লেখে। নীলাঞ্জনদার শরীর ভাঙছে ভীষণভাবে। মুখের দিকে চাওয়া যায় না। কালি ঢেলে দিয়েছে। রাগ বৃদ্ধি হয়েছে। সামনে যাওয়ার উপায় নেই কারো। ডাক্তার দেখাবে না, ওষুধ খাবে না! এখনো যদি সুলভা বসে থাকে চুপচাপ, না আসে, তাহলে পরে আপশোসের অন্ত থাকবে না কিন্তু। চিঠিকে টেলিগ্রাম মনে করে, সুলভা চলে আসে যেন সঙ্গে সঙ্গে।

এমন লেখা পাষাণ হলেও, গলতে দেরী হবে না। গলে জল হয়ে যাবে। চিঠি পড়লেই সুলভার মন চলে যায় সেই মুহূর্তে নীলাঞ্জনের কাছে। আবার ফিরে আসে তখুনি। মনে পড়ে ঊষার কথা। ঊষা বলেছিল, না এসে থাকবি কেমন করে, দেখবো একবার! তোর গোঁ হয়েছে কাল। গোঁ নিয়ে কদিন থাকিস দেখবো! নিজেকেই ছুটে আসতে হবে। নীলাঞ্জনদার শরীর খারাপ শুনলে—বসে থাকতে পারবি তুই? চুপ করে রইলি কেন? উত্তর তোকে দিতেই হবে। আমার কাছে ছাড়ানছিড়েন নেই।

উত্তর দেয় নি সুলভা। চোখের জল এসেছে। মানুষটার একমাত্র ভরসা সে-ই। শিশুর মত আব্দার করে, অভিমান করে। আবার সুলভা গম্ভীর হ'লে বাধ্য ছেলের মতো ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। যা খেতে বলে খায়, কোন প্রতিবাদ না করে। এ লোকের কাছে সুলভার স্ত্রীর ভূমিকা নয়। চোখের জল ঊষা দেখতে পাবে বলে, মুখখানা পেছনদিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে সুলভা।

ঊষার চোখ এড়ায়নি। ওরও চোখ কর কর ক'রে উঠেছে। গলাটা বুজে

এসেছে। একটা ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধ জেঁকে বসল কয়েক মুহূর্ত। ঘরের এমোড় থেকে ওমোড় অবধি পায়চারি করলে উষা। কাছে এসে দাঁড়াল।

বেতের চেয়ারে বসে আছে সুলভা। মূর্তির মতো।

আড়চোখে দেখল উষা। বলল, আবার বলছি, ভেবে দেখ। একগুঁয়েমি করিস নি আর। নিজে কেঁদে কেঁদে মরবি, আর সকলকেও কাঁদিয়ে মারবি। থাকতে পারবি না গিয়ে। আসতে হবেই। আমি তাকে নিয়ে আসবোই।

উষা বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে।

জানলার ধারের পড়ন্ত রোদটা ফিকে হয়ে গেল।

সুলভা যতবার চিঠি পড়েছে, শেষে মনে হয়েছে, উষার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফিকির স্রেফ। সুলভার মন জানে ভালোরকম। দুর্বল জায়গায় বার বার ঘা মারছে তার। উষার কথা শুনেছে—আমি তোকে নিরে আসবোই।

মনে মনে বলেছে সুলভা, না, আমি যাবো না। ওরা বাঁচুক। আমি এখানে লোকচক্ষুর আড়ালে এইভাবে শেষ হয়ে নাই।

শেষ হয়ে যাই বললেই হওয়া যায় নাকি? বরাতের লিখন খণ্ডাবে কে? তোমায় ভবিতব্য অন্যে ভোগ করবে? সুলভার ভেতরে কে যেন ব্যঙ্গ করে বলে ওঠে।

নিরালা ঘরে নিজে নিজেই চমকে ওঠে সুলভা।

কল্পনার কথা শুনে চমকে ওঠা, আর সত্যি শুনে চমকে ওঠা—দুটো তফাৎ। এ চমকানোর সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহ হিম হয়ে এলো সুলভার। মিশ্রজিকে চিঠি দিয়েছে দুজনে। উষা-প্রভাস। প্রভাসের চিঠিতেও ফিরে যেতে বলা হয়েছে আর দেরী না ক'রে। প্রভাস দেখতে যায় রোজ। নীলাঞ্জনের বাড়াবাড়ি চলছে। সুলভাকে দেখার জন্য ছটফট করছে নীলাঞ্জন।

যে দেখতে যাচ্ছে, তাকেই বলছে, আমার দোষে সুলভা চলে গেছে। ওকে ফিরিয়ে আনতে পারো না কেউ? চেহারা যা হয়েছে, চোখে দেখা যায় না। বিছানায় মিশে গেছে। সুলভা এলে, জানে না, যদি কোন অঘটন ঘটে যায়, যদি বেঁচে ওঠে। এখন যা অবস্থা—যমে-মানুষে টানাটানি।

উষার চিঠিতে গালাগালি! রাক্ষুসী, কি নিষ্ঠুর রে তুই! বিশ্বাস না হয় দেখ। নীলাঞ্জনদার ফটো পাঠিয়েছি। আর হয়তো চিঠি লিখতে হবে না তোকে! বাঁচাতে গিয়ে মানুষটাকে মেরে ফেললি হতভাগী। আর আসতে বলবো না তোকে।

মিশ্রজি কাঁপা হাতে চিঠি-ফটো দিয়েছে সুলভাকে। নীলাঞ্জনের ফটো একটা কংকালের। চোখ দু'টি সার। করুণাঘন আয়ত চোখ।

পাথর, মূর্তির মতো বসে রইল সুলভা। এ কি করল সে? একটা মানুষকে তিল তিল করে শেষ করে ফেলল। কি দুর্বুদ্ধি, কি অদৃষ্ট!

সেদিন দশাশ্বমেধঘাটে সিঁড়ির ওপর বসে বসে কথকঠাকুর মহাভারত পড়ছিল। সুলভা-সুলভা করে কি পড়ছে, আর শ্রোতাদের ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাচ্ছে।

নিজের নাম শুনে মন টানল সুলভার। গিয়ে ওপরের পাথুরে সিঁড়িতে বসল গালে হাত দিয়ে। উৎকর্ণ হয়ে নিবিষ্ট মনে শুনেছে।

সুলভা ব্রহ্মচারিণী যোগিনী। নিজের মনোমত বর না পেয়ে বিয়ে করে নি। মিথিলার রাজা জনকের গুণের কথা শুনে, গেল সেখানে। জনক রাজা সন্ন্যাসী যোগী—একটা মানুষ সব। সবেতেই আছে, সবেতেই নেই। কেমন ক'রে এমন হয়—পরীক্ষা করার ইচ্ছে হল সুলভার।

সুলভা রাজকন্যা থেকে সন্ন্যাসী। সমস্ত শাস্ত্রে বিদুষী। তখনকার দিনে অদ্বিতীয়া বললেও ভুল বলা হবে না।

রাজসভায় গিয়ে হাজির হ'ল সুলভা।

নিজের মন, নিজের বুদ্ধি, নিজের সত্তা, নিজের চোখ রাজার মনে বুদ্ধিতে সত্তায় চোখে মিলিয়ে দিতে লাগল মনে মনে।

নিজেকে ভুলে গেল রাজা।

সুলভার মনের ইচ্ছে রাজার ইচ্ছে হয়ে উঠল। সুলভার চোখ দিয়ে সুলভাকেই দেখছে রাজা। অপরূপা। তিলোত্তমাকেও হার মানায়। সুলভা যা ভাবছে, রাজাও ভাবছে তাই।

মহাভারতের সুলভা-কাহিনী শুনতে শুনতে আগাধ জলে ডুবন্ত অবস্থায়—অতল তলে তলিয়ে যেতে যেতে ওপরে ভেসে ওঠার—কিনারে পেঁছনোর পথ খুঁজে পেয়ে গেল যেন সুলভা!

সত্যিই যদি অসুখ হয়ে থাকে নীলাঞ্জনের, ফিরে যদি যেতে হয়—যেতে পারে। নীলাঞ্জনকে নিয়ে আর কোন ভাবনা-চিন্তার কারণ থাকবে না। সুলভা একমনে ভাববে, নিলাঞ্জন তাকে অন্য চক্ষে দেখুক। নীলাঞ্জনের দৃষ্টি বদলাবে। কামনাশূন্য দৃষ্টি!

চিঠি-ফটো আসতে সব চিন্তা ওলটপালট হয়ে গেল সুলভার। দু'চোখে অন্ধকার দেখছে সুলভা। হাত কাঁপতে কাঁপতে মেঝেয় পড়ে গেল চিঠি-ফটো।

মিশ্রজি বলল, বেটি ধৈর্য ধর। ভেঙে পড়লে চলবে না! তুমি গিয়ে নীলাঞ্জনকে নিজের মতো করে তৈরী কর। নিশ্চয় নীলাঞ্জন তোমার মন বুঝবে। ভয় কি? সেবা করে, সুস্থ করে তুলবে তুমি। তোমার উপস্থিত এই ধর্ম এই ব্রত। আজ রাতেই যাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলছি আমি। একে বৃষ্টি-বাদলের দিন। ট্রেনে একটু সাবধানে থেকো। একা যাবে। মোকামার কাছাকাছি জায়গাটা ভালো নয়। বিশ্বনাথকে প্রণাম ক'রে বেরিও। তিনিই সব বিপদের রক্ষাকর্তা।

ট্রেনে যা ঘটল, জীবনে ভুলতে পারবে না সুলভা! পুনর্জন্ম হ'ল তার। ডাকাতটা তো পাঁজাকোলা ক'রে তুলে, চলন্ত ট্রেন থেকে জানলা গলিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার মতলব ছিল।

মতলব কেন—এগিয়েও এসেছিল। দরজা খুলবো না বলায় প্রতিশোধ

নেয়ার জন্য দু'হাত নিশপিশ করে উঠেছে ওর।

মর্মান্তিক কাণ্ডটা ঘটতে দেয় নি নীলাঞ্জন। ওদের দলের সঙ্গে ঢুকতে দেখেছে সুলভা ওকে। হতভম্ব হয়ে গেছে। ভেবেছে, সে কি ট্রেনের কামরায় না নীলাঞ্জনের বাড়ীতে, না অন্য কোথাও!

ওর দু'চোখে আগুন ছিল। ডাকাতরা আগুন দেখল, না আরো কিছু দেখল—জানে না সুলভা। তবে ওদের সবার মুখে ভয়ংকর ভয়ের ছায়া। অত হম্বিতম্বি একদম নিস্তেজ হয়ে গেল নিমেষে। মুখে কথা নেই কারো। নেমে গেল সকলে।

ট্রেনের কোন যাত্রীর গায়ে এতটুকু আঁচড় কাটতে পারে নি দুর্বৃত্তরা। কারো একটা কানাকড়িও নিতে পারে নি। নিতে হাত ওঠেনি ওদের। ওদের সঙ্গেই নেমে গেছে নীলাঞ্জন।

এতক্ষণ সুলভা যেন কেমন হয়ে গেছল। হতবাকও। সব দেখেছে। সব বুঝেছে কোন কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। দেহের সমস্ত শক্তি যেন হরণ করে নিয়েছিস কে।

ট্রেন চলছে।

ট্রেনের ঝকঝক আর বৃষ্টির ঝমঝম—দু'টো শব্দ মিলেমিশে নতুন রকমের আওয়াজ উঠছে একটা। শুনতে পাচ্ছে সুলভা। শক্তি ফিরে পাচ্ছে। পাচ্ছে পূর্ণ সম্বিৎ।

ট্রেনে বসে বসে ভেবেছে, একটু আগে যা ঘটে গেল, এটা কি দুঃস্বপ্ন? দু' চোখ চক্কর দিয়ে এসেছে গোটা কামরাটায়। ডাকাতরা যা-যা করেছে সব চিহ্নই বর্তমান। জিনিসপত্তর তছনছ হয়ে পড়ে রয়েছে! তার স্যুটকেস খোলা।

রাতভোর একটাই চিন্তা মাথার মধ্যে দাপাদাপি ক'রে বেড়িয়েছে সুলভার। ডাকাতরা এলো গেলো। নীলাঞ্জন? নীলাঞ্জন তো অসুস্থ! কি ক'রে এলো? না এসে পড়লে, প্রাণে বাঁচত না তো সুলভা।

তবে কি নীলঞ্জেন অসুস্থ নয় মোটে? তাকে ফেরানোর জন্য ষড়যন্ত্র সমস্ত? ডাকাত নিজেদের বন্ধুবান্ধব, আর সুলভার কাছে বীরত্ব দেখানোর জন্য নীলাঞ্জনের ওইভাবে আবির্ভাব-প্রস্থান। এই ট্রেনে অন্য কামরায় ছিল সকলে। মিশ্রজিরও হাত রয়েছে এ নাটকে।

সুলভার মাথা ঝিম ঝিম করছে। ভাবতে পারছে না আর। ভেতরে অজ্ঞাত অস্বস্তি। বাড়ি গিরে উষার সঙ্গে বোঝাপড়া করবে। তারপর নীলাঞ্জন আর প্রভাসের সঙ্গে। তাকে নিয়ে পুতুলনাচ নাচিয়েছে সবাই। আর কলকাতা নয়, আপন-পর সকলকেই চিনেছে। সুলভা এমন জায়গায় পালাবে এবার, এমন জায়গায় লুকোবে—কেউ খুঁজে পাবে না।

সুলভার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। ভেতরটা বড্ড ফাঁকা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। কেউ নেই তার। কেউ বুঝল না তাকে, কেউ চিনল না তাকে।

বাড়ির সদর দরজায় চৌকাঠের ওপর পা রাখতেই বুকের ভেতর ছ্যাত করে উঠল সুলভার। বাড়িটা নির্বান্ধবপুরী। একটা থমথমে ভাব। রেলিং ধরে ধরে

ওপরে উঠল। নীলাঞ্জনের ঘরের মেঝেয় মাসী অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। ঊষা মাথায় জল দিচ্ছে।

চোখাচোখি হতে দৌড়ে এলো ঊষা। জড়িয়ে ধরে, ডুকরে কেঁদে উঠল। সেই এলি, আর একটা বেলা আগে আসতে পারিস্ নি ? কাল সন্ধ্যেয় দাদা চলে গেছে রে! কি ছট্‌ফটানি তোকে দেখার জন্য।

সুলভার মাথা ঘুরছে। পায়ের তলার মেঝে কাঁপছে। রাতের ট্রেনের নীলাঞ্জনকে দেখছে যেন। ডাকাতদের হাত থেকে ওকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসছে। সুলভা কি ট্রেনে যাচ্ছে এখনো ?

চোখে কোন কিছু দেখতে পাচ্ছে না আর সুলভা। চতুর্দিকে জমাট কালো। মিশমিশে কালো। পড়ে যাচ্ছে সুলভা। অনেক উঁচু থেকে নিচে, নিচে—আরো নিচে।

বেহুঁশ হয়ে পড়ল সুলভা। ঊষার কাঁধের ওপর মাথা লুটিয়ে পড়ল।

চার

এমন বিব্রতবোধ জীবনে আর কোনদিন করিনি আমি। সাতসমুদ্রের সব জলই কি উঠে এসেছে চিনুর মুখ-চোখের কোণায়? কান্না সংক্রামক ব্যাধি, নিজেকে সংযত রাখতে পারিনি। কখন ওই জলের বন্যা আমার দু'চোখের তারাকে ডুবিয়ে দিয়েছে, অঝোরে ঝরিয়ে দিয়েছে, তা আমি নিজেও জানিনি।

, ওকে থামাবার কোন সান্ত্বনার বাণী আমার বুদ্ধির অভিধানে খুঁজে পাচ্ছিনা। ভেতরটায় অসহ্য যন্ত্রণা। কেন মরতে গেছলুম আমি তামিলনাদ সঙ্গীত সম্মেলনে? গেছলুম না হয়, পোড়াচোখ চিনুর দিকেই বা ফিরে তাকাল কেন? চিনুর দুচোখে জল ঝরছে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করতে কি যে মতিচ্ছন্ন হয়েছিল, হয়ত এই মর্মপীড়া ভোগ করার জন্য।

চিনুকে ডেকে নিয়ে এলুম আশ্রমে। কৌতূহলী মন আমায় এমন পাগল করে তুলেছিল, কারণ জানতে চেয়েছি। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকেছে চিনু। তারপর যত না বিস্ময় আমার মনে, তত বিস্ময় ওর চোখে মুখে আর প্রতিটি কথায়।…

বিস্ময়ে ডুবে যাচ্ছে চিনু।

কান থেকে হাত নামালেই যত জ্বালা। বার বার দু'হাতে চেপে ধরতে হ'চ্ছে। চোখের পাতা বুজতে গেলেও, বুজতে পারছে না। জোর ক'রে টেনে খুলে রাখছে কে যেন। যা ভাবা যায় না, যা দেখার কথা নয়, তাই দেখছে।

বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে, কোন্‌টা সত্যি? যেটা এখন দেখেছে, না যেটা আগে দেখেছে?

আগেরটা এত সত্যি যে, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত চিনুর মন থেকে মুছে যাবে না এতটুকু। এটাকেও মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতে পারে না সে।

এখন যা দেখছে, যা শুনছে, যা ঘটছে—কতখানি সত্যি—পরখ করার জন্য আকাশের দিকে তাকাল। ধোঁয়াটে মেঘ ছেয়ে আছে তেমনি। চোখ নামাল। রাস্তা ভিজে। বৃষ্টি হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে। জামা-কাপড়ে হাত দিয়ে দেখল। সপসপে।

চিনু জেগে স্বপ্ন দেখছে না। সমস্তই ঠিক। তার শোনা-দেখাটাও বেঠিক নয়।

এগুতে চেষ্টা করল।

ভিড়ের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে চিনুর ওপর। কার সাধ্য এক পা বাড়ায়!

যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, দেয়ালে চেপ্টে যাচ্ছে। জীবন্ত সমাধি না হয় শেষে দম বন্ধ হয়ে।

না এগুলে স্বস্তি নেই। যে জন্য আসা, পণ্ড একদম। যে জন্য আসা অতদূর থেকে ছুটে—মীরাকে যা বলতে এসেছে—না বলে যেতে পারলে—মরণেও শান্তি পাবে না চিনু।

না বলতে পারার পরাজয়ের বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরে যাবে না সে আর তামিলনাদে। রঙ্গন খবর দিয়ে আনিয়েছে তাকে।—শীগগির চলে আয় কলকাতায়। মীরা আসছে এখানে।

মীরা এসেছে।

এসেছে চিনুও।

চিনু যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে, ভোর হওয়ার আগে এসেছে। এখনো আকাশের সব তারা মিলিয়ে যায়নি। রয়েছে কতক। মিলোচ্ছে ধীরে ধীরে। চারতলা বাড়ির দেয়ালটা দখল করেছে বেছে বেছে। এখান থেকেই স্পষ্ট দেখা যাবে মীরাকে।

দেখা যাচ্ছে। নিখুঁত মাপ জোখ। কিন্তু ধরা যাচ্ছে না, কাছে যাওয়া যাচ্ছে না। এখানেই হয়েছে যত গোল। বিসমিল্লায় গলদ। চিনু দেখতে পেলে কি হবে, চিনু তো জনঅরণ্যে হারিয়ে যাচ্ছে—তার সঙ্গে মীরার চোখা-চোখি হচ্ছে না একবারের জন্যও। হাতের ইশারায়ও যে জানাবে, সে এখানে আছে, তারও উপায় নেই।

পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, দু'জনে পাশাপাশি বসে রয়েছে। মীরা আর কন্নন। মঞ্চের ওপর দু'জনে। দু'জনেরই মুখে পরম তৃপ্তি। দেখলেই মনে হয়, শান্তির সাগর ছেঁচে যেন তোলা হয়েছে দু'টি পরম রত্নকে।

দু'জনকে এইভাবে একসঙ্গে দেখার আশা করেনি চিনু। একজনেরই ক'রে-ছিল—মীরার। মীরার দেখা পাওয়াটা নিজের সৌভাগ্য বলে মনে হয়েছে চিনুর। কিন্তু কন্ননের দেখা পাওয়া—কেমন কেমন লাগছে তার কাছে। এটা অসম্ভব ব্যাপার।

দেশসুদ্ধু লোক বলে, কন্নন নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। এখানে। এখানেও মঞ্চের ওপর থেকে মাইক কতবার যে ঘোষণা করল, তার গোনাগুনতি নেই কোন। —দীর্ঘ বারো বছর পর আবার ফিরে এসেছেন আমাদের মাঝে মীরা আয়ার। তামিলনাদ আর অন্ধ্রের একমাত্র শ্রেষ্ঠ লোকগীতির গায়িকা মীরাকে আমরা যেভাবে হঠাৎ পেয়ে গেছি, সেইভাবেই তামিল লোকগীতির শ্রেষ্ঠ গায়ক, অদ্বিতীয় গায়ক কন্ননকেও একদিন এই রকম হঠাৎই পেয়ে যাবো আমাদের মধ্যে। নিরুদ্দেশের পথ থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হবেন তিনি মীরারই মতন। আমাদের অন্তরের টানে না এসে পারেন না।

পাশের প্রৌঢ় ভদ্রলোককে একবার, রঙ্গনকে একবার, জিজ্ঞেস করল চিনু—নিজের দেখাটা মিলিয়ে নেয়ার জন্য—মীরার পাশে বসে কে উনি ?

প্রৌঢ় উত্তর দিল, উনি তো কন্নন। চেনেন না ? বিখ্যাত লোক। গান

শোনেন নি কোনদিন ?

কি আর বলবে চিনু ! সে সব গল্পকথা হয়ে গেছে। শুধু কি গান শোনা আর চেনা ? বন্ধু ছিল দু'জনে। এমন কতদিন হয়েছে—বাইরে এক-সঙ্গে গানবাজনা করতে গিয়ে—একজন অন্যজনের পাশে এসে না শুলে, ঘুম হ'ত না। শরীর খারাপের জন্য একজন না খেলে, অন্যজন দাঁতে কুটো কাটত না। গান গাওয়া নাওয়া-খাওয়া—সব একসঙ্গে।

লোকে বলত, হরিহর আত্মা।

নিরুদ্দেশ ! দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল চিনু।

কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছিল কন্নন ! সে আর দু' একজন ভিন্ন অন্য কেউ জানে না বড় একটা। অতি গোপন ব্যাপার, অতি গোপন জায়গা।

আমতা আমতা ক'রে ভদ্রলোককে চিনু বলল, কন্নন যদি এসেই থাকে, তাহ'লে নিরুদ্দেশের কথাটা ব্যবহার করছে কেন ওরা ? তিনি এসেছেন। বললেই তো আরো বেশী আনন্দ পায় সকলে ?

কে জানে মশাই, অতশত জানি না। হয়তো বা কন্ননকে সবাই ছেঁকে ধরবে েলে ! প্রৌঢ় ভিড় ঠেলে, একটু ভেতর দিকে চলে গেল। পাছে আবার কোন তুন প্রশ্ন ক'রে বসে চিনু। উত্তর দিতে গিয়ে গান শোনার ব্যাঘাত ঘটবে প্রতি পদে পদে।

রঙ্গন কানের কাছে মুখ এনে, ফিসফিসিয়ে বলল চিনুকে, আমার যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে ভাই। কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। স্পষ্ট দেখছে কন্ননকে। মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে নিয়ে, কপালে টক টক করে তর্জনীর দুটো টোকা মেরে রঙ্গন বলল, মাথাটা কিরকম গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ওখান থেকে আসতে পারে কি করে কন্নন ?

আকাশে কালো মেঘ জমাট বাঁধছে। চতুর্দিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। দিনে নেমে এলো রাত। মণ্ডপের ভেতর নিঅনলাইটের জ্যোৎস্না। ফিনিক ফুটছে।

মণ্ডপের কপালে আঁটা লাল সালুর রুপোলী হরফে আলো ঠিকরোচ্ছে। হলুদ-নীল-সবুজ। এক একটা হরফ নাচের তালে তালে পা ফেলছে যেন। তামিলনাদ সঙ্গীত সম্মেলন।

মঞ্চের ওপর মাইকের কাছাকাছি মীরার মুখ। মুখময় স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে পড়েছে। মাইকটা একটু নামিয়ে উঠিয়ে, এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে নিজের মনোমত ক'রে নিল মীরা।

গান শুরু হ'ল।

সেই আগের মিষ্টি মধুর গলা। গলা নয় তো, যেন বাঁশের বাঁশী বাজছে। বাজছে সেই কদমতলায়। মীরাকে প্রথম দেখেছিল যেখানে চিনু।

সে দিনের সেই গানই গাইছে।

…অরুন্দুপোলাক এল ভয়ম্… ।

এত ভয় কেন রে তোর ?

অভয় হয়ে—

আছে ঘিরে—

ভাঙরে ঘুমের ঘোর !

স্থান-কাল—সমস্ত ভুলে যাচ্ছে চিনু। ভুলে যাচ্ছে নিজের অস্তিত্ব। যেমন গেছল একবার।

মণ্ডপ উপচে কালো মাথার ভিড় রাস্তায় আছড়ে-আছড়ে পড়েছিল এতক্ষণ। মীরা গান ধরার সঙ্গে সঙ্গে কালো ঢেউয়ের উথালপাতাল কমে গেল। অত লোকের নিঃশ্বাস একটা লোকের নিঃশ্বাস হয়ে পড়েছে যেন। অত লোক স্থাণুর মতন ধীর-স্থির একটা লোক হয়ে গেছে যেন ! সকলে সঙ্গীতমুগ্ধ, সম্মোহিত।

সুরের মূর্চ্ছনায় পেছনে চলে যাচ্ছে চিনুর মন। বিয়াল্লিশ থেকে বাইশে গিয়ে থমকাল। দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছত্রিশের মীরাকে দেখছে ষোড়শী।

মণ্ডপ দেখছে না। দেখছে এদিক-ওদিকে বড় গাছ ছোট গাছ। কদমতলার ওধারে মঞ্জীরা নদীটা বয়ে চলেছে তরতর করে। কি চকচকে স্বচ্ছ জল। আয়না। মুখ দেখা যায়। তলায় মাছের সাঁতার কাটা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মণ্ডহীরা গাঁয়ের মঞ্জীরা নদী।

বাতাসে শহুরে গন্ধ নেই। সবুজ মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ।……

দলবল নিয়ে রুকমিনী এসে পেঁছিছে। লোকগীতি সংগ্রহ করবে, গবেষণা করবে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে। সঙ্গে কন্ননও রয়েছে। কন্নন তো থাকবেই। ও না থাকলে শিবহীন যজ্ঞ। রুকমিনীর ডান হাত। তামিল গানের পণ্ডিত। রুকমিনী বলে, ও না হলে সঙ্গীত বিদ্যামন্দির উঠে যাবে তার। ওর জন্যই এত ছাত্রছাত্রী। প্রতিভা বটে !

পিত্তি জ্বালানো কথা। চিনু এত অনুগত—দেবীর চোখ যদি থাকত, কন্ননকে নিয়ে এত মাতামাতি করত না কখনো তাহলে। দশ মুখে ওর মহিমা-কীর্তন করে বেড়াত না এত। ওকে নিয়ে রুকমিনীর সবটাতেই বাড়াবাড়ি।

কন্নন আসার আগে চিনু-চিনু ক'রে পাগল হ'ত। বলত, চিনু, তুমিই বিদ্যামন্দিরের ভবিষ্যৎ। তোমাকেই প্রধান হয়ে চালাতে হবে। তোমরা শিখে-পড়ে না নিলে, আমি কি চিরদিন নারকেল দড়ির পাপোষ বুনেই যাবো? সকলের আরামে বসার মতম কার্পেট বোনা আর হবে না জীবনে ?

কেন, হবে না কেন ? তুমি যে পরিশ্রম করে লোকগীতিকে বাঁচানোর চেষ্টা করে গেলে, বাঁচবে লোকগীতি। বেঁচে থাকবে তুমি সেই সঙ্গে। আমি মৃত্যু-পণ ক'রে বিদ্যামন্দিরের সেবা ক'রে যাবো আজীবন।

চোখের কোণ চক চক করে উঠেছে রুকমিনীর আনন্দে। চিনুর হাত ধরে বলেছে, এইটাই শুনতে চেয়েছিলুম তোমার মুখে। তুমি আমার অভয়।

গানের কথা 'অভয় হয়ে আছো ঘিরে' কানে বাজছে। শুধু চিনুর নয়, দলের সকলের। বেশীর ভাগ তো রুকমিনীর। না হলে উৎকর্ণ হয়ে, অমন ক'রে শুনবে কেন ?

গান থামল।

চিনুকে হাতের ইশারায় কাছে ডেকে, কন্ননের ডানহাতের কব্জিটা চেপে ধরে এগিয়ে চলল কদমতলার দিকে। পাশে পাশে একটু তফাতে চলছে চিনু। একেবারে কন্ননের গা ঘেঁষে রুকমিনী। বিরক্তির একশেষ। ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে—এটা রুকমিনী কেন যে বোঝে না, চিনু ভেবে কিছু পায় না।

ব্যাপারস্যাপার দেখে দেখে চিনুর যে মাথার রক্ত ফুটেছে দিনরাত টগবগ করে, সে তাপের ছোঁয়া রুকমিনীর মনের দোরে পৌঁছোয় না। যদি পৌঁছত, যদি মমতা বলে কোন বস্তু ভেতরে একটুও থাকত, তাহলে মমতার মোম গলে অন্তত তার জন্যে দু'ফোঁটা চোখের জল ঝরে পড়ত সহানুভূতিতে।

অনুশোচনার আগুনে দগ্ধে মরত রুকমিনী। নিতান্ত ভালোমানুষটাকে অবহেলার চোখে দেখে, কি অন্যায় না করছে সে। অন্যায়ের পথে, চিনু ব্যথা পায় যাতে - সে ধারে পা বাড়াত না আর দ্বিতীয়বার।

তা হবার নয়। কন্নন থাকতে রুকমিনী তার দিকে চোখ ফেরাবে না আর। বাইরের দু'চোখে কন্ননের রূপের ঠুলি আঁটা। মনের চোখে গুণের ঠুলি।

রুকমিনীকে ছাড়বে না তবু চিনু। শেষ অবধি দেখবে শেষ পরিণতি। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়!

কদমতলায় এসে উপস্থিত হতে, চমকে উঠল মীরা। রুকমিনীকে দেখে যত না লজ্জা হয়েছে, সঙ্গের দলবলকে দেখে ছেলেদের দেখে, লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করেছে। ফর্সা মুখে লালের ছোপ ধরেছে।

লজ্জা ভাঙল রুকমিনী। বলল, তোমার গলা শুনে দৌড়ে এসেছি ভাই। তোমার গান আমায় পাগল করেছে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই গানই শুনতে চেয়েছি এতদিন। আসল সুর পাইনি। সব নকল। তোমার বাড়ি কোথা ভাই?

নদীর ওপারে গাছপালা দিয়ে তৈরী খুপরিটা দেখিয়ে দিয়েছে মীরা আঙুলের ইশারায়।

উচ্ছ্বাসে গড়গড় করে রুকমিনী যা বলে গেল, মর্মার্থ বুঝল না মীরা।

মেঝেয় নামানো মাটির কলসীটা কাঁখে তুলে নিল। জল ভরে রেখে বসেছিল। গান গাইছিল। বাড়ি যাবে এবার। আড়চোখে শহুরে লোকের সাজসজ্জা দেখে নিল একবার। চোখে নতুন ঠেকল। একটা অজানা নতুন অস্বস্তি স্নায়ু বেয়ে ওঠানামা করছে।

মীরা পায়ে পায়ে এগুচ্ছে।

ষোড়শী মীরার পিঠ বেয়ে বেণী ঝুলছে। একটা বুনো ফুলের মালা জড়ানো।

রুকমিনী দেখছে আর মনে মনে ভাবছে। বিদ্যামন্দিরে নিয়ে যেতে পারলে এ মেয়ে একটা সম্পত্তি। মীরাকে অনুসরণ করে চলেছে রুকমিনী।

আঁকাবাঁকা নদীর পাড়ে পা ফেলে ফেলে ঘরে এসে হাজির হ'ল মীরা।

নারকোল পাতার চাটাই পাতা মেঝেয়। বুড়ো কাকা গালে হাত দিয়ে বসে আছে চুপচাপ।

এলো রুকমিনী।

না ডাকতেই মাথা নিচু ক'রে ঘরে ঢুকেছে। ঘরের চাল খুব নিচু। সামনে
দিকে ঝুলে পড়েছে একটু।

অবাক চোখে তাকিয়েছে কাকা।

নিজের পরিচয় দিয়েছে রুক্মিনী।

যে সঙ্গীতে বিদ্যামন্দিরের দেশেঘরে এত নাম, রুক্মিনীর নিজের হাত
গড়া। জীবনপাত ক'রে চলেছে প্রাচীন লোকগীতি প্রচলনের জন্য। এই স
প্রচেষ্টায় মীরার কাকার সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন। যার এমন শান্ত-সৌম্য ম
দয়ার কাজল আঁকা টানা টানা চোখ, তার কাছ থেকে শূন্য ভিক্ষের ঝুলি নি
শুধু হাতে ফিরে যেতে পারে না কেউ। বিফল হয়ে ফিরে যাবে না রুক্মিনী
ঘরে ঢোকার মুখে, কাকার দিকে তাকিয়েই তাই মনে হয়েছে তার।

লোকগীতির পুঁজিতে কাকা গভীর জলের মাছ। অফুরন্ত পুঁজি গিসগি
করছে দাড়ি-গোঁফ আর মাথার অর্ধের অবধি কামানো মাথার মধ্যে। ভাইবি
গানেতেই মালুম হয়ে গেছে।

মনে মনে যা ভেবেছে রুক্মিনী, না রেখে-ঢেকে সমস্ত বলেছে কাকাকে
বলেছে, মীরাকে নিয়ে গান শেখাতে চায় সে। যা জানা আছে, সব উজাড় ক
দেবে ওকে। তার বিনিময়ে মীরা কাকার আর তার অভিজ্ঞতার ফসল বিলি
দিয়ে বেড়াবে অকাতরে—সকল দেশের সকল মানুষকে। আনন্দের ছোঁয়া লাগু
অশান্ত পৃথিবীর আকাশে-বাতাসে মাটিতে-পাহাড়ে নদীতে-সমুদ্রে!

ফোকলা দাঁতের হাসিতে বৃদ্ধের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কাঁপা গলায় আ
আস্তে বলেছে, বসার জায়গা নেই, ছোট্ট কুঁড়ে। তোমাদের মতন লোকে
কোথায়ই বা বসাই?

কাকা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। রুক্মিনী কাকাকে সহজ করে নেবার জন্য বল
আপনি কিছু ভাববেন না। বেশ দাঁড়িয়ে আছি আমরা। আমরা তো আপনা
ছেলেমেয়ে। অত সংকোচ বোধ করার কি আছে? ছলছল করে উঠেছে কাকা
দু'চোখ।

বলেছে, অভাগিনী মীরার বাপই দেহাতি গানে ওস্তাদ ছিল। মেয়ে তা
কাছে কাছে বসে শুনত। বাপের গলায় গলা মিলিয়ে গাইত—সোনালী ফসলে
ভরে উঠুক ক্ষেত…।

অসময়ে এমন বাপকে হারাতে হ'ল। মা-টা একটু-আধটু জানত, ওর বরাতে
রইল না আর বেশীদিন। মা-বাপ মরা মেয়েকে নিয়ে তার যে কি জ্বালা।
কাকে বোঝাবে! একে ধড়ধড়ে ভাঙা শরীর, তার ওপর মেয়ের চিন্তা! যে
বিয়ে-থা করেনি, সেই ভয় তাকে নিবিড় করে আঁকড়ে ধরল। সংসারের দায়দা
মাথায় পড়ল বজ্রাঘাতের মতন।

বৃদ্ধ কাকা। মীরার চিন্তায় পাগল হয়ে উঠেছিল—কি করা যায়, ও
চালানোর ব্যবস্থা হতে পারে কিভাবে, বড় হয়েছে, পাত্রস্থ করলেই বা কেমন
গরীবের ঘরে কোন উদার পদার্পণ করে কি কখনো?

এরা এসেছে। ঈশ্বর প্রেরিত। স্বকর্ণে শুনেছে ঈশ্বর—প্রার্থনা। কাকা

লতে হয়নি কোন কথা। নিজেরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চাইছে মীরাকে। ঃখিনীর ভাগ্য ফিরবে বুঝি এবার। বিধি সদয়।

আকাশ-পাতাল কি এত ভাবছে কাকা ? উত্তর দেবার নাম নেই। রুক্মিনীর ধর্য ধরা মুশকিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বলল, আমরা কেমন, আমাদের বিদ্যামন্দির কেমন—চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে আসুন না তামিলনাদে গিয়ে একবার। তারপর বোঝেন যদি, আমাদের ওখানে ভাইঝিকে শিখতে দেবেন, মনঃপূত না দেবেন না। গিয়ে দেখবেন, টাকা দিয়েও আমাদের বিদ্যামন্দিরে ঢুকতে না অনেক ছেলেমেয়ে।

কাকার মুখের দিকে চেয়ে রইল রুক্মিনী কিছুক্ষণ। কাকাও একবার মীরার দিকে একবার তার দিকে চোখ ফেরাল। কি যেন কি ভাবল একটু। ন, তোমাদের সঙ্গেই মেয়েকে নিয়ে যবো আমি।

তামিলনাদের শহর ঘুরে ঘুরে দেখেছে কাকা। দিনকতক ধরে রয়েছে খানে। যত্ন-আত্তির কোন ত্রুটি করেনি রুক্মিনীর। রুক্মিনীর এমন আপন- উঠেছে কাকা যে, তাকে বলে, তুমি আমার পূর্বজন্মে নিশ্চয় মেয়ে —নাহলে এত টান কি করে হল ?

রুক্মিনী হেসে বলে, কাকা, তাই তো ভাবি—যোগাযোগটা অদ্ভুত ! পাশের যাওয়ার কথা, গেলুম কিনা ও গাঁয়ে ! কে যেন ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে গেল অজান্তেই। আর গাইবি তো গা না হয় অন্যসময়ে, তা নয়—আমাদের শানানোর জন্যই যেন জলের কলসী ফেলে রেখে, ঘরে না ফিরে, গান গাইছে মীরা কদমতলায় বসে বসে। আরো আশ্চর্য, আমরা ওই রকম গানেরই খোঁজ রছি। কোথায় পাওয়া যায় কে জানে !

কাকা বলল, তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করেছে যেমন ভগবান, আমারও করেছে। তোমাদের হাতে ওকে তুলে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত।

আপনি কিন্তু আসবেন মাঝে মাঝে।

শহরে তো থাকেনি কখনো। মন খারাপ হতে পারে বৈকি। এলে গেলে স্থির থাকবে বরং। গানে মন বসবে। বলে, রুক্মিনী বুকে চেপে মীরাকে।

মীরার দু'চোখের কানায় কানায় জল।

রুক্মিনীরও গলাটা ধরে এসেছে। ভিজে ভিজে। বলল, কাকা আবার তো ! আমি তোমার বড় বোন। কোন ভয় নেই।

ট ফুলিয়ে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বাচ্চা মেয়ের মতন কেঁদেছে মীরা। ডান তর উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে কা।

মীরাকে পাশে নিয়ে খাটের ওপর বসেছে রুক্মিনী। পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে সান্ত্বনা দিয়েছে—তুমি যখন বড় হয়ে উঠবে—সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী হবে,

তখন কাকা সুখী হবেন তোমার। কত শ্রদ্ধা পাবে কত ভালোবাসা পাবে দশ-জনের কাছ থেকে। গুরুজনদের আন্তরিক আশীর্বাদের মধ্যে দিয়ে গড়ে তুলবে তুমি নিজেকে। শিবের পায়ের প্রসাদী ফুল তুমি—

বাকিটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। আঁচলের খুঁট দিয়ে কাজল ধোয়া চোখের জলের দাগ মুছে দিল গাল থেকে রুক্মিনী। মীরার কান্না থেমেছে। আর ওকে দেশের কথা মনে মনে ভাবতে দেয়াও উচিত নয়। একলা বসিয়ে রাখলে কাকার মুখ ভেসে উঠবে। কাঁদবে আবার।

গানের ঘরে নিয়ে এলো রুক্মিনী।

ছাত্র-ছাত্রীরা উঠে দাঁড়াল তাকে দেখে। কন্ননও। চিনু ওঠেনি। বসে বসে সুর ভাঁজছে চোখ বুজে।

মেঝের ঘর জুড়ে সবুজ ছোপানো দড়ির কার্পেট। দেয়ালে দেয়ালে রুক্মিনীর ছবি। এক এক জায়গায় এক এক অনুষ্ঠানের। মঞ্চের ওপর বসে গাইছে সে।

সকলকে বসতে বলে, বসল রুক্মিনী। পাশে বসেছে মীরা। চোখ বুলিয়ে দেখছে ঘরখানা। সবুজের সমারোহ। দরজা-জানলা পরদা বাজনার ঘেরাটোপ —সবই এক রঙা। গোটা ঘরটায়, ঘরের জিনিসে সবুজ ঢালা।

মীরার অশান্ত মন শান্ত হয়ে আসছে। চোখের কোণ জ্বালা ক'রে উঠছে না আর। বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। ভালো লাগছে ঘরের সকলকে। সকলের মিষ্টি হাসি। ভালো লাগছে রুক্মিনীকে।

কন্ননের সঙ্গে দেখা এই প্রথম নয়। মণ্ডহীরা গাঁয়ে হয়েছে। সেখানে গানের রেশ ধরে গানের মানুষের কাছে পোঁছানো, গানের মানুষকে দেখা-চেনা। এখানে ছাত্রী আর শিক্ষক হিসেবে দু'জনের সম্বন্ধ পাতিয়ে দিল রুক্মিনী নিজেই।

কন্ননের দিকে চেয়ে বলল, তোমার নতুন ছাত্রী! তোমার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস। একে তৈরী করবে মনের মতন করে। আমার—সবার মুখ করবে।

কন্নন এমনিতেই লাজুক-বিনয়ী। লজ্জায় নুয়ে পড়ল আরো। কথা আটকে যাচ্ছে। থেমে থেমে বলল, কি বলছেন আপনি! আমি কতটুকু জানি! আপনি স্নেহের চোখে দেখেন বলে, অনেক বড় করে ভাবেন।

তা নয়, যা সত্যি তাই বলছি। তুমি আমাদের লোকগীতির কুবের-রাজা বিশেষ ক'রে তামিল গানের।

কেন—মীরাও তো তামিল গান জানে খুব ভালো। তামিল গানই তো গাইছিল সেদিন।

মীরার চিবুক ধরে একটু নেড়ে দিল রুক্মিনী। বলল, কার কাছে শি ছিলে বোন?

মীরা মৌন। মুখ নিচু ক'রে বসে আছে।

রুক্মিনী নিজেকে খুব বিব্রত বোধ করছে। জিজ্ঞেস করাটা ভালো হয়নি

মন ঘোরাতে গিয়ে মনে পড়িয়ে দিয়েছে পূর্বস্মৃতি। কাকার মুখে শুনেছিল, ওর বাবা গুণীলোক ছিল লোকসঙ্গীতে।

কাকা মীরার কাছে এখন দূরের। বাবার বাবা এতদূরের যে, সে দূর থেকে ওর কাছে ফিরে আসবে না আর। নিজের বাপের কথা মনে পড়ছে রুক্মিনীর। ছোটবেলায় সে-ও হারিয়েছে। মীরার জীবনের সঙ্গে এক্ষেত্রে তারও প্রায় মিলই রয়েছে অনেকখানি।

রুক্মিনীর প্রথম গানের পাঠ নেয়া বাবার কাছেই।

ভেতরটা ডুকরে কেঁদে উঠেছে। আর বসে থাকলে সংযত ক'রে রাখতে পারবে না নিজেকে। কান্নার বন্যা ছুটবে চোখে। বাবাকে মনে পড়ে যখন, ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে সে কেঁদে নেয় কিছুক্ষণ। সেই সময় দেখা করে না কারো সঙ্গে। সবাইকে বলে দেয়া আছে, দরজা বন্ধ দেখলে কেউ যেন না ডাকে, বিরক্ত না করে। বুঝবে অসুস্থ। একটু সুস্থ হলে নিজেই বেরিয়ে আসবে।

ডাকে না কেউ। কান্নার পর মন হাল্কা হয়ে যায় কিছুটা। চোখের জলে কাজল ধুয়ে গেছে। আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। কাজল টেনে নেয় ঘন করে। বিনুনির মালার ফুল থেঁতলে গেছে। বিছানার বালিশে এপাশ-ওপাশ করার দরুন। ড্রেসিংটেবিলের ওপর থেকে কলাপাতার মোড়ক খুলে, আর একটা সুগন্ধী ফুলের মালা বিনুনিতে জড়িয়ে দেয়।

বড় হওয়ার কি জ্বালা! নিজের ব্যথা-বেদনা প্রকাশ হয়ে পড়ার উপায় নেই কারো কাছে। আশ্চর্য জীবন! প্রকাশ হলেই লোকে যে চোখে দেখে, সে চোখে দেখবে না আর। বলবে, আমাদের চেয়ে যে সমস্ত বিষয়ে তফাৎ—সাধারণের মতন ব্যথা-বেদনা বা অস্থিরতা থাকবে না, সেই না আমাদের আদর্শ। সেই না আমাদের মাথা।

মাঝে মাঝে একলা ঘরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রুক্মিনী। নিজে নিজেই বলে, লোকগুলো কেমন? বোঝে না কেন? মাথারাও রক্ত মাংসের মানুষ, তাদেরও শোকদুঃখ-সুখ—সব থাকতে পারে।

ঠোঁটে হাসির প্রলেপ মাখিয়ে ঘর থেকে বেরুবার সময় সত্যি-সত্যিই হেসে ওঠে রুক্মিনী। মানুষ এটাই চায়, আসল চায় না কেউ। হৃদয়ের কাছে পৌঁছতে চায় না, হৃদয়কে কাছে টেনে নিতে চায় না।

উঠে পড়ল রুক্মিনী। কন্ননকে বলল, শরীরটা খুব ভালো নয় আমার। একটু বিশ্রাম করে আসছি। মীরাকে একটু তালিম দাও তুমি ততক্ষণ।

গানের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রুক্মিনী তাড়াতাড়ি।

ভুল ধারণা করেছে রুক্মিনী! যা ভেবেছিল তা নয়। কার কাছে শিখেছিলে প্রশ্ন করতে মীরা মনে করেছিল, সুরটা বোধ হয় গলায় বসেনি ঠিক—বেসুরো শুনে প্রশ্ন করছে। গলাটা সেদিন ধরা ধরা ছিল বলে, নিজে ঠিক গাইতে পারছিল কিনা সন্দেহ হয়েছে।

কন্ননকে বলেছে, আমার গান হবে তো? গলাটা কেমন বেসুরো-বেসুরো না?

না মোটেই না। সুরে বাঁধা একদম। গান হবে তো কি—গান তোমার হয়েই আছে।

আনন্দে ভরে গেলে মীরার ভেতর। বাবাও এইরকম বলত তাকে।

বছর দুয়েকে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল মীরার চতুর্দিকে। যেমন গলা, তেমনি গায়কি ঢং, তেমনি উচ্চারণ আর তেমনি ভাব। সব কটি মিলিয়ে মীরা নিজেই সুখদুঃখের প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে গাঁয়ের মানুষের—গাইবার সময়। মণ্ডহীরা গাঁয়ের নদী গাঁয়ের ক্ষেতখামার, গাছ ফল-ফুলে ঘাস-দূর্বা পর্যন্ত। ওর গানে সবই ধরা রয়েছে।

গান শুনতে শুনতে মুগ্ধ মানুষ দেখে নিখুঁত গ্রামের ছবি। দেখে রক্ত-মাংসের চাষীদের সঙ্গে অবস্থাপন্ন ঘরের ঘরের ছেলেরা মিলেমিশে হাল দিচ্ছে জমিতে। সবুজ ধানের গাছে ক্ষেত ভরে গেছে। আবার সবুজে সোনালী ছোপ ধরছে। সোনালী রঙের ঢেউ খেলে যাচ্ছে গোটা জায়গাটায়। বাতাস দুলছে, দোলাচ্ছে গাছগাছালিকে।

মীরা মীরাই। সঙ্গীত বিদ্যামন্দিরে এমনটি নেই আর কেউ। হয়নি আগে, হবেও না পরে।

শ্রোতাদের মুখের কথা লুফে নিয়ে রুকমিনী বলে, সত্যিই তো। আমার এত নাম, আমিও ওর কাছে হার মেনেছি। তবে হ্যাঁ, কন্ননের অবদান কম নয়। কন্নন নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। অবিশ্যি মীরার কাছে নিঃস্ব হয়ে যাওয়াটাও গৌরবের, আনন্দের। আধার ভালো। আধারে বেঁচে থাকবে লোকগীতি।

মীরার প্রশংসায় কন্ননের বুকখানা ফুলে ওঠে। সার্থক মনে হয় নিজেকে। উপযুক্ত পাত্রে পড়লে, মরা জিনিস জ্যান্ত হয়ে ওঠে সে-প্রমাণ মীরা গানের প্রথম-দিনের অনুষ্ঠানেই দিয়েছে। দিনে দিনে সরস্বতীর বরকন্যা হয়ে উঠল ও।

রুকমিনীকে কন্নন বলল, সব চেয়ে আনন্দের খবরটা শুনেছো নিশ্চয় !

কতক কতক কানে এসেছে। আচ্ছা কন্নন, খবরটা কি সত্যি ? তোমার কি মনে হয় ? আমার তো এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না। চিরদিনের শত্রু যারা—উঃ, ভাবলে ভেতরটা জ্বলে ওঠে আমার দাউ দাউ ক'রে। তোমার তো আর বাকি নেই—প্রথম থেকেই তো তুমি আমার সঙ্গে—না থাকলে, না সাহস দিলে না সাহায্য করলে—আমি কি দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম আজ মুখ তুলে ? আমাদের উৎখাত করার জন্য, দেশ থেকে সঙ্গীত বিদ্যামন্দিরের নামটা মুছে ফেলার জন্য কি উঠিপড়িই না লেগেছিল ওরা !

খবর যা ছড়িয়েছে ঠিকই। এতটুকু মিথ্যে নয়। চিনুকে দু'পক্ষই ডেকে বলেছে, হ্যাঁ, রুকমিনী একটা মেয়ে বটে ! অসীম ধৈর্য। দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। কোথা থেকে যোগাড় করল মীরাকে ?

রুকমিনীর বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল। তার বিদ্যামন্দির থেকে মীরাকে ছিনিয়ে নিয়ে না যায় আবার ? মনের ভয় মুখে প্রকাশ করল। ওরা স্বীকৃতি দেবার নামে ভাঙিয়ে নিয়ে যাবে না তো মীরাকে ?

সে ভয় নেই।

তুমি এত নিশ্চিন্ত কিসে? বলে বসলে ভয় নেই। ওদের অসাধ্য বলে দুনিয়ায় আছে কোন কিছু কি? কন্নন, আপনভোলা হলে চলে না। বাস্তব বড় সাংঘাতিক। ওদের আগের ব্যবহার মনে করে দেখ না।

না, না। সে আর হবে না। যাকে নিয়ে যাওয়ার ভয় তোমার, তার মত নিয়েই সাহস দিচ্ছি তোমায়।

মীরা বলেছে তোমায়, যাবে না?

হ্যাঁ।

জোরে হেসে উঠল রুক্মিনী।—পুরোনো প্রতিষ্ঠান। যশমান বাড়বে আরো। চারদিক থেকে মুঠো মুঠো টাকা এসেও পড়বে দু'পায়ে। এ সব লোভ ছেড়ে দেবে ও?

হ্যাঁ।

একথাও হয়েছে তোমার সঙ্গে?

হ্যাঁ।

অবাক করলে তুমি। কি স্বার্থে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে থাকবে শুনি?

তোমার জন্য, আমার জন্য। তুমি এনেছো। ওর কৃতজ্ঞতা। আমি শিখিয়েছি।

ওঃ! এ-ই। কত ছাত্রছাত্রী এলো, শেখার মুখে ওরকম ছেঁদোকথা বলল, পরে পরে একটু নাম হতেই দে সট্‌কান। খিলখিল ক'রে হেসে উঠল রুক্মিনী।

আমি বলছি তোমায়—দেখো। এ ওসব জাতের নয়। সম্পূর্ণ আলাদা। মীরা যাবে না। নিশ্চিন্তে থাকতে পারো।

কন্ননের দিকে চেয়ে রইল রুক্মিনী। এত বিশ্বাস এলো কি ক'রে মীরার ওপর?

ইয়েত্তাপুত্তগীতিচক্রম আর এরুবাক সঙ্গীতচক্রম।

দু'টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভীষণ রেষারেষি। দু'পক্ষের কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। দেখা হ'লে, দু'দলের লোকই মুখ ফিরিয়ে নেয়—কথা হওয়া তো দূরের কথা। বাইরের লোকের কাছে যারা অত সভ্য, তারা কেমন ক'রে অমন অসভ্য হয়ে ওঠে, সেটাই বিস্ময়ের বিষয়।

নমস্কারের ভঙ্গিমায় লোকে সৌজন্য বিনিময়টুকুও করে, এক্ষেত্রে বিপরীত। একেবারে পেছন ফিরে দাঁড়াবে।

ইয়েত্তাপুত্ত তামিলনাদের বহু পুরোনো দিনের লোকগীতি। ইয়েত্তাপুত্ত-গীতিচক্রম স্রেফ তামিলদের। এরুবাক তেলুগুদের। তামিলদের মতনই অনেক পুরোনো লোকগীতি।

মীরা দু'টি লোকগীতিতে পারদর্শিনী। তামিলদের তেলুগুদের। মীরা নিজে কিন্তু তামিল মেয়ে নয়। ওর কোন ভাষার ওপরই বিরূপ ভাব নেই। ওর বাবারও ছিল না। বাবা বলত, মীরা! মানুষকে মানুষ হিসাবে ভালোবাসবে। সে যে দেশেরই হোক, যে জাতেরই হোক। মনের ভাষাকে ভাষা বলে জানবে। ভাষা নিয়ে কোন বিদ্বেষ রাখবে না ভেতরে। তুমি সুন্দরের সাধিকা। যেখানে

যখুনি যেটুকু সুন্দর পাবে, তখুনি সংগ্রহ করতে ভুলবে না দ্বিধা করবে না।

মীরা বাবার মন পেয়েছে।

তামিলনাদে এসে, শিক্ষাদাতা কন্ননকে যা পেয়েছে, পরম সৌভাগ্য। কন্ননের বুকখানা কত বড় ভেবে চিন্তে মাপজোপ খুঁজে বার করতে পারে না মীরা। গল্প-উপন্যাসে পড়েছে উদার-মহৎ মনকে সাহিত্যিকরা সমুদ্রপ্রমাণ বলে। এটা কিন্তু মীরার মনঃপূত নয় মোটে। তার মনে হয়, এ বিশেষণে কন্ননকে ছোট করা হবে। সমুদ্রেরও তো শেষ আছে এক জায়গায়। কন্ননের মন এত বড়, আকাশের সঙ্গেই তুলনা করা চলে।

কন্নন তামিল ছেলে, তা হোক, সে মানুষ। কন্ননের মধ্যে নিজের সমস্ত আপনজনকে খুঁজে পেয়েছে মীরা। কন্ননের মতন স্নেহ-সহানুভূতি ত্রিভুবনে খুঁজে পাবে না। কন্নন দধীচি। তাকে বড় ক'রে তোলার জন্য কোন সভা-সমিতিতে শত অনুরোধেও গায় না। বলে, আমারই গান গাইছে মীরা, আমার গান আমার চেয়ে বরং ভালো ক'রেই গায়।

সেখানেই যায় মীরা যে পুরুষকেই দেখুক—নজরে পড়ে না সে পুরুষের মুখচোখ। কন্ননের পুরো মুখ দেখতে পায় তার মুখে। কন্নন মীরার নিশ্বাসে মীরার রক্তে মীরার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে।

কন্ননের চোখের দিকে চেয়ে থাকে যখন মীরা, ওই আয়ত চোখের তারায় নিজের সম্পূর্ণ মুখ ভেসে ওঠে। নিজেকে ভুলে যায়।

কন্ননের ছাত্রী অলমেলু এসে বলে কন্ননকে, গান হবে না আজ?

সচেতন হয়ে ওঠে কন্নন। থতমত খেয়ে বলে, নিশ্চয়। এখনি হবে।

নিজের মধ্যে ফিরে আসে মীরা। মেয়েটা কি নির্দয়! এতক্ষণ একটা সুখস্বপ্নের আনন্দ রাজ্য ঘুমিয়ে ছিল সে, ঠেলে তুলল অলমেলু।

রুকমিনী এসে বলে, আগে সূর্য-উদয় হতে না হতেই গান শুরু হ'ত — কিছুদিন দেখছি, তোমরা বড্ড দেরী কর। আমার মনে হয়, তোমরা রাত জেগে গানবাজনা কর বলে, ভোরে উঠতে পারো না। নাই বা রাত জাগলে অত!

অলমেলু মুখ টিপে হেসেছে।

লক্ষ্য এড়ায়নি রুকমিনীর।

দু'একদিন দেখে, ইশারায় বাইরে ডেকেছে অলমেলুকে। ওপরে শোয়ার ঘরে নিয়ে গেছে। খাটে নিজের পাশে বসিয়ে পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলেছে, বড় লোকরা যেখানে কথা কয়, সেখানে অসভ্যর মতন হাসি! কখনো যেন আর না দেখি।

বকুনি খেয়ে অলমেলু কেন হাসে জানিয়েছে। কন্নন আর মীরা দু'জনে দু'জনকে যে কি এত দেখে কে জানে! কখন অলমেলু এসেছে, কতক্ষণ ধরে ওদের দেখছে বসে বসে, কোন হুঁশ নেই ওদের। ডাকলে তখন হুঁশ আসে। গান শেখাতে শেখাতেও আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। আবার ডাকতে হয়। এ এক বিচিত্র ব্যাপার। অলমেলু হাসে তাই। চাপতে চেষ্টা করে। হাসি এমন ঠেলে ওঠে ভেতর থেকে যে, লোকে দেখে ফেলে।

যাও, গান শেখোগে মন দিয়ে। গম্ভীর মুখে বলে রুকমিনী। এতটুকু মেয়ে—বছর সাত-আট। তার সামনে ওরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য।

সর্বনাশ এসে গেছে। এসে গেছে সঙ্গীত বিদ্যামন্দিরের আনাচে-কানাচে অবধি। এতখানি গড়াবে ভাবতে পারেনি। রুকমিনীর ভুল হয়েছে দু'জনকে একসঙ্গে ছেড়ে দিয়ে! এ মারাত্মক ভুলের সংশোধন করবে কেমন করে?

দিশেহারা হয়ে পড়ছে রুকমিনী।

অনেক দেরী হয়ে গেছে। এখন যা অবস্থা দু'জনের একজনকে সরালে বিদ্যামন্দির ডুববে। কপালে কলঙ্কের টিপ পরতে হবে সকলকে। বাতাসে বদনাম ভেসে বেড়াবে। ইয়েত্তাপুত্ত আর এরুবাক—দুটি চক্রমেরই লোকেরা বিদ্রূপবান ছুঁড়ে মেরে মেরে তাকে দেশ ছাড়া করে ছাড়বে।

রুকমিনী দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল খানিক। তাই অভয় দিয়েছিল কন্নন—মীরা এখান থেকে যাবে না। জোর দিয়ে বলেছিল নিশ্চিন্ত হতে তাকে।

মুখ থেকে হাত নামাল।

সামনের আয়নায় দেখল নিজেকে। আঠাশে রূপ কি চলে গেছে তার? এখনো তো বান্ধবীরা বলে, মীরার দিদি মনে হলেও রূপের জৌলুষে টান পড়েনি।

খাট থেকে নামল। চুল আঁচড়াচ্ছে। সিঁথিটা ঠিক ক'রে নিল। ডান-কানের নাকছাবিটা খুলে রাখল, কেমন দেখায়! ভালো দেখাচ্ছে না। মুখখানা যেন কিরকম হয়ে গেল—কিম্ভূতকিমাকার। আবার পরল। মীরার চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

নিচের ঘর থেকে গানের আওয়াজ আসছে।

দু'জনে একসঙ্গে গলায় গলা মিলিয়ে গাইছে। কন্নন আর মীরা।

রুকমিনীর বুকে মাথায় আগুন জ্বলে উঠল দপ ক'রে।

এইরকম সেও কন্ননের সঙ্গে গাইত। নিজের অধিকার ফিরিয়ে আনতে হবে আবার আগের মতন। কন্ননের ওপর অনেক আশা। বিদ্যামন্দিরের প্রধান হওয়ার উপযুক্ত একমাত্র কন্ননই। এই টোপ গিলিয়ে কন্ননকে আটকাতে হবে নিজের কাছে। কন্ননকে ছাড়লে চলবে না। ছাড়তে হবে মীরাকে। কাল-সাপিনীকে দুধকলা দিয়ে পুষেছে না বুঝে।

নিজের সর্বনাশ নিজে করতে ভালোবাসে বোধহয় অনেক মানুষ। রুকমিনী সেই অনেকের দলে। সর্বনাশকে আদর-অভ্যর্থনা ক'রে ঘরে এনে তুলেছে। বিদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে মরণপণ ক'রে। কন্ননকে মন থেকে সরাতে হবে মীরাকে। ওর দুনিয়ায় মীরার অস্তিত্ব থাকবে না মোটে। থাকবে একমাত্র তার।

শ্রাবণের মেঘ থমথমে আকাশ।

বরাত ভালো বৃষ্টি নামেনি। রাস্তায় বাড়িতে লোকে লোকে ছয়লাপ। উদাস বিকেলে উদাসিনী দেখাচ্ছে মীরাকে! মঞ্চের ওপর বসে। বাড়ির ভেতরে

উঠোন। উঠোনে মঞ্চ তৈরী হয়েছে!

কোন গানবাজনার অনুষ্ঠানের জন্য নয়, স্রেফ মীরার জন্য। ইয়েত্তাপত্ত-গীতিচক্রমের বাড়ি এটা। তামিল লোকগীতির শ্রেষ্ঠশিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হবে, সংবর্ধনা জানানো হবে।

পাশে বসে কন্নন। রুকমিনীও মঞ্চে বসে আছে একধারে। কন্নন বলেছিল কাছাকাছি বসতে, রাজী হয়নি। মীরাও ডেকেছিল, শুনতে পায়নি যেন—এমনভাবে অন্য দিকে তাকিয়েছিল।

চক্রমের প্রধান মানপত্র পাঠ করার সময় বলল, আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ছিল। আমি সঙ্গীত বিদ্যামন্দিরের কথা বলছি। ভেবেছিলুম, ওরা লোকগীতির নামে যা-তা চালাতে শুরু করবে। মনে-কানে সে গান সে সুর অনবরত ঘোরা-ফেরা করলে, আসল জিনিস চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবে। এই কারণেই ওদের এগিয়ে যাওয়ার পথে আমরা বাধা দিতে চেয়েছিলুম, দিয়েছিও অনেক। আমাদের ভুল স্বীকার করছি। এর জন্য আমরা খুব দুঃখিত।

প্রধান আড়চোখে তাকাল রুকমিনীর দিকে। বলল, আশা করি রুকমিনী ত নম্মা অতীতের কাদা ঘাঁটাঘাঁটি ভুলে যাবেন।

আকাশের থমথমে মেঘ রুকমিনীর মুখে নেমেছে। বিদ্যুৎ ঝলকের মতন অভ্যস্ত হাসি একবার মাত্র ঠোঁটের ফাঁকে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

কন্নন-মীরা হাততালি দিয়ে সমর্থন জানাল প্রধানকে। বিরক্তির রেখা ফুটে উঠেছে রুকমিনীর কপালের মধ্যিখানে। অসহ্য, দু'জনের দাঁত বার ক'রে হাসির ঘটাই বা কি! শেষ হলে, বাড়ি যেতে পারলে বাঁচে। আসতে চায়নি। প্রধান নিজে গিয়ে বলে এসেছে। অসুখ বলে কাটাল না কেন? এসে ঝকমারি করেছে।

'ইয়েত্তাপত্তগীতি প্রধানম্' উপাধি দেয়া হ'ল চক্র থেকে!

মীরার সামনে মাইক এগিয়ে দেয়া হ'ল। উপাধি দেয়ার উত্তরে, সংবর্ধনা জানানোর উত্তরে মীরা বলল, তামিল লোকগীতির প্রধান বলে যে উপাধি দেয়া হল আমাকে—এটা যারা শিখিয়েছেন, তাঁদেরই দেয়া হয়েছে। আমি শুধু নিমিত্ত। ওঁরা প্রাণ ঢেলে না শেখালে, আমি আজ এই মঞ্চের আমি হতুম কোত্থেকে?

জোড়হাত ক'রে, মাথা নুইয়ে নমস্কার জানাল রুকমিনীকে। বলল, নমস্কারম্। কন্ননের দিকে মুখ ফিরিয়ে একই কথা বলল আবার, নমস্কারম্।

ভেতরে-বাইরে হাততালির ঢেউ উথলে উঠতে লাগল। উথলে পড়তে লাগল বেশ খানিক সময় ধরে।

রুকমিনীর মনে হ'ল, সকলের কিল-চড়-লাথি পড়ছে তার বুকে-পিঠে-মাথায়—সর্বাঙ্গে।

ইয়েত্তাপত্তগীতিচক্রম্ থেকে এরুবাক্ সঙ্গীতচক্রমে আর যায়নি রুকমিনী। ভীষণ মাথা ধরেছে বলে বিদ্যামন্দিরে ফিরে এসেছে। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়েছে। চোখের জল বাগ মানেনি। একি করল সে! নিজে খাত কেটে নিজে ডুবে মরল যে! এই সম্মান সে পেত। পেল না। মীরাকে প্রত্যেক

গানের অনুষ্ঠানে এগিয়ে দিয়েছে, নিজে না এগিয়ে মীরার জয়ে রুক্মিনীর পরাজয়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বাচ্চা-মেয়ের মতন কেঁদে সারা হয়েছে রুক্মিনী।

এরুবাক সঙ্গীতচক্রমের প্রধান ইয়েত্তাপুত্তগীতিচক্রমেরই মতো সব কিছু বলেছে ভাষণে। বয়ানের তফাৎ কেবল। এরা উপাধি দিল 'এরুবাক সঙ্গীত-মাল্যম্'।

সংবর্ধনা আর উপাধি দেয়ার উত্তরে ধন্যবাদ জানিয়ে আগের মতনই উপাধি-সংবর্ধনা কার প্রাপ্য, জানিয়ে দিয়েছে মীরা সকলকে। বলেছে, তেলুগু-লোক-গীতি অসংখ্য। সব তো আয়ত্তে আনতে পারিনি আমি। খুঁটিয়ে সব আবিষ্কার করাও সম্ভব হয়নি এখনো। এর মধ্যেই তেলুগু-লোকগীতির মালা হয়ে গেলুম আমি! সত্যিই কি হ'তে পেরেছি?

শ্রোতাদের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠল, পেয়েছেন। আমাদের যতটা দিয়েছেন, তাতে একটা মালা গাঁথা হয়ে গেছে তো নিশ্চয়ই।

কি বলতে গিয়ে আর বলল না মীরা। মাইকের কাছ থেকে মুখ সরিয়ে নিল। তার গলার স্বরও ডুবে যাবে। কারো কর্ণগোচর হবে না এক-বর্ণও।

রাশি রাশি ফুলের তোড়া ফুলের মালা নিয়ে কন্নন-মীরা হাসির জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়ে বিদ্যামন্দিরে ফিরেছে। আশা করেছিল ওরা রুক্মিনী হয়তো ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে দোরগোড়ায় এগিয়ে আসবে আনন্দে। কিন্তু কেউ এলো না।

ভয় ধরল মীরার। অসুস্থ বলে ফিরে এসেছে, বাড়াবাড়ি হয়নি তো কিছু। হলেও, খবর পাওয়ার উপায় নেই, যতক্ষণ না ঘরের দরজা খোলে রুক্মিনী।

মীরার মুখ বিষণ্ণ। কখনও চিন্তাগ্রস্ত।

দরজা খোলার আওয়াজ হল। বেশ জোরেই। রুক্মিনী বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। মুখ চোখ ফুলো ফুলো। মীরার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ফুটে উঠল কণ্ঠস্বরে। বলল, এখন কিরকম বোধ করছেন? ডাক্তার এসেছিল কি খবর দোব?

মুচকে হেসে রুক্মিনী বলল, দরকার নেই। আমি খুব ভালো আছি, খুব ভালো।

ফুলের মালা ফুলের তোড়া হাতে যা ছিল, রুক্মিনীর পায়ে রেখে প্রণাম করল মীরা।—আপনার জন্যই সব।

আমার জন্য নয়, কন্ননের জন্যই তোমার সমস্ত। আমি আর কি করেছি বল না? কন্ননকে দেয়া উচিত ছিল।

দু'চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল মীরার। কি একটা ভাবল। ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল। বলতে যাচ্ছিল কিছু, বলল না আর। নিজের গলার গোড়ের মালাটা খুলে কন্ননের পায়ে রাখল।

পা থেকে মালাটা তুলে নিল কন্নন। গন্ধ শুঁকে হাসতে হাসতে বলল, এটা সংবর্ধনার মালা। পায়ে স্থান নয় এর। এর স্থান যেখানে, সেখানেই থাক। মীরার গলায় পরিয়ে দিল।

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে দেখল রুক্মিনী। স্পর্ধারও একটা সীমা থাকে, সীমার বাইরে গেছে এরা। তার চোখের সামনে বেহায়াপনা। দু'জনের বিয়ে

হয়নি, অথচ মালা দেয়াদেয়ি—লোকে দেখলে বলবে কি? আমার এখান থেকে এখুনি বেরিয়ে যাও! মুখ দেখতে চাই না আর তোমাদের। মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল। খুব সামলে নিল রুক্মিনী।

অন্যায় সহ্যের যে কত যাতনা, যে ভোগ করেছে সেই জানে। কে যেন দমাদ্দম করে হাতুড়ির ঘা মারছে রুক্মিনীর বুকের ওপর। দাঁড়াতে পারল না। যাওয়ার সময় বলে গেল, শরীরটা ভালো নয়—কেউ আর ডেকো না আমায় আজ।

মীরা একটা মিলনসেতু হয়ে দাঁড়াল তামিল আর তেলুগুদের এক করার মূলে।

দেশে দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে লড়িয়ে দিচ্ছিল এক শ্রেণীর লোকেরা। বিদ্বেষের বিষ দুদিকেই ছড়াচ্ছিল। তামিলরা স্বার্থপর, ওরা তেলুগুদের সংস্কৃতি নষ্ট করে দিয়ে নিজেরা সব বিষয়ে সর্বেসর্বা হয়ে থাকতে চাইছে, তেলুগুদের আত্ম-সম্মান রক্ষার জন্য আন্দোলন করতে হবে। তাদের জন্য আলাদা রাজ্য চাই। এর জন্য যতরকম দুঃখকষ্ট আছে, বরণ করে নেবে তারা। শত শত জীবন বলি দিতে হবে। রক্তের নদী বইয়ে দিতে হবে দেশের মাটিতে। তাদের দাবি মেনে না নিলে আগুন জ্বলে উঠবে চতুর্দিকে। সে আগুন নেভানোর সাধ্যি নেই কারো।

তামিলরাও তৈরী হচ্ছে। তাদের বলা হচ্ছে, তোমাদের একচুল জায়গা ছাড়বো না। ওরা কি করতে পারে দেখা যাক না! যত গর্জায় তত বর্ষায় না জানবে। ওরা দেশের শত্রু। দেশকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলতে চাইছে। বিদেশীদের আধিপত্য করার সুবিধে ক'রে দিচ্ছে। এ দুশমনদের নিপাত যাওয়াই মঙ্গল।

দু'পক্ষের মাথার খুন চেপেছে।

মীরা নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করে, গানের মধ্যে দিয়ে দু'পক্ষকেই শান্ত করে রেখেছে। গানের ভাষা বুঝিয়েছে সকলকে—এক বাতাস থেকে এক নিঃশ্বাস নিয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছি আমরা দু'টি সম্প্রদায়ই। এক রোদ্দুর এক নদীর জল এক মাটির ফসলে আমরা মানুষ। আমরা সবাই এক। এক দেশের এক জাতের মানুষ আমরা। একজনের রক্ত বেরুলে, সকলের রক্ত বেরুবে। একজনের মৃত্যু হলে, সকলের মৃত্যু হবে।

দু'দলই মীরার গুণমুগ্ধ। সেই সুযোগ পুরো নিতে ভোলেনি মীরা। ওরা মীরার কথা শুনেছে। বলেছে, মীরা দেবী, মীরা তাদের বিবেক। মীরা দেশের আনন্দ, দেশের শান্তি।

মীরার প্রত্যেক গানের অনুষ্ঠানে কন্নন সঙ্গে গেছে। তাকে উৎসাহ দিয়েছে। বলেছে, শিল্পী এই দেশের জল-হাওয়ায় মানুষ। দেশের ওপর তারও একটা কর্তব্য আছে। মহা-কর্তব্য পালন করছো তুমি মীরা।

মৃদু হেসে, চোখ নামিয়ে মীরা বলেছে, আপনার মতন লোক পাশে না থাকলে আমার দ্বারা সম্ভব হ'ত না এসব। এটা আমার কর্তব্য নয়, এটা আমার

পুজো।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে কন্নন। মীরার পিঠে হাত চাপড়ে বলেছে, মীরা, তুমি শিল্পী জানতুম, কিন্তু তার চেয়েও তুমি অনেক—অনেক বড়।

ঘরে ঢুকে পড়েছে রুকমিনী। কানে কথা যেতে, মন অসুস্থ হয়ে পড়েছে আবার।

হাসি আসে নি, তবু হেসেছে। বসতে ইচ্ছে করে নি, তবু বসতে হয়েছে। ঘরের কোণে বসে আছে চিনু। চিনু লক্ষ্য করছে রুকমিনীকে। কিছুদিন ধরে বড্ড অসহায় হয়ে গেছে যেন। সব হারানোর ব্যথা পুষে পুষে পাগল না হয়ে যায় শেষে! বেশ বুড়িয়ে গেছে। চোখের কোলে কালি। মুখের জেল্লা কমেছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল চিনু।

চাপা গলায় কন্ননকে বলল রুকমিনী, অতি অবশ্য তুমি একবার দুপুরে দেখা ক'রো। এখন উঠি।

রুকমিনী উঠে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিনুও উঠে পড়ল।

ঘরে এলো।—আমার একটা কথা শুনবে তুমি?

চিনুর দিকে মুখ ফেরাল রুকমিনী।—অন্য সময় এসো। এখন বিরক্ত ক'রো না।

দরকারি কথা ছিল। এক মিনিটের মধ্যে চলে যাচ্ছি।

খাটে বসল রুকমিনী, চেয়ারে চিনু।

চিনু বলল, তোমার অশান্তির কারণ আমি জানি। ভেবে শরীর খারাপ করে কোন লাভ নেই। আমি ব্যবস্থা করছি। কন্নন-মীরার বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে। আমি তার উপায় খুঁজে পেয়েছি।

অধীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করল রুকমিনী, কি উপায়?

কুটিল হাসি নেচে উঠল চিনুর দু'চোখে।—তেলুগু-তামিলের ঝগড়া বাধিয়ে দিতে হবে ওদের দু'জনের ভেতর। কন্নন তামিল, মীরা তেলুগু। তেলুগু মেয়ে কন্ননের বুকে ছোরা বসাবেই। তামিলদের ঘেন্না করে, বিশ্বাসঘাতক ভাবে ওরা। নিজেদের কাজ গোছানোর জন্য ওরা পায়ের কুকুর, তারপর মাথার মুগুর কন্ননের মাথায় ঢুকিয়ে দোব আমি।

নিবিড় অন্ধকারে আলোর বিন্দু একটা দেখতে পেল রুকমিনী। বিন্দু—হারিয়ে যেতে কতক্ষণ! সংশয়ের দোলায় রুকমিনীর মন দুলে উঠল। বলল, কন্ননের মাথায় ঢুকবে কি? ঢুকলেও মীরা কি বোঝাবে কে জানে!

যাই বোঝাক, এ জাতের ব্যাপার, জাতের ব্যাপার। এখানে মানুষ ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে উঠতে বাধ্য। ইতিহাসে অনেক নজির মিলবে। বিয়ে করা স্ত্রীকে ছেড়েছে সৈন্যরা শত্রু দেশের মেয়ে হয়ে পড়লে।

মনে মনে বলল রুকমিনী, ভিতটা শক্ত মনে হচ্ছে। মুখে বলল, তুমি তো জানো, আমাদের প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন কন্ননকে। ও যাতে না ভেসে যায়—যা ভালো বিবেচনা কর—ক'রো।

মতলব ভাঁজতে ভাঁজতে চলে গেছে চিনু। রুকমিনী সদয় হলে তার আশা

পূর্ণ হবে। কন্ননের বদলে তাকেই বিদ্যামন্দিরের প্রধান ক'রে দেবে। আর ভবিষ্যৎ ? ভবিষ্যতে রুকমিনীর হৃদয়ের প্রধান—হৃদয়েশ্বর হয়ে উঠবে সে !

সঙ্গীতসাধনা করে চিনু। সেই সঙ্গে রুকমিনীকে পাওয়ার সাধনাও করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। প্রতি পদে পদে ব্যর্থ হয়ে গেছে! তাকে দেখলেই রুকমিনী খিটখিটে হয়ে ওঠে। কটমট করে তাকায়। সবটাতে চিনুর দোষ, চিনু অপরাধী। চিনুর নাম নেই মুখে একবারও, কেবল কন্নন-কন্নন। প্রতিষ্ঠানের জন্য রুকমিনীর জন্য জীবনপাত করে চলেছে চিনু—সাক্ষাতে—গোপনে। রুকমিনীর দৃষ্টি নেই একদম।

কন্ননকে নিয়ে, মীরাকে নিয়ে পাষাণীর বুকে চিড় খেতে শুরু করেছে এবার। ওই চিড়ের ভেতর দিয়ে অন্তরে প্রবেশ করবে চিনু। করবে আধিপত্য বিস্তার। প্রতিষ্ঠান তার রুকমিনী তার। কন্নন পর মীরা পর।

দুপুরে এসেছে কন্নন।

মেঝের নীল কার্পেটের ওপর বসেছে। সামনে এসে বসেছে রুকমিনীও। কন্নন মেঝেয় বসলে রুকমিনীও মেঝেয় বসে। অন্যদের বেলায় যেমন খাটে বসে থাকে, এক বেলায় পারে না। কেমন বাধো বাধো ঠেকে। নিজের কাছে কন্ননকে বড় মনে হয়। তাছাড়া নিজের চেয়ে কন্ননকে বড় ভাবতে ভালোলাগে রুকমিনীর। কত লোকই না বিয়ে করতে চেয়েছিল রুকমিনীকে। কন্ননের মতন কাউকে পায় নি। এক একটা বিয়ে নাকচ করেছে—এক একটা মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে। কন্নন শিক্ষক, সে প্রধান—বিয়ে হয় কেমন করে ? কন্ননকে প্রধান করার পর—ওর ঘরণী হওয়ার ইচ্ছে ছিল। সমস্ত ভেস্তে যেতে বসেছে মীরার জন্য।

চুপ করে বসে আছে রুকমিনী।

কন্ননই প্রথম কথা কইল।—ডেকেছো কেন ?

একটু চমকে উঠেই নিজেকে সংযত করে নিল রুকমিনী। বলল, আমি আর এসব দেখাশোনা করতে পারছি না। ভালোও লাগছে না। তোমাকে প্রধান করে দিয়ে অবসর নিতে চাই।

কন্ননের কথায় বিস্ময় ঝরে পড়ল—এর মধ্যেই অবসর ? তোমায় অবসর নিতে দিচ্ছে কে শুনি ?

এখন না হলেও, দু'দিন বাদে তো এ ভার নিতে হবে তোমায়।

তখনকার কথা তখন। উঠি। বলল, মীরাকে নিয়ে বেরুতে হবে আবার এখুনি।

কোথায় ?

এরুবাকসঙ্গীতচক্রমে মিটিং আছে আছে। 'তেলুগু-তামিল ভাই ভাই'।

মুহূর্তে রুকমিনীর পোশাকী ভদ্রতা খসে পড়ে গেল। সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল। চীৎকার ক'রে বলল, মীরা-মীরা! সদাসর্বদা মীরাকে দিয়ে যদি টো-টো ক'রে এখানে-ওখানে ঘোরো, লোকে কি ভাববে ? ও কুমারী—সে খেয়াল আছে ?

খেয়াল আছে। লোকের কথা কানে যায়।

সব জেনেও! এত নিচে নামলে কি করে?

নিচুতে নয়, উঁচুতেই উঠেছি। আমার জন্য ওর অপযশ জানি আমি। জানি বলেই স্ত্রীর মর্যাদা দোব ওকে। দেখি, কার ঘাড়ে কত শক্তি—আমাকে নিয়ে ওকে নিয়ে নিয়ে যা-তা বলুক!

রুকমিনী কোথায় আছে? কি শুনছে—কার মুখে শুনছে? এর চেয়ে মাথায় বাজ পড়ল না কেন এখুনি? কন্দনের স্ত্রীর মর্যাদা পাবে মীরা!

ক্ষেপে উঠল রুকমিনী।—মনে আছে ও তেলুগু মেয়ে?

আছে।

লজ্জা করবে না ওকে বিয়ে করতে? যারা আমাদের স্বজাতি নয়, আমাদের ঘেন্না করে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে—তাদের মেয়েকে! একেবারে গোল্লায় গেছ দেখছি। দেশেতে কিরকম আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করছে ওরা—সেটাও ভাবো না! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! ভালো চাও তো ও-প্রস্তাব ত্যাগ কর কন্দন।

মীরাকে আমি এখানে রাখবো না আর।

তুমি কি এটা ঠিকই ক'র ফেলেছো?

হ্যাঁ।

তাহলে বিদ্যামন্দিরের প্রধান হওয়ার আশা চিরদিনের জন্য ত্যাগ করতে হবে তোমাকে। ভেবে দ্যাখো।

প্রধান হ'তে চাই না আমি।

—রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে বেড়াতে গান গেয়ে গেয়ে—সেদিন মনে নেই! এই রুকমিনী ঘরে তুলে এনেছিল, মনে নেই! কার জন্য লোক চিনল কন্দনকে? মনে নেই? বেইমান-নিমকহারাম। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি ঘর থেকে।

চৌকাঠের ওপারে পা বাড়িয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল কন্দন, তোমার শরীর খারাপ, বিশ্রাম নাও।

চলে গেল কন্দন।

কান্নার বন্যা ছুটল রুকমিনীর দু'চোখে। আছড়ে পড়ল বিছানায়। একি বলে বসল? মাথাটা কেন এমন হয়ে গেল? কন্নন বড্ড অভিমানী। দিন-রাত গান নিয়ে থাকত বলে, বড় ভাই বলেছিল, দিনরাত গান আর গান! কান ঝালাপালা। বাবার অন্ন ধ্বংস করছে বসে বসে। লজ্জাও করে না গান গাইতে। অত বড় ছেলে, পয়সা রোজগারের কোন ফিকিরই নেই। বাবার যেমন আস্কারা দেয়া। আমি হ'লে, বাড়ি থেকে বার ক'রে দিতুম। কুঁড়ের মরণ। অমন ছেলে ভিক্ষে মেগে খাক গে! কত ধানে কত চাল বুঝুক।

শহরে এসে ভিক্ষে মেগেই খেয়েছ কন্নন। তবু ভায়ের কথায় সেই যে বেরিয়ে এসেছে—আর ফেরে নি। রুকমিনী যেতে বলেছে অনেকবার। যেতে চায় নি কন্নন।

সেই কন্ননকে বেরিয়ে যেতে বলল রুকমিনী ওর প্রকৃতি জেনেও। কি দুর্গ্রহ মাথায় ভর করল তার। কন্নন আসবে না আর, ফিরবে না আর। আটকাতে

গিয়ে নিজেই বার ক'রে দিল। নিজের বুদ্ধির দোষে বিয়েটা এগিয়ে দিল।

নিজের কপাল নিজে চাপড়াচ্ছে রুক্মিনী। দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছল, চিনু ঢুকল ঘরে। কন্ননকে অনুসরণ ক'রে এসেছিল। আড়াল থেকে শুনেছে সব। বলল, স্থির হও রুক্মিনী! অত কান্নাকাটি করলে চলবে না, অত অস্থির হলে চলবে না।

চিনুর ডাকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছে রুক্মিনী। কথা শুনে এতটুকু হয়ে গেছে। মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করেছে। রুক্মিনী কত দুর্বল—চিনু স্বচক্ষে দেখল, বুঝে ফেলল ভালো ক'রে।

চিনু বলল, বিয়ে ভাঙার প্রাণপণ চেষ্টা করবো আমি।

রুক্মিনীর দৃষ্টিতে সন্দেহ, অবিশ্বাস। চেয়ে চেয়ে দেখছে। এ কন্নন নয়। কন্ননের মতন না আছে জিদ, না আছে ব্যক্তিত্ব, না আছে গুণ। বহুদিন ধরে তার পেছু লেগে আছে। ওর মতলব জেনেও রুক্মিনী তাড়ায়নি ওকে। নিজের গাম্ভীর্য বজায় রেখে চললে, কারো কোন ক্ষমতা নেই একগাছা চুল স্পর্শ করার। একটা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নানা কাজের জন্য নানা লোককে দরকার। কত বাছবে? ঠগ বাছতে গাঁও উজাড় হয়ে যাবে।

এক তো কন্ননের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের জন্য অনুশোচনার আগুনে জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে ভেতর, তার ওপর ভয়ানক সমস্যা এসে হাজির হল। চিনু। এতদিনের আবরণ চিনুর চোখ থেকে সরে গেছে। তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে এগিয়ে আসতে না চেষ্টা করে।

চিনু বেরিয়ে যাওয়ার সময় আবার অভয় দিয়ে গেল রুক্মিনীকে।—একটা ব্যবস্থা ক'রে, তবে তোমার কাছে মুখ দেখাবো, নচেৎ নয়।

দুঃখের ওপরেও হেসে ফেলল রুক্মিনী। চিনু ঢোঁড়া, কেউটে নয়। বিষ নেই কুলোপানা চক্কর।

সঙ্গীত বিদ্যামন্দিরে ত্রিসীমানায় আসে নি কন্নন প্রায় দিন পনেরো হল। মীরাও আসে না। মীরা না আসুক—দুঃখ নেই রুক্মিনীর। কিন্তু কন্নন না এলে, বিদ্যামন্দির বন্ধ হয়ে যাবে যে শেষ পর্যন্ত। এখুনি তো ছাত্রছাত্রীরা বলতে শুরু করেছে—কন্নন গুরুদেব যদি এ বিদ্যামন্দির ছেড়ে দেয়, তারাও ছাড়বে। গুরুদেবের জন্যই এখানে আসা।

এমন অকূলপাথারে পড়েছে রুক্মিনী, পার হবে কি করে কে জানে? দিশেহারা পথহারা অবলম্বনহীন। এ বিপদের কাণ্ডারী কে তার? কেউ নেই, নিজেকেই বুক বেঁধে নিজের কাণ্ডারী হতে হবে।

হাতী যখন দ-য়ে পড়ে, চামচিকেরও পায়ে ধরে। চিনুকে বলল রুক্মিনী, মুখে তো ব্যবস্থা করছি বললে, কাজে হল কই? কথায় হাম-বড় খালি।

আমতা আমতা করে চিনু বললে, হাম-বড়-ভাব অপরকে দেখালেও তোমার কাছে দেখাই না। তুমি কষ্ট পাবে বলে বলিনি।

কি এমন ব্যাপার যে কষ্ট পাব? মীরার মৃত্যুর খবর কি?

না তার চেয়েও বাড়া।

যা বলার স্পষ্ট করে বল! অত ভণিতা ভূমিকা ভালো লাগছে না আমার।
তবে শোন! আমাকে কিন্তু কোন দোষ দিও না।
দ্যাখো চিনু, তোমার এই রকমের জন্য পিত্তি জ্বলে যায় আমার। যা
', চটপট বলে ফেল।
কন্নন আসবে না। মীরাকে বিয়ে করে ঘর বেঁধেছে সে।
বজ্রপাত হল যেন ঘরে। নিস্পন্দের মতন রুক্মিনী দাঁড়িয়ে রইল খানিক,
রপর সচেতন হয়ে চিৎকার করে বলল, তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে
করে এ কাজ করেছো, নইলে কন্নন বিয়ে করত না।
মনে মনে খুশী চিনু। চিনুর কাঁটা কন্নন সরে গেছে। চিনুকে এখন
কে!
চিনু খবর পেয়েছিল, মীরা-কন্নন তামিলনাদ ছেড়ে চলে গেছে। গেছে
রার কাকার কাছে।
চিনু যায়নি যে তা নয়, গেছে। মীরাকে বলেছে বুঝে-সুঝে পা বাড়াও,
র্দিকে তুষের আগুন জ্বলছে ধিকি ধিকি। আলাদা অন্ধ্রপ্রদেশের দাবিতে
রাট আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সকলে। ঘরে-বাইরে। এমন অবস্থাতে
পদকে বরণ করে ঘরে নিয়ে আসতে চায় নাকি কেউ? তুমি তো আর
হাম্মুক নও যে, কন্ননের ফাঁদে পা দেবে। যাই হোক, সাবধান হয়ে
কো। তোমাদের দু'জনের জীবন নিয়ে টানাটানি না হয় শেষে। সেই ভয়।
মীরা বলেছে, এখন আর পেছনো যায় না। আমি পেছতে চাইলেও, কন্নন
ব না কিছুতেই। আমি বলেছিলুম, আমার জন্য শেষে একটা মহাপ্রাণ—
মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলেছে কন্নন, মিথ্যে ধারণা তোমার। আমরা
'টো দলকে এক করতে চেষ্টা করছি। তোমাতে আমাতে বিয়ে হ'লে—সেইটাই
াণ হয়ে যাবে আরো সকলের কাছে। আমাদের ওপর আস্থা-বিশ্বাস আসবে
র।
এই হ'ল কন্ননের বক্তব্য। হেসে বলেছে মীরা।
চিনুর দিক থেকে নিরাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়নি। যা আশা করেছিল
তে চলেছে তাই। বাজিয়ে পরখ ক'রে নিল মীরাকে। বিয়েটা ঠুনকো কথার
ার দাঁড়িয়ে নেই। পাকা ভিতের গাঁথনি। বিয়ে হয়ে গেলে, বরাবরের মতন
'নেরই বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ নিষেধ। রুক্মিনী পাষাণী হয়ে উঠবে ওদের

যা চেয়েছিল চিনু, তাই হয়েছে।
মীরা-কন্ননের বিয়ে হয়ে গেছে। সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর করছে ওরা। বিদ্যা-
ন্দরের ধারে-কাছে আসে না কেউ।
চিনুকে ডেকে বলল রুক্মিনী, হাতে গড়া জিনিসটা এইভাবে চোখের সামনে
হয়ে যাবে! কি করে রক্ষে হয়—একটু চিন্তাটিন্তা কর। তুমিই আমার
ভরসা।
চিনু খুশী। রুক্মিনীর মনে ঠাঁই হয়েছে তার। দাঁড়িয়ে রইল আদেশের

অপেক্ষায়।

দ্যাখো, কন্ননটাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে একবারটির জন্য নিয়ে আসতে তুমি!

মাথা চুলকে বলল চিনু, কারণ জানতে পারি?

নিশ্চয়-নিশ্চয়। তুমি আমার আপনজন। তুমি না জিজ্ঞেস কারণ তোমায় শোনাতুমই। লোকগীতির কতকগুলো পুরনো রয়েছে ওর কাছে। বাছাধন সেই গরবেই গরবী। নেচেকুঁদে বেড়াচ্ছে এত ওইটার জন্যই। নাম কিনছে, যশ কুড়োচ্ছে। আমার বিদ্যামন্দিরের সম্পদ তোমার সম্পদ। আদায় করতে হবে। পাণ্ডুলিপি পে আমি গান শেখানো শুরু করবো। দেখবে, হুমড়ি খেয়ে পড়বে ছাত্রছাত্রী বিদ্যামন্দিরে জায়গা দিতে পারবে না তখন। এ পান্ডুলিপি আমার পাওনা। দেশে দেশে ঘুরে সংগ্রহ করেছি। কত কষ্ট ভো[illegible]রেছি। ভিজেছি, রোদে পুড়েছি।

ও কি দেবে?

তা আবার কেউ কখনো নিজে হ'তে দেয় নাকি? তো[illegible]ায় ফন্দি হবে—ঘুণাক্ষরে জানতে পারলে—দেশ ছেড়ে হাওয়া হয়ে যাবে সঙ্গে হাওয়া হোক দুঃখ নেই। আমাদের উদ্দেশ্য জিনিসটা হাতিয়ে নেয়া। না?

কিন্তু ও কি তোমার কাছে আসতে চাইবে?

বেশ, আমার নাম ক'রো না। 'তেলুগু-তামিল ভাই ভাই'য়ের সভায় গাইতে হবে বলে নিয়ে আসবে। এখানে নয়, নন্দন গাঁয়ে নিয়ে যাবে। পো জায়গা, লোকবসতি নেই বললেই চলে, অনেক পোড়ো কুঁড়েঘর পড়ে রয়ে নিয়ে গিয়ে আটকাবে একটাতে। যতক্ষণ না দেয় পাণ্ডুলিপি, ছাড়বে চারজন জোয়ান ব্যবস্থা ক'রে দোব পাহারার জন্য। পালাতে যেন না কোনদিক দিয়ে।

এ মতলবটা মনে লেগেছে চিনুর। মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। ক নিশ্চয় পারবো।

ঘন ঘন মীরাদের বাড়ি আসতে শুরু করেছে চিনু। কন্ননের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে থেকে থেকে। হয়তো পূর্বজন্মে সহোদর ভাই ছিল দু'জ অতদিন একসঙ্গে থেকেছেও তো বিদ্যামন্দিরে। একজনের সুখে অন্যজন হয়েছে, একজনের দুঃখে অন্যজন দুঃখী হয়েছে। এ সম্পর্ক কি ম'লে ছাড়া য

কথা শুনে, মীরার চোখের কোণ চিকচিক ক'রে উঠেছে। বলেছে, চিনু তোমাকে দেখলে, তুমি এলে, মনে হয়—বিদ্যামন্দিরেই আছি আমি। রুকি আম্মা দেবী। দেয়ালে টাঙানো রুক্মিনীর ছবির দিকে তাকিয়ে মাথা নে মীরা। প্রণাম জানায় মনে মনে।

বলে, ওখানে আমার স্বর্গরাজ্য ছিল।

ছবির তলায় পেতলের তিন পায়া এমটা ধূপদানি বসানো রয়েছে
-ছটা ধূপ গোঁজা—চন্দন ধূপ।

চোখ বুজে বসে থাকে মীরা কিছুক্ষণ। বুক ভরে সুগন্ধ টেনে নেয়। গুন
ক'রে সুর ভাঁজে। কন্ননও প্রণাম জানায় রুক্মিনীর ছবির উদ্দেশ্যে।
জোড় ক'রে বলে, চিনু, রুক্মিনী না থাকলে এ কন্ননকে পেতে না ভাই।
মার সব কিছু ওর দয়ায়।

যাবে একদিন? সাহসে ভর ক'রে বলে চিনু।

চনমন ক'রে তাকায় কন্নন। ছলছল করে ওঠে দু'চোখ। বলে, এখন না।

কথার মোড় ঘুরিয়ে নেয় চিনু।—কিন্তু তোমাকে একদিন এক জায়গায়
তই হবে। আমি কথা দিয়েছি তোমাকে না জিজ্ঞেস ক'রে। তার আগে
আমার সঙ্গে গিয়ে জায়গাটা দেখেশুনে এসো না। উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা-
া কয়ে আসবে। তোমার ভালো লাগবে খুব। আমি জানি, শুনলে, তুমি
জ হবেই।

'তেলুগু-তামিল ভাই ভাই'য়ের ওরা ভক্ত খুব। ওরা সভা করবে একটা।

কোথায়?

কোথায়—এখন বলবো না। নিয়ে যাচ্ছি তো আমি।

কন্নন কথা দিল, যাবে। সামনের সপ্তায় শনিবার বিকেলে।

চিনুর ফাঁদে পা দিয়ে সরলপ্রাণ কন্নন বন্দী হ'ল। নন্দনগাঁয়ের পোড়ো
।।

পাণ্ডুলিপির দাবি শুনে হতভম্ব, হতবাকও কিছুক্ষণ!

একটু আগের মিষ্টিমধুর মানুষ চিনুর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে দেরী লাগল না।
শ-বিকৃত গলা। বলল, অমন বোকা সাজা লোক ঢের দেখেছি। ন্যাকামি
ব না আমার সঙ্গে। তাতে সহজে আমার হাত থেকে ছাড়া পাবে না।
ডুলিপি না দিলে, তোমার মুক্তি নেই। কোথায় আছে বল!

চারজন ষণ্ডামার্কা জোয়ানদের দেখিয়ে বলল, পালানোর চেষ্টা করো না।
রবে না। কোথায় আছে—চিঠি লিখে দাও!

আমার ঘরদোর বাক্সপেঁটরা তল্লাশ করে দেখে আসতে পারো যে, কোন
নর পাণ্ডুলিপি বিদ্যামন্দিরের আলমারিতে সাজানো রয়েছে। তোমাদের
লের সামনে দিয়েই মীরা আমি খালি হাতে বেরিয়ে এসেছি।

ঠিক আছে পচে পচে মর এখানে। রুক্মিনীর হুকুম—এক হাতে পাণ্ডুলিপি,
হাতে তোমার মুক্তি। ভেবে দ্যাখো।

ঘরে তালাবন্ধ ক'রে চলে গেছে চিনু।

জানলার কাঠের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দেখছে কন্নন। আকাশ নয়। চিনুকে।
লাগাছের পাশ দিয়ে মানুষডোবা ঘাসের মধ্যে ঢুকে পড়ল চিনু। দেখতে
ওয়া গেল না আর।

মীরার কাঁদো কাঁদো মুখ ভেসে উঠছে কন্ননের চোখের সামনে। সন্ধ্যের

আগে ফিরে আসবো বলে এসেছে কন্নন। সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত নেমেছে ফিরতে পারল না। কবে ফিরবে—কখন ফিরবে—তাও জানে না।

মীরা একদণ্ড চোখের আড়াল করতে চাইত না তাকে। যত দেরী হবে, ত উতলা হবে। কেঁদেকেটে সারা হয়ে যাবে। কেউ বোঝানোর নেই ওকে, কে দেখার নেই ওকে।

বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার!

কাঁচছেলের কান্নার মতন শকুনির বাচ্চার কান্না শুনতে পাচ্ছে কন্নন।

ঘুণধরা কাঠের রেলিংয়ে হাত দিয়ে দেখল, অসুবিধে হবে না ভাঙতে! এ রাতের অন্ধকারে গাঢাকা দিয়ে পালাতে হবে তাকে। গুণ্ডারা দরজার সামনে বসে মদ গিলছে। উগ্র গন্ধ পাচ্ছে। কে কতখানি খেয়েছে, আরো কতখানি কার প্রাপ্য এখনো, হিসেবনিকেশ চলছে এই নিয়ে। নেশা ধরেছে ওদের। কথা জড়ানো-জড়ানো। আর একটু দেরী করলে, মাটি নেবে ওরা। তখন কন্ননের মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

ঘরের ভেতর পায়চারি করছে কন্নন। সুযোগের অপেক্ষায়। কিন্তু অপেক্ষার কি শেষ নেই? ওরা যে এখনো ফিসফিস করে কথা কইছে নিজেদের মধ্যে। ঘরের চারপাশে টহল দিয়ে যাচ্ছে পালা ক'রে এক একজন। ওদের চোখে ঘুম আসছে না। ঘুমিয়ে পড়ছে না কেউ!

ভেতরে থাকতে পারছে না আর কন্নন। এখান থেকেই মীরা কি করছে দেখতে পাচ্ছে। মীরা আছাড়িপাছাড়ি করছে বিছানায়। ছুটোছুটি করছে চতুর্দিকে। খোঁজাখুঁজির অন্ত নেই। দরজায়-দরজায় বিমুখ হয়ে ফিরছে কেবল। তিরুমাঙ্গল্যম্ হারানোর মতন অবস্থা ওর। মনে পড়ে কন্ননের একদিন মীরা তিরুমাঙ্গল্যম্ হারিয়ে ফেলে কি কান্নাই না কেঁদেছিল। বিয়ের মঙ্গলসূত্র এই তিরুমাঙ্গল্যম্। ওর কান্না দেখে নতুন একটা পরিয়ে দিয়ে কন্নন বলেছিল, আমি তো আমি, আমার আত্মাও বাঁধা থাকবে তোমার কাছে চিরদিন। হাত ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। সমস্ত দেহটা থরথর করে কাঁপছে ওর। মীরার চোখের জল হাতে পড়ল না? না, জানলায় একটা জোয়ানের বীভৎস মুখ। থুতু ছুঁড়ে ফেলছে গায়ে। একি রকম ভদ্রতা! জানলার দিকে এগোতে যাবে, লাঠি গলিয়ে কন্ননকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল জোয়ান।

দিন সাতেক হয়ে গেল।

কন্ননের কোন পাত্তা মিলল না। রুক্মিনীর কাছে ধন্না দিয়ে দিয়ে হয়রান হয়ে গেছে মীরা। রুক্মিনীর সতেজ গলায় পরিষ্কার উত্তর—আমি পছন্দ করি না রোজ এসে ঘ্যানর ঘ্যানর কর তুমি। তোমরা চলে যাওয়ার পর—সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন। কন্ননের খবরা খবর আমি জানবো কেমন করে?

চিনুকে কেঁদে বলেছে মীরা, তুমি তো নিয়ে গেলে ভাই!

নিয়ে গিয়েছি বলে কি চোরের দায়ে ধরা পড়েছি? চোটপাট জবাব চিনুর

খানিকটা রাস্তা এসেই তো বাড়ি ফিরে গেল। মীরাকে সঙ্গে নিয়ে তবে যাবে। আমায় বিরক্ত করতে এসেছো কেন? যেখানে যেখানে যায়—আর পাঁচ জায়গায় গিয়ে খোঁজ নাও।

উপায়ান্তর না দেখে পুলিশের দরবারে গেছে মীরা। মীরার সব কথা শুনে চিনুকে পুলিশে ধরেছে। ধরেছে মীরার কথার ওপর নির্ভর করে। ওই বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গেছল কন্ননকে।

হাজতবন্দী হয়ে রয়েছে চিনু। ওখানেও ওর একই কথা।—কিচ্ছু জানে না—কোথায়। রাস্তা থেকে বাড়ি ফিরে গেছল।

কোথায় গেছে জানে রুকমিনী, কিন্তু না জানার ভান করে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেবল। কন্নন কোথায় গেল, কন্নন কোথায় গেল। চিনুকে দিয়ে নিয়ে এসে গোপনে আটকে রাখবে ভেবেছিল। সেখানে নিজে গিয়ে ওর মনটাকে ঘোরাবে। মীরাকে চোখের বাইরে রেখে, কন্ননের মনেরও বাইরে রেখে দেবে।

সব আশার জলাঞ্জলি হয়ে গেছে রুকমিনীর। রুকমিনী ফিরে পেল না, পাবে না। পাণ্ডুলিপি চুরির মিথ্যে কলঙ্ক রটিয়েছে। স্রেফ কন্ননকে কাছে পাওয়ার জন্য। রুকমিনীর জাল ছিন্নভিন্ন ক'রে কন্নন পালিয়ে গেল। কেঁদে বুক ভাসিয়েছে রুকমিনী।

চিনু আর চিনুর দল হাজত থেকে ছাড়া পেল দিনকতক পর। জামিনে খালাস নয়। বেকসুর খালাস।

মীরা নিজে গিয়ে বলেছে থানায়, কন্ননের হদিশ পেয়েছি আমি। মিছিমিছি ভদ্রলোকের ছেলেদের কষ্ট দেয়া হল। আমি খুব দুঃখিত। ওদের দুর্ভোগ যা হ'ল, ক্ষমা চেয়েও পূরণ করা যাবে না।

মুক্তি পাওয়ার পর চিনু অনেক খুঁজেছে মীরাকে। পায়নি। কোন্ নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়িয়েছে মীরা কে জানে!

খুঁজে খুঁজে হতাশ হয়ে গেছে, তবু একটা নেশা প্রেরণা যুগিয়ে যায়। মীরাকে একটি বারের জন্য দেখার।

দিনের পর দিন, বছরের পর বছর খুঁজে চলছে চিনু মীরাকে। মৃত্যু না হওয়া অবধি এ খোঁজার তার শেষ হবে না বুঝি। আপসোস-অনুতাপ পাগল ক'রে তোলে তাকে সময় সময়। তার জন্য, তাদের জন্য মীরা দেশছাড়া হয়ে গেল!

মীরার কাকার কাছে দৌড়ে গেছে। ওখানে এসেছে কিনা। বৃথাই যাওয়া। আসেনি।

দীর্ঘ বারো বছর কেটে গেছে।

আশার প্রদীপ ধিকি ধিকি জ্বলে নিভুনিভু হয়ে এসেছিল। হঠাৎ জোরে জ্বলে উঠল। প্রদীপ নেভার সময়ের মতন নয়। প্রদীপ জ্বলে থাকার মতন।

রঙ্গন বন্ধু। কলকাতায় থাকে। টেলিগ্রাম ক'রে জানিয়েছে। তামিলনাদ

সঙ্গীত সম্মেলনে মীরা গান গাইতে আসছে।

এসেছে চিন্ন।

এমন ভিড় জীবনে দেখেনি। লোক থিক-থিক করছে। রাস্তায়, ফুটপাথে, মণ্ডপে। মণ্ডপের ওপর হাসিমুখে মীরা বসে, পাশে কন্নন। একা দেখছে না। দু'একজন চেনে যারা, তারাও দেখছে কন্ননকে।

কিন্তু এ কেমন ক'রে হয়! চিন্ন সব জানে। কন্নন যেখানে গেছে, সেখান থেকে আর কোনদিন ফিরতে পারে না। এ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে সে।

যে রাতে নন্দন গাঁয়ের পোড়ো ঘরে তালাবন্ধ ক'রে রেখে এলো চিন্ন, সেই রাতে গুণ্ডারা ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে, জানলা ভেঙে পালাতে চেষ্টা করেছিল কন্নন। ধরা পড়ে যায়। গুণ্ডারা সজাগ-সতর্ক ছিল। ওরা মদ খায়, কিন্তু মদ ওদের খেতে পারে না। নেশা আসে না।

ধরাপড়ার পরও অনেক ধস্তাধস্তি করেছে পালানোর জন্য। চারজনের সঙ্গে একা পারবে কেন? যত চেষ্টা করেছে, তত পিটিয়েছে ওরা। আটকাতে বলা হয়েছিল বলে থেঁতলানো দেহটাকে আটকে রেখেছিল ওরা। কন্ননের প্রাণকে আটকে রাখতে পারেনি।

মীরা জানতে পেরেছিল কন্নন বেঁচে নেই। একথা শুনেছে চিন্ন মীরার কাকার মুখে। কন্নন নেই জেনেও গলা থেকে 'তিরুমাঙ্গল্যম্' খোলেনি মীরা। কাকাকে বলেছিল, ঠাট্টা ক'রে বললেও—আমার কাছে সেটা সত্যি। বলেছিল, তিরুমাঙ্গল্যমে—আমি কেন—আমার আত্মাও বাঁধা হয়ে আছে তোমার কাছে।

বৃষ্টি শুরু হল।

চিন্নর দু'চোখে জল। গান শেষ হয়েছে। হাততালির শব্দে মুখর হয়ে উঠেছে জায়গাটা। মঞ্চ থেকে নামার পালা মীরার। নামছে পাশে পাশে কন্নন।

অনেক আশা ছিল মীরার কাছে ক্ষমা চাইবে দেখা হ'লে। বলবে, এমন হোক—কন্নন চলে যাক—মনে-প্রাণে চায়নি সে। কেন মুক্তি দিতে এলো মীরা তাকে? কন্নন চলে যাওয়ার জন্য দায়ী চিন্নই।

ক্ষমা চাওয়া হ'ল না চিন্নর। ক্ষমারও অযোধ্য সে। ভিড় ঠেলে এগোতে পারল না একপা-ও। দেয়ালে চেপ্টে গেছে।

গাড়িতে উঠে বসেছে মীরা। ভিড় কেটে কেটে চলছে গাড়ি।

নিঅনলাইটের আলো পড়েছে মীরার গলায়। তিরুমাঙ্গল্যমের সোনার পাতে জ্বলজ্বল করছে কন্ননের মুখখানা। যেন সূর্যের ছটা।

চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে চিন্নর।

সে আসে

অমৃতাবাঈয়ের দু'চোখের তারা থেকে বিকেলের রোদের টুকরো সরে যাচ্ছে। সরে গেল। জাফরিকাটা জানলার ধারে বসে আমরা। ওঁর মুখখানা রহস্য-লোকের এক অজানা মুখ হ'য়ে উঠল যেন। মহারাষ্ট্রের এই শান্তাপুর গাঁও, গাঁয়ের আকাশ-বাতাস-মাটি—সবকিছু একটা অদৃশ্য রহস্যজালে বাঁধা হ'য়ে এই মুহূর্তে এই ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছে বুঝি।

অমৃতাবাঈয়ের দু'ঠোঁট কেঁপে উঠল এতক্ষণ বাদে। মুখ খুলবেন হয়ত। খুললেন। কথা বলতে শুরু করেছেন।……

ভেতরে প্রবেশ করতেই চমকে উঠল অমৃতাবাঈ। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শিরশির ঠাণ্ডা স্রোত তরতর করে নেমে গেল নিচের দিকে।

তাজা রক্ত মেঝেয় ছড়ানো। জমাট বাঁধছে কোন কোন জায়গায়। কালচে হয়ে উঠেছে। তলোয়ারে রক্ত মাখানো। ঘন লাল। অমৃতাবাঈ হাঁপিয়ে উঠেছে। তার পক্ষে ভেতরে থাকা অসম্ভব। চোখে দেখতে পারছেনা, সহ্য করতে পারছে না। বেরিয়ে না গেলে বাঁচবেনা বুঝি আর সে। মাথাটা কিরকম করছে।

অমৃতা শুনতে পাচ্ছে মলের ঝমঝম আওয়াজ। কে যেন আসছে এই দিকেই। মুখ বাড়াল। হ্যাঁ, ওড়নায় মুখ ঢাকা সুন্দরী তরুণী। আপাদমস্তক সোনা-জহরতের গয়নায় মোড়া।

দালানের দেওয়ালে দেওয়ালে প্রদীপের ঝাড় ঝোলানো। প্রদীপের আলোয় হীরেপান্না ঝলমল করে উঠছে। রামধনুর আলো ঠিকরোচ্ছে দেওয়ালে, জাফরি আঁটা জানালার ফাঁকে।

কে এই অভিসারিকা এমন সময়, এমন পরিবেশে? কে—যশোমতীবাঈ? সর্বাণী, না পার্বতী?

যশোমতী নয়, সর্বাণী নয়—পার্বতী।

এত আকাঙ্ক্ষাও জমা ছিল ওর মনে! সাজের বাহারে চলনে মুখের মৃদুহাসিতে চোখের বিলোল কটাক্ষে একটা উন্মত্ত আনন্দ নেচে নেচে উঠছে। সৌন্দর্য ফেটে পড়লেও কি ভয়ানক ও। দিনের মোহিনী রাতের বাঘিনী।

পার্বতীর পেছু পেছু মাধব রাও-ও আসছে। তাই এত হাসিখুশি। লজ্জা-সরমের বালাই যদি এতটুকু থাকে! পান চিবিয়ে চিবিয়ে ঠোঁটের কি

মূর্তিই করেছে—রক্তে মাখামাখি যেন। স্বামী গেছে পরোয়া নেই, ঠমক-ঠমক কত না।

চোখের সামনে মালী নৃশংসভাবে মরল—তবু চেতনা হ'লনা সর্বনাশীর। যার লোক শেষ করল ওর স্বামীকে—তার সঙ্গেই হাত মেলাল। হলায়-গলায় একেবারে। নিজের ভোগবিলাস মেটানোর জন্য মেতে উঠল। মাধবরাওয়ের সঙ্গে কি ঢলাঢলি—কে না জানে!

নির্লজ্জের দিকে ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করে না কারো। সকলের চোখের আপদ, গাঁয়ের কলঙ্ক। একটা দগদগে দুষ্টক্ষত সমাজের বুকে বেড়ে উঠেছে দিনকে দিন। কারো কিছু করার নেই, কারো কিছুর বলার নেই। তাজ্জব ব্যাপার যাকে বলে।

গাঁয়ের মাতব্বররা বলে, পাঁক না ঘাঁটাই ভালো। ঢিল ছুঁড়লেও তো সকলের গায়ে ছিটকোবে! ওকে দেখলে, শতহাত দূরে না পালিয়ে কি কারো অন্য কোন উপায় আছে? আচমকা চোখাচোখি হয়ে গেলেই বিপদের একশেষ।

পার্বতী নাচের ভঙ্গীতে হাসতে হাসতে এসে একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়াবে। চিৎকার করে সবাইকে শুনিয়ে বলবে, মনে ধরেছে আমায় তাহলে! চোখের ইশারায় বুঝে নিয়েছি। গলা ছেড়ে গান ধরে দেয়—যে আমারে ভালবাসে, নয়নে তারে যায় গো চেনা…।

রাস্তাঘাটে লোক জড়ো করে কি হাসি-মস্করা! কুলনাশিনীর নিজেকে জাহির করে পসার বাড়ানোর এও এক ফিকির। জওয়ান-মদ্দদের মাথা চিবিয়ে খাবার কল। ছেলের দলের জন্য আবার বলার কিছু তো নেই।

সরে যা বললে—বাচ্চা ছেলের মতন ককিয়ে কেঁদে উঠবে পার্বতী। জওয়ানদের সাক্ষী করে, বলবে, দেখলে তো তোমরা? কনুইয়ের গুঁতো মেরে কি রকম সরিয়ে দিলে আমায়। তোমরাই বল, আমি করেছিটা কি!

জওয়ানদের দরদ উতলে ওঠে। খবরদার দাদু, ফের যদি ওর গায়ে হাত পড়ে—ধরে মাথা থাকবে না বলেদিলুম। এতবড় অন্যায় আমরা বরদাস্ত করবে না—করবো না।

চোখ পাকিয়ে মাতব্বরকে বলে পার্বতী, এরা আমার বেঁচে থাকুক শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে। এদের ভালবাসা যা পেয়েছি, এতে আমি ধন্য। তোমাদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে কি এসে যায় আমার! চিনতে আর কাউকে বাকি নেই আমার। আড়ালে রাবণ সীতাহরণের জন্য ব্যস্ত। লোকের সামনেই যত মানসম্ভ্রম—ধর্মাবতার সব।

ছেলের দলের হো-হো-শব্দের হাসি আর হাততালিতে বাতাস মুখর হ'য়ে ওঠে। ওদের হাসির সুরে মিলিয়ে মিহি গলায় হি-হি করে হেসে ওঠে পার্বতী। পায়ের দুম দুম আওয়াজে মাটি কেঁপে ওঠে থরথর করে। সারা শরীরে উত্তাল তরঙ্গ তুলে ঠমকে ঠমকে চলতে থাকে পার্বতী।

এই জাঁহাবাজ ছলাকলায় পারদর্শিনী পার্বতীর ত্রিসীমানায় জেনেশুনে কোন মানুষ কি আসতে চায় সহজে? যার মরণদশা ঘনিয়ে এসেছে, সে ছাড়া

কেউ আসতে চাইবে না পারতপক্ষে।

অতএব পার্বতীর স্বাধীনতায়, স্বেচ্ছাচারিতায় কেউ হস্তক্ষেপ করে না কোন রকমে। করতে চায়ও না।

পুরুষের চোখ না হয় ওকে দেখে মুগ্ধ, ওর রঙ-ঢঙে স্তব্ধ—কিন্তু মেয়েরা নীরব কেন? তারাও তো ওর ব্যাপারে বাদপ্রতিবাদ করে না কোন সময় কোনদিন। কেন—কেন? তাদের কিসের ভয়—কিসের দুর্বলতা!

দিদিমা ফুলের মালা গাঁথতে গাঁথতে বলেছে, পারু, আর যে সইতে পারি না। মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে আমার। মৃত্যু হলে বাঁচি। যমও কি ভুলে গেছে আমায়! দু'চোখে দেখতে পায় না। মেয়ে গেল ছেলে গেল, অমন রূপবান জামাইটাও ধড়ফড় করে মরে গেল। তিনমাথা এক হয়ে বেঁচে রইলুম আমি। বিধাতার বিচার বলিহারি! নোংরা কথা শুনে শুনে দু'কান পচে গেল! তোর বিবেক উদয় হবার কোন লক্ষণই তো দেখছি না। ঘর-জ্বালানি, পর-ভোলানি হয়ে থাকার চেয়ে মরণ কি তোর হয় না রে!

হেসে কুটিকুটি হয় পার্বতী।

শাড়ীর আঁচলে মুখখানা ভালো করে মুছে নিয়ে ঘরে ছুটে যায় দাওয়া থেকে। ছোট আয়নাটা বার করে নিয়ে এসে দালানে পা ছড়িয়ে বসে। আয়নায় মুখ দেখে চোখ ঘুরিয়ে। মুচকে হাসে একটু। সাদা ধবধবে দাঁত দেখে চোখ বড় বড় করে। দিদিমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, আহা, বিধি রূপ দিয়েছে—পটলচেরা চোখ দিয়েছে, ডালিমদানার মত দাঁত দিয়েছে।

আড়চোখে দিদিমার দিকে দেখে নেয় একবার—মুখের অবস্থাটা কেমন। আবার বলতে শুরু করে—আর কি দিয়েছো আমায় বিধি তুমি? তোমার গুণে নুন দিতে নেই। কোনটা বলি, কোনটা না বলি। সোনার বরণ কন্যার মেঘবরণ চুল। আচ্ছা বিধি, তুমিই বল—মুখ ফুটে সত্যি কথাটা বল না দিদুকে। মালীর ঘরে যারা ফুলের বেসাতি করে বেড়ায়—এত রূপ কি মানায় সে ঘরে! তুমি ভুল করছো—মস্ত বড় ভুল। এ মেয়ের মালী আদমি হওয়া উচিত ছিল কি?

মোটেই নয়! তাকে খতম করেছো—ভালই করছো, আমার কোন দুঃখ নেই।

দিদিমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, আঃ মর পোড়ারমুখী—উঠে যা দিকিনি আমার সুমুখ থেকে। সোয়ামী গেল—ওর দুঃখ নেই। গলা ফাটিয়ে আবার শোনানো হচ্ছে। দূর হ', দূর হ'—পাপ! জন্মের সময় গলা টিপে মেরে ফেলল না কেন তোর মা?

মিটিমিটি হাসে পার্বতী। বলে তোমার অত গাত্রদাহ কেন? আমার মতন রূপসী নও বলে বুঝি?

বুড়ি দিদিমা রাগে কাঁপতে থাকে। মরণ আর কি! অমন রূপের মুখে আগুন। দুষ্টু মেয়ের রূপের কদর দুষ্টু ছেলের কাছে! আমার তাতে কি লা!

—দিদু তোমার আছে। রানীর দিদু হবে তুমি। সোনার সিংহাসনে বসাবো তোমায় আমি নিশ্চয়। বিধি রূপ দিয়েছে যখন, সদ্ব্যবহার করবেন

তখন, তা নইলে নরকে যেতে হবে যে আমায়।

— নরকে যেতে কি এখনও বাকি আছে তোর অভাগী? ফোঁপানো কান্না দিদিমার গলায়।

উঠে এসে জড়িয়ে ধরে পার্বতী। বুকটা ফেটে যায় ওর। পিঠে চিবুক ঘষতে ঘষতে বলে, দিদু রোজ গীতাপাঠ শুনতে যাও—কি হচ্ছে তোমার! কথক-ঠাকুর তো বলে, আমরা যা কিছু করছি—হৃষিকেশ আমাদের ভেতর দিয়ে সমস্ত করাচ্ছে। আমরা তো নিমিত্ত মাত্র। আমি অন্যায় করি, ন্যায় করি, আমার কি কোন হাত আছে দিদু? তবে তুমি আমাকে দুষছো কেন? খালি চিন্তা করবে—তোমার চোখে যদি আমি কোন পাপও করি—আমি নিরুপায়, কেশব করাচ্ছে—নিজেকে রুখতে আমি পারবো কেমন করে?

দিদিমার মুখে কোন কথা সরে না। শুধু নাতনির মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। লোল চামড়ার জালিকাটা মুখে একটা আশ্বস্তের আভা, একটা নির্ভয়ের আলো বোধহয় জ্বলে ওঠে ক্ষণেকের জন্য—হয়তো বা কথক-ঠাকুরের কথাই ঠিক। পার্বতী যা বুঝেছে ঠিক। কিন্তু যত ঠিকই হোক—মন মানে কই! তারা যে আগের দিনের লোক। পার্বতী মুখে যত বড় বড় কথাই আওড়াক না কেন—ভেতরের আগুন কি ওর নিভেছে? একটুকু শান্তি পেয়েছে কি ও সত্যি সত্যি?

অন্যমনস্ক হবার জন্য, টুকরি থেকে মুঠো মুঠো বেলফুল তুলে ছুঁচ বেঁধাতে লাগল জোরে জোরে। পার্বতীও দালানের বাঁশের খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে, হাত বাড়িয়ে আর একটা ফুলের টুকরি টেনে নিল কাছে। মালা গাঁথছে।

মালা গাঁথছে দিদিমাও। দু'জনের মালা গাঁথায় আকাশ পাতাল তফাৎ। দিদিমার বাসনা—তার হাতের মালা দেবতার গলায় চড়বে, নাতনির মাধব রাওয়ের গলায় ওঠার জন্য।

একমনে মালা গেঁথে চলেছে পার্বতী। গোলাপের পর বেলের থোকা—আবার গোলাপ আবার বেল। অসাবধানে দু' একটা গোলাপ কাঁটার আঁচড়ে নরম আঙুলে রক্তের রেখা এঁকে গেল, খেয়াল নেই কোন।

দিদিমা একমনে গাঁথছে না, মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে পড়ছে।

মেয়েটা এমন বেপরোয়া ছিল না। ঠিক তাদের ঘরেরই মেয়ে ছিল ও। যৌবন উঁকি মারতে শুরু করেছে যখন—গরীবের ঘরে যেটা অস্বাভাবিক—পাথর কঠিন দেহে নয়—ওর ননীর পেলবে গড়া দেহে, তখন কত সংযম। সাক্ষাৎ তপস্বিনী। কিশোরীর চঞ্চল মন ধীরস্থির হয়ে গেছে। ভীষণ গম্ভীর মুখ, শান্ত চাউনি।

দেশ-পরদেশের সাধুসন্ন্যাসীরা বেড়াতে এসে ওকে দেখে জোড় হাত করে নমস্কার করেছে দূর থেকে। দিদিমাকে বলেছে, মেয়েটির নামের সঙ্গে চেহারা প্রকৃতির মিল খুব। শিবের পার্বতী বলে ভ্রম হয়। দেখো, এ মেয়ে বংশ উজ্জ্বল করে তুলবে।

ছাইপাঁশ—সাধুসন্তের দৃষ্টিতেও ভুল দেখার নোনা ধরা রোগ ধরেছে। পরে

যা মেয়ের মূর্তি দেখা গেল—হৃৎকম্প।

বিয়ের আগে অবধি—আগে কেন—পরেও, যতদিন মালী বেঁচে থেকেছে ততদিন জীবন্ত পার্বতীই ও ছিল। কোন যুবক ওর মুখের সামনে মুখ তুলে কথা কইতে সাহস করেনি, কাছে আসা তো বহুদূরের কথা।

আর একথাও মিছে নয়—মালী অন্ত প্রাণ ছিল ওর সত্যি সত্যি। এমন বিলাসী তো ছিল না তখন। এয়োতির চিহ্ন কালো পুঁতির মালায় রুপোর চাকতিটার জায়গায় সোনার চাকতি এনে লাগিয়ে দিতেই ক্ষেপে উঠেছে পার্বতী।

শান্ত মেয়ে সাংঘাতিক অশান্ত হয়ে উঠেছে। রণরঙ্গিনী। বলেছে, ফুলের মালা বেচে ক'পয়সা হয়—আমার তো আর জানতে বাকি নেই। পয়সা পেলে কোথায়? নিশ্চয় পেট মেরে জমিয়েছ। দু'চার পয়সার চানা-ছোলা যা খাও—খাওনা আর। এইসব করে গলার বাহার আমার! তুমি বেঁচে থাকো—সেই বাহারটাই তো আমার মস্ত বাহার। তুমিই তো আমার সোনা-চাঁদি, এরকম কাজ আর কক্ষনো করবে না বলে দিচ্ছি—আমার দিব্যি রইল।

পড়শীরা বলতো, ভাগ্য বটে মালীর। তাদের স্ত্রীরা সদাই দেহাই-দেহাই। এ দাও সে দাও—তুমি জাহান্নামে যাও কোন ক্ষতি নেই। মালীর বেঁচে থেকে সুখ। ওরকম স্ত্রীকে নিয়ে নরকে গেলেও স্বর্গলাভ।

মালী ধ্যান মালী জ্ঞান ছিল পার্বতীর। মালী ভিন্ন দ্বিতীয় অন্য কোন মরদের মুখ ভেসে ওঠেনি কখনও পার্বতীর পতিপ্রেমের দরিয়ায়। শাক-ভাত খেয়ে পার্বতী ভেবেছে পরমান্ন খাচ্ছে সে। কুঁড়েঘরের মেঝেয় ছেঁড়া চাটাইয়ের ওপর শুয়ে সে ভেবেছে মালা গাঁথা মালিনী সে। ভেবেছে, রানীদের চেয়ে কমতি কিসে। সে মহারানী।

দিদিমা মস্করা করে বলেছে, নাতজামাই একে আমার কষ্টিপাথর—তোর পাশে দাঁড়ালে কষ্টিপাথরকেও হার মানায়। মনে কিছু করিস না নাতনি, একটা সত্যি কথা না বলে পারছি না তোকে। দু'জনে মানায় নি বাপু। এ যেন বানরের গলায় মুক্তোর মালা।

পার্বতী সইতে পারে নি। তীক্ষ্ন কণ্ঠে বলেছে, যা আছে, তা আমার আছে, ওসব নিয়ে অত মাথা ঘামাবার দরকার নেই তোমার দিদা! বয়েস তো ঢের হল—ভগবানের নাম করতে নেই মুখে একবারটিও। তবু পরকালের কাজ হ'ত। এসব পরনিন্দা পরচর্চায় কৃমিকীট হয়ে জন্মাবে শেষে। কেন বানরের গলায় মুক্তোর মালাটা দেখছো কেন? পোড়াচোখে রাম-সীতা নজরে এলো না!

ফোকলা মুখে মাড়ি বার করে হেসে লুটিয়ে পড়েছে দিদিমা। পার্বতীর মাথাটা বুকে চেপে ধরে, মাথার চুল নাড়তে নাড়তে ফাঁকা গলায় বলেছে, স্বামী-সোহাগিনী হয়ে, এয়োতির হার গলায় নিয়ে যেতে পারো যেন ভাই।

আনন্দে চোখের কোণে জলের ফোঁটা টলটল করে উঠেছে পার্বতীর। হাসি-মুখে পার্বতী বলেছে, দিদু, সেই আশীর্বাদ কর প্রাণভরে।

বিস্ময়ে দু'চোখের তারা স্থির হয়ে আটকাচ্ছে থেকে থেকে, পার্বতীর মুখের ওপর। দিদিমা চেয়ে আছে। সেই পার্বতীর এই অবিশ্বাস্য পরিবর্তন। মালীকে বুঝি মনেই নেই, দিনরাত নিজের সুখের চিন্তায় নিজে মশগুল। মাধব রাও ওর হৃদয়ের আসন জুড়ে বসে রয়েছে।

মালীর মৃত্যুর সঙ্গে মরেছে সেদিনকার সেই পবিত্র পার্বতী। সেই দেহ পেতনীর বাসা এখন। অহর্নিশ ভূতের মুখে রামনাম কেবল। নিজে নির্দোষ সাজার জন্য কামনা তৃপ্তিকে স্বর্গের সুষমা ভোগ দেখানোর জন্য যৎপরনাস্তি চেষ্টা। রামায়ণ মহাভারত গীতার উপমা টেনে-হিঁচড়ে এনে সামনে খাড়া করার প্রয়াস অনবরত।

মনই নেই যার, মনে রাখবে সে কি?

সন্ধ্যে হলেই, তাকে না দেখলে থাকতে পারে না পার্বতী, ফুলের সাজি হাতে করে করে দৌড়য় বারমহলে—সে কি ওর স্বামী-হন্তা নয়?

মাধব রাওয়ের আদেশেই তো তার পোষা পেটোয়া জল্লাদটা মালীর শির নামিয়ে দিয়েছে গর্দান থেকে মাটিতে।

রক্তের ফোয়ারা ছুটেছে ঘরময়। স্বামীর রক্তে স্ত্রী চান করে ওঠেনি, জামা শাড়ি ভিজে যায়নি? সবই তো পার্বতীর বর্তমানে ঘটেছে। স্বচক্ষে স্বামীর মৃত্যু দেখে কেমন করে অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পার্বতী?

চিৎকার করেনি, টলে পড়েনি। ঘোরেনি মাথা, দেখেনি চোখে অন্ধকার। পার্বতী অন্য দুনিয়ার পার্বতী হয়ে গেছে মুহূর্তে। সে সময় ওর মাথায় কোন দৈব ভর করছিল, না কোন দুর্জনের প্রেতাত্মা বোঝা অসম্ভব ছিল।

শান্তাপুর গাঁওয়ের ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ হতভম্ব হতবাক এ দৃশ্যে। এ তারা কোন পার্বতীকে দেখল, দেখছে কাকে? বিস্ময় রহস্যের জাল একটার পর একটা জড়িয়ে ধরেছে ওদের মনকে ওদের চোখকে। ওরা দেখেছে, সারা গাঁওটা স্তব্ধ হয়ে গেছে শান্তগিরির মতন।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়—যারা খুন করল মালীকে—মাধব রাওয়ের সেইসব নরপিশাচ মাতালদের সঙ্গে নির্বিবাদে নির্দ্বিধায় হাসতে হাসতে পার্বতী চলে গেল কি করে! ওদের মধ্যে সর্দার গোছের লোকটা যখন পার্বতীর হাত ধরে ফেলল খপ করে, বাধা দিল না পার্বতী। পার্বতী যেন মুখিয়ে ছিল ওদের সঙ্গে যাবার জন্য।

মালীর কাছে পার্বতীর প্রেম নিবেদন কি তাহলে নির্ভেজাল ছিল না? ঘরে ফিরতে দেরী হলে পাগলের মতন ছুটোছুটি, মন্দিরের চত্বরে গিয়ে দেখে আসা—ওখানে বসে ফুল বিক্রি করছে কি না তখনও—দেখে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা—এ সবই দেখানো অভিনয়!

মালীর অসুখে, শিয়রে বসে হাউ হাউ করে কান্না—দিনরাত উপোস—দেবীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা—আমার পরমায়ু নিয়ে মালীকে বাঁচিয়ে তোলো মা।

সবই ফাঁকা!

দিদিমা দেখেছে প্রথম পার্বতীকে। দ্বিতীয়কে এখনও দেখছে। আগের যে

মানুষটা হারিয়ে গেছে—তার জন্য বড্ড কষ্ট হয়। ভেতরটা খুবলে খুবলে খায় একটা নিষ্ঠুর যন্ত্রণা। এ পার্বতীকে দেখতে চায় না দিদিমা।

মালীর জন্য যদি পাগল হয়, হোক ও। পথে পথে ঘুরে বেড়াক তবুও ভালো—সওয়া যায় সেটা। এ অসহ্য—এ জীবন দুঃখের—যতই সুখের ভাবুক না পার্বতী।

দু'চোখ বুজে ভবানীদেবীর ধ্যান করে দিদিমা। বিড় বিড় করে বলে।—ওর সৎ বুদ্ধি দাও মা। ও-রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে এসো! লাল করবীর গোড়ের মালায় পুজো দেবো তোমায়।

দিদিমার আশা কি পূর্ণ হয়েছে?

অমৃতাবাঈ দেখছে, পার্বতী হাস্যময়ী-রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে। খিলখিল ক'রে হাসছে। হাসিতে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে নুয়ে পড়ছে একেবারে কালো পাথরের মেঝেয়।

বলিষ্ঠ দু'হাতে পার্বতীর দু'টি বাহু আলতোভাবে ধরে, তুলে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে মাধব রাও। কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস ক'রে বলছে, পারু, বলে-কয়ে রেখেছো তো?

ঘাড় দুলিয়ে পার্বতী বলল, নিশ্চয়ই। পার্বতী মালিনীর ঠিকে ভুল হয় না কখনও। রাওসাহেব, তুমি কি বুঝতে পারছো না এখনও—কোথায়, কার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি আমি? এইটাই তো অন্দরমহলের গোপন পথ। পার্বতীর নখদর্পণে।

—না, না। সে-কথা বলছি না। আমি জানি তুমি কার ঘরে নিয়ে যাচ্ছ। বলছি, আসতে একটু দেরী হয়ে গেল না, জেগে থাকবে তো?

—থাকবে, থাকবে—চিন্তার কোন কারণ নেই। রাতভোর জেগে থাকবে যশোমতীবাঈ। কার জন্য অপেক্ষা করছে সে? শত শত মেয়ে যাকে পাবার জন্য পাগল। তুমি যে যশোমতীবাঈয়ের কত দিনের স্বপ্ন কত আরাধনার ধন—তা তুমি কি বুঝবে রাওসাহেব! বুঝি আমি। একান্তে বসে বসে কত অন্তরের গোপন কথা বলেছে আমায়। শয়নে-স্বপনে-জাগরণে দিনরাত তোমায় দেখে সে।

উৎকর্ণ হয়ে উঠল মাধব রাও। চনমন করে তাকাল চারদিকে। বলল, মলের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি পারু—কার?

—চিনতে পারছো না রাওসাহেব? যে তোমার আশা, তোমার জীবন, তোমার ভালবাসা। পায়চারি করছে ঘরে তোমার অপেক্ষায়।

—একটু পা চালিয়ে চল পারু!

—এসে তো পড়েছি, আর ক'পা! যশোমতীকে দেখে দুনিয়া ভুলে যাবে জানি, তাই একটা কথা বিশেষ ক'রে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন মনে করি।

—তুমি কি বলতে চাইছো—জানি পারু। আমি তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য রক্ত ঢেলে দিতে জানি।

—এটা কি আমার অজানা রাওসাহেব? সে কথা নয়, কথা—বন্দিনী যশোমতীকে মুক্ত করা এ কয়েদমহল থেকে। মুক্ত না করা অবধি আমার

শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। প্রতিশোধ নিতে হবে তোমাকে। রাতের অন্ধকা
চিরদিনের জন্য অনন্ত রাওকে সরিয়ে ফেলতে হবে দুনিয়া থেকে। মনে থা
যেন, তোমার শত্রু অনন্ত রাও! যশোমতী আজ তোমারই হ'ত—হয়নি প্রে
চতুর অনন্ত রাওয়ের জন্য। যশোমতীর চোখের জল দেখে আমি নিজেকে ঠি
রাখতে পারি না রাওসাহেব। আজকের যশোমতীয় বন্দীদশার শেষ রাত
আজকের রাত অনন্ত রাওয়ের শেষ রাত। আজ আমার কি আনন্দের দিন—কেম
করে বুঝিয়ে বলবো রাওসাহেব!

উত্তেজনায় মুখচোখ লাল হ'য়ে উঠেছে পার্বতীর। অল্প-অল্প কাঁপছে সার
দেহ। মাধব রাওয়ের বাঁ-হাতটা চেপে ধরল সজোরে।

গোলাপী চোখ রক্তরাঙা হয়ে উঠল মাধব রাওয়ের। মোলায়েম গলায় বলল
তোমার ঋণ শোধ করতে পারব না জীবনে পারু। তুমি কি না করেছে
যশোমতীর জন্য আমার জন্য। আজও তোমার জন্য এই মহলে। কতদি
দেখিনি যে যশোমতীকে। একটা জমা ব্যথা আনচান করে উঠল মাধব রাওয়ে
ভেতরে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল মাধব রাও।

পার্বতী আর মাধব রাও, দুজনে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে আসছে।

পার্বতীর দিকে তাকাতে পারছে না অমৃতাবাঈ। পার্বতীর এ আজ এ
অদ্ভুত রূপ। বিচিত্ররূপিণী পার্বতী। নিজের বল্লভকে তুলে দিতে যাচ্ছে অন্যে
হাতে। এই বহুবল্লভার প্রেমের বেসাতিই শুধু। আসল প্রেমিকা নয়।

মাধব রাওই বা কেমনতর লোক! যে পার্বতী এইভাবে নিজের জীবন বিপন্ন
করে যশোমতীর কাছে এসেছে ভবানী মন্দিরে ফুলের মালার জোগান দেবা
ছুতো ক'রে—মাধব রাওয়ের প্রেমনিবেদনের কথা জানিয়েছে কানে কানে—তা
ভবিষ্যতের কথা কিছুই তো বলছে না। আশ্চর্য মানুষ!

না, বলছে মাধব রাও।—পারু, যশোমতীকে পেলেও—তুমি আমার—
আমারই থাকবে। যেমন আছো তেমনি।

পার্বতীর ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসি। বলল, সে বিশ্বাস আমার আছে রাও-
সাহেব। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। তুমি কত উদার। তোমার বুকে ঠাঁই
আমার। সময়-সময় মনে হয়—সত্যিই আমি কি মরে গেছি, না বেঁচে আছি।
এ আমার আগের জন্ম, না এ জন্ম! এমন ভাগ্যও মানুষের হয়।

পার্বতী থামল একটু। কি যেন ভাবল। আবার বলতে শুরু করল, আমি
কি থেকে কি হয়েছি। কিন্তু যশোমতী। সে-ও কি থেকে কি হয়েছে! আমি
পাতাল থেকে স্বর্গে উঠেছি, যশোমতী স্বর্গ থেকে পাতালে পড়েছে।

পার্বতী পা চালাল জোরে। মলের ঝমঝম আওয়াজটা একসঙ্গে কয়েক
জোড়া মলের আওয়াজের মতন বেজে উঠল নিঝুম-নিস্তব্ধ রাতে। ওই আওয়াজে
খিলখিল করে হেসে উঠছে যেন কারা।

মাধব রাও চমকে উঠল। বলল, কারা হাসছে, কারা আসছে পারু!

চলার গতি মন্থর করল পার্বতী! বলল, রাওসাহেব আমাকে খুব বিশ্বাস
করো নিশ্চয়?

—নিশ্চয়। তবে ভয় ধরছে কেন?

—না না। ভয় নয়, এমনি জিজ্ঞেস করছি।

—আমারই মলের আওয়াজ, আমারই হাসি শুনছো তুমি। অন্য দ্বিতীয় কারো নয়। এ দালানে একটু জোরে শব্দ হ'লে—একসঙ্গে অনেক শব্দ শোনা যায়।

জামার তলা থেকে খাপসুদ্ধ ছোরাটা বার করল পার্বতী।—এটা কাছে রেখো। তোমার তলোয়ারটা নিতে দিইনি। মিলন রাতে অস্ত্র মানায় না। ফুলের 'যশোমতী' লেখা মালা তাই গলায় পরিয়ে দিয়েছি। যশোমতী কত না খুশী হবে। কিন্তু—তবু তোমার কাছে এটা রেখে দাও। এ আমার বরাবরের আত্মরক্ষার। তুমি নাও!

ছোরাটা হাতে তুলে দিয়ে, একবার তাকাল পার্বতী! উদাসীন চাউনি।

একটা সংশয়ের দোলা দুলে উঠল মাধব রাওয়ের মনে। পার্বতী ভাঙছে না—কিছু আঁচ পাচ্ছে তাহলে? কেউ কি অনুসরণ করছে তাদের দু'জনকে!

পার্বতী মাধব রাওয়ের মনের কথা বুঝে উত্তর দিল যেন।—না, কেউ আমাদের পেছু নেয়নি। কোন ভয়ডর নেই। এমনি দিলুম। ছত্রীর মস্ত সঙ্গ অস্ত্র!

একটু মাথা নেড়ে, মুখের ওড়নাটা সিঁথির ওপারে সরিয়ে দিয়ে বলল, বিয়ের সময় বরের তলোয়ারই কি আসল নয়! তলোয়ার নেওয়া মানেই তো সেই পুরুষ সেই মেয়ের স্বামী। তুমিও তো পাঠিয়েছিলে যশোমতীকে।

মাধব রাওয়ের মুখখানা ভীষণ গম্ভীর হয়ে উঠল।

—অত গম্ভীর হয়ে উঠলে কেন রাওসাহেব? কোন দোষ ছিল না যশোমতীর। আমি জানি।

তোমার সে তলোয়ার পেঁছয়নি যশোমতীর হাতে। রাস্তা থেকেই ফিরিয়ে দিয়েছে অনন্ত রাও। শয়তান একটা। যশোমতীর নামে রটিয়েছে—ফিরিয়ে দিয়েছে যশোমতী। যশোমতী শুনে কেঁদে সারা। বলেছে এতখানি মিথ্যে—তার নামে। সূর্যদেব এখনও উঠছে কেন? পৃথিবী রসাতলে যাচ্ছে না কেন এখনও! তিনদিন পর্যন্ত মুখে কুটোটি কাটে নি। জোর করে অসহায় একটা মেয়েকে শাদি করল শয়তান সাত তাড়াতাড়ি।

পার্বতীর চোখের তারায় সাপের ফণা নেচে উঠল। নিঃশ্বাসে হিস হিস শব্দে বেজে উঠল। সর্বাঙ্গ জ্বলছে পার্বতীর। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে থেমে থেমে বলেছে, ওই ছোরা বসিয়ে দিতে হবে তোমায় অনন্ত রাওয়ের বুকে।

নিচু হয়ে, পায়ের মল জোড়া খুলে ফেলল পার্বতী তাড়াতাড়ি। চাপা গলায় বলল, শুনতে পাচ্ছো ঢং-ঢং আওয়াজ? রাতের শেষ প্রহর শুরু হ'ল। গাঁও ঘুমোচ্ছে। এ মহলের সকল। এই সুবর্ণ সুযোগ। পালঙ্কে ফুল বিছিয়ে বসে আছে এখন হয়তো যশোমতী একা ঘরে। আর একদণ্ড দেরী নয়। মাধব রাওয়ের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল পার্বতী। ছোটার মতন করে চলেছে।

অমৃতাবাঈ দেখছে, দালানের বাঁকে ঘুরল দু'জনে মিলিয়ে গেল।

অমৃতাবাঈয়ের চোখে ধাঁধা লেগে গেল হঠাৎ। ছুটতে ছুটতে যশোমতীবাঈ আসছে। আলুথালু বেশ। এলো চুল। মাঝদালানে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে তাকাল বার দুয়েক। স্থির থাকতে পারল না, আবার ছুটছে।

এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করে, পার্বতী মাধব রাওকে ঘরে পৌঁছতে না দেখে যশোমতীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে। তাই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। পেছনে দালান দিয়ে এসেছে এখানে। এখান দিয়েই আসার কথা ওদের।

যশোমতীর ছোটার বিরাম নেই। দালান নয় তো···এমাথা থেকে ওমাথা অবধি লম্বা রাস্তা একটা। যে বাঁকের মুখে মিলিয়ে গেছে ওরা, সেই বাঁকের মুখেই ছোটার মোড় ঘুরল যশোমতীর।

রুদ্ধনিঃশ্বাসে দেখছিল অমৃতাবাঈ, বসে পড়ল থপাস ক'রে। যশোমতী-বাঈকে মারাঠী মেয়ে দেখাচ্ছিল না। পরনে বাঙালী মেয়ের সাজ। লাল টকটকে চেলির শাড়ি। সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে টিপ। সোনার একটা সরুপাতও গায়ের কোনখানে নেই। কেবল দুহাতে দুটো শাঁখের শাঁখা। বাঁহাতে বাড়তি একটা লোহা। এয়োতির চিহ্ন।

একটা, নরম লাবণ্য সারা শরীরে উপচে পড়ছে। ঢলঢলে মুখ ছলছলে চোখ—বাঙালী মেয়ে সর্বাণী। সর্বাণী কুমারী ছিল—এ সধবা—এই যা তফাৎ। সর্বাণীকে নিয়েই না কত হুলুস্থুল।

দাঁইহাটায় দুর্গাপুজো হবে। বাঙলার মাটিতে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। বর্গীদের প্রধান রঘুজী ভোঁসলের সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত পুজো করছে।

চিরশত্রুর দুর্গাপুজো, রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল আলিবর্দী খাঁ, বাঙলার মসনদে বসে পর্যন্ত তার ঘুমনিদ্রা গেছে এই মারাঠি দস্যুদের উৎপাতে। লুঠপাট—কি না করছে ওরা! বারে বারে নবাবীফৌজের হেনস্তা।

আলিবর্দীর কড়া হুকুমনামা জাহির হল ঢাক পিটিয়ে গ্রামে গ্রামে। দুশমন প্রজাদের মন জয় করার জন্য, প্রজা ভাঙিয়ে নেবার জন্য নতুন কৌশল শুরু করে দিয়েছে ভাস্কর পণ্ডিত। দুর্গাপুজো ফুজো—ভড়ং ছাড়া আর কিছু নয়। উদ্দেশ্য, সকলের চোখে ধোঁকা দিয়ে বাঙলার মাটিতে পঙ্গপালের মতন কায়েম হ'য়ে বসা। হুঁশিয়ার সকলে। খবরদার কেউ সাহায্য করলে, তাকে দণ্ড পেতে হবে।

বিরাট চাঁদোয়া খাটিয়ে দুর্গাপুজো শুরু হয়েছে। ভিড়ে ভিড়। মেয়েরা গলায় আঁচল জড়িয়ে জোড়হাতে দুর্গামূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে।

আরতির ঘণ্টা বেজে উঠল। চতুর্দিকে শঙ্খধ্বনি। শিউলিফুল ঝরে পড়ছে গাছ থেকে টপ টপ করে। শঙ্খধ্বনি ছাপিয়ে অসংখ্য ঘোড়ার খুরের খটখট শব্দ ভেসে আসতে লাগল।

বুঝতে আর বাকি রইল না কারো—নবাবীফৌজ এখুনি এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে

মারাঠিদের ওপর। দর্শনার্থীদের বরাতে কি আছে কে জানে! বর্গী আর নবাবী সৈন্যদের যুদ্ধের মাঝে পড়ে পিতৃদত্ত প্রাণ না খোয়াতে হয় শেষে তাদের।

সকলে দিশেহারা। পড়িমরি করে যে যেদিকে পারল—ছুটে পালাতে চেষ্টা করল। সকলেই নিজের প্রাণ বাঁচাতে ব্যতিব্যস্ত। কে মাটিতে পড়ে গেল দেখার প্রয়োজন নেই কারো। তার দেহের ওপর দিয়েই পিষে থেঁতলে চলে যাচ্ছে মানুষের উত্তাল তরঙ্গ।

জ্ঞানপুরোহিত নিবিষ্ট মনে দেবী অষ্টভূজার আরতি করে যাচ্ছে। কোন ধারে লক্ষ্য নেই তার। ডানহাতে আঠারো প্রদীপের ঝাড়, বাঁহাতে ঘণ্টা। দেবীর শ্রীচরণ-নাভি-হৃদয়-মস্তক। আরতির আলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে উঠছে ওপরে, আবার নামছে—মস্তক-হৃদয়-নাভি-শ্রীচরণ।

জ্ঞানপুরোহিত ভাবে বিভোর। সাক্ষাৎ দর্শন করছে মৃন্ময়ী দেবী প্রতিমার মধ্যে চিন্ময়ী জগন্মাতাকে। বাইরের কোন দৃশ্যই চোখে পড়ছে না, কোন শব্দই কানে পেঁছুচ্ছে না।

নবাবীফৌজের আচমকা আক্রমণে বর্গীরা দিশেহারা। মেয়েপুরুষের ওপর দিয়েই ফৌজ ছুটে চলেছে। চতুর্দিকে শুধু বুকফাটা কান্না আর আর্তনাদ।

প্রাণপণে দু'হাতে লোক ঠেলে ঠেলে সর্বাণী এগিয়ে আসতে চেষ্টা করছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে, তবু চেষ্টার অন্ত নেই। মায়ের ধ্যানে আরতিতে মগ্ন বাবা। বাবাকে সচেতন ক'রে না দিলে, হারাতে হবে যে শেষে। কাছাকাছি এসে গেছে, কিন্তু জ্ঞানপুরোহিতের কাছে পেঁছিতে পারল না। একজন যমের মতন চেহারার ফৌজি পাঁজাকোলা করে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিল সর্বাণীকে। ঘোড়া ছুটছে।

সর্বাণীর কান্না শতসহস্র কান্নার মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। কারো কানে প্রবেশ করছে না। কেউ আসবে না তাকে উদ্ধার করতে। কেউ জানবে না সর্বাণী কোথায় গুম হয়ে গেল। কেন এমন হ'ল তার!

বাবা বলতো, সর্বাণী মা আমার সর্বমঙ্গলা। দেবী অংশ। মহাষ্টমীর শেষ, নবমীর শুরু—সন্ধিক্ষণে জন্ম। দেবীর প্রসাদী ফুল সর্বাণী। কোথায় বাবার কথা ফলল তার জীবনে! প্রসাদী ফুলকে তুলে নেওয়ার জন্য কোন দেবতার হাত তো এগিয়ে এলো না। সময়ে না হোক, অযত্নে তো কুড়িয়ে নিল না কেউ, এইটাই কি তার প্রকৃত ভবিতব্য ?

হঠাৎ একটা অস্ফুট কাতর স্বর বেরিয়ে এলো যমদূত ফৌজিটার গলা দিয়ে। ছিটকে পড়ে গেল ঘোড়ার পিঠ থেকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে—সন্তর্পণে—খুব আলতোভাবে—যেন ছুঁয়েও ছোঁয়নি—তুলে নিল সর্বাণীকে নিজের ঘোড়ার পিঠে এক দেবপুরুষ।

সব যেন স্বপ্ন। অলক্ষ্য থেকে কোন শক্তি যেন কাউকে পাঠিয়ে দিয়ে উদ্ধার করল সর্বাণীকে সর্বহারা হয়ে যাবার পথ থেকে। দেবপুরুষ ঘোড়া ছুটিয়ে নিয়ে এলো তাকে নিরাপদ স্থানে! তারপর এই শান্তাপুর গাঁয়ে।

নিজের গ্রামে নিয়ে এসেও, সর্বাণীকে সম্ভ্রমের চোখে দেখেছে দেবপুরুষ। কোনদিন ঘরের ভেতর চৌকাঠের এপারে পা রাখেনি? চোখে চোখ চেয়ে তাকায়নি

কোনদিন। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে, মাটির দিকে তাকিয়ে তার সুবিধে-অসুবিধের খবর নিয়েছে রোজ সকালসাঝে।

সর্বাণীর বড় আশ্চর্য লাগে ভাবতে। দুটি মানুষকে দেখলে একই সময়ে। একটি যমদূত একটি দেবপুরুষ। একজন ভোগের বস্তু হিসেবে লুঠ ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে, অন্যজন ত্যাগের মহিমায় তার হৃদয় আসনে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে সদাসর্বদা। এ মানুষ কত উদার কত মহৎ শক্তি ধরে—কি সংযত—নিষ্কলঙ্ক চরিত্র।

দেবপুরুষের স্মরণই সর্বাণীর প্রধান সঙ্গী হয়ে উঠল নিভৃতে নিঃসঙ্গ অবসরে। নিজের অগোচরে কখন যে তাকে অতি আপনজনের চেয়েও আপন ভেবে নিয়েছে—জানে না। হৃদয়-দেবতা—তাও না।

ওই একটি লোকই তার জীবনের সব—দিব্যচক্ষে দেখতে পেল এক রক্তাক্ত অধ্যায়। মর্মান্তিক দৃশ্য, কি পৈশাচিক কাজ! একটা নির্দোষ প্রাণ বলি হল সর্বাণীর জন্য।

অমৃতাবাঈ অবাক হয়ে যাচ্ছে।

যে বাঁকের মুখে ঘুরে ছিল, সেই বাঁকের মুখেই ফিরে এসেছে যশোমতীবাঈ আবার। আবার কাকে যেন খুঁজছে,—পার্বতী, মাধব রাও? ওদের কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। দক্ষিণেই ছুটে চলেছে আবার।

ঘোড়া ছুটিয়ে কে যেন আসছে—কারা যেন আসছে। অনেক—অনেক খুরের শব্দ। তলোয়ারের ঝনঝন, লাঠির খটাখট আওয়াজ কানে বাজছে। বুকের হাড় ভাঙছে অমৃতাবাঈয়ের। অমৃতাবাঈ বসে বসেই দু'হাত চেপে ধরল বুকে। আগুনের তাপ লাগছে সর্বাঙ্গে। লাল আগুনের লকলকে শিখা গ্রাস করবে বুঝি সমস্ত দেশকে। হুতাশনের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসছে সব বাধাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখারে পাঠিয়ে।

কুঁড়েঘর জ্বলছে। জল-জল চিৎকারে আগুনের তেজ বেড়ে উঠছে রোষে চতুর্গুণ। বাতাসে হাহাকার, মাটির বুক ধুঁকছে—অন্তিম নিঃশ্বাস ফেলার অপেক্ষা! এক বৃদ্ধা ডুকরে কেঁদে উঠল—এমনও পাষণ্ড আছে গাঁয়ে গো! আগুনে পুড়িয়ে মারল সবাইকে। কানাচোখো ভগবান কি দেখতে পায় না তাকে?

ক্ষীণজীবী সরু নদীটার জল শুকলো, ইঁদারার জল ফুরলো। রাতভোর বুড়ো-জওয়ান জল ছেঁচে জল ঢেলেছে। আগুন নিভেছে, ধোঁয়া ধুয়ে যায়নি। কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে ওপর দিকে।

বৃদ্ধার বাড়ি হুতাশন পেট পুরেছে। পোড়াবাড়ির ছাইগাদার পাশে পা ছড়িয়ে বসে বুক চাপড়াচ্ছে। আর কাঁদছে ভাঙা গলায়। শাপশাপান্ত করছে মুখে, বলি, যম কি মরেছে নাকি গা! এই সর্বনাশ করল যে তার কাঁচা মাথাটা কড়মড় করে চিবিয়ে খেতে পারলি না। মুখপোড়ার কোন যুগ্যি যাবে—এমন আহাম্মক কেউ আছে নাকি! এদিকটা সম্পূর্ণ অনন্ত রাওয়ের এলাকা। জায়গা-জমি প্রজা-পাট সবই তো ওর।

তবে কি মাধব রাও ? সন্দেহের দোলা দুলে ওঠে ওদের মনে। আশ্চর্য ! মাধব রাওয়ের এলাকায় আগুনের ফুলকিটি পর্যন্ত ফুটে ওঠেনি। এদিকের লোকেরা ওদের এমন চক্ষুশূল যে, এত বড় অগ্নিকাণ্ডে—সাহায্য তো দূরের কথা—দূরে থেকে একবারটি উঁকি মারল না পর্যন্ত কেউ। ওদিকটায় জেগে ঘুমিয়েছিল সকলে নিশ্চিন্তে।

সকালের সেই তুচ্ছ ব্যাপারটাই কি বৃহৎ হয়ে উঠেছে নিশুতি রাতে। প্রতিশোধ প্রতিহিংসা ফুঁসে উঠেছে অনন্ত রাওয়ের সৌভাগ্য নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য। সবই সম্ভব। অবিশ্বাস করা যায় না।

ভাদ্রমাসের শুক্লাচতুর্থীতে তো মারাঠিদের বিনায়ক ব্রত—গণেশ চতুর্থী পালন—জাতীয় উৎসবই বললে চলে। এদিন বিনায়ক দেবতা ভক্তের পুজোয় সন্তুষ্ট হ'লে—তার সৌভাগ্য বৃদ্ধি নিশ্চিত। এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়েই ভক্তজনেরা বিশুদ্ধ মনে মন্দিরে গিয়ে ঘটা ক'রে বিনায়কের সামনে পুজোর উপচার নিবেদন ক'রে আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

এ প্রান্ত আর ও প্রান্ত—গাঁয়ের দুটি প্রান্তকে এক ক'রে বেঁধে রেখেছে মধ্যিখানে একটি পবিত্র-স্বচ্ছ সীমানাচিহ্ন। বিনায়কের শুভ্র-ধবল আকাশ ছোঁয়া মন্দির। সকাল থেকেই মন্দিরে ভিড় হ'তে শুরু হয়। সৌভাগ্য ফেরানোর তাগিদে। আগে পুজো দিলে আগে ফিরবে—কে কত আগে ফিরবে—তার প্রতিযোগিতা চলে একের সঙ্গে অন্যের।

পুজো দেবার হিড়িকে পুরোহিতের প্রাণান্ত ঠেলাঠেলি মারামারি—বাকি কিছু থাকে না আর। মুখে বলে সকলে, মন্দিরের প্রধান সাধক অসীমদাস বাবাজী তাদের গুরুদেব। গুরু আজ্ঞা শিরোধার্য। গুরুদেবের উপদেশ পালন করছে তারা অক্ষরে অক্ষরে ! গুরু কৃপাহি কেবলম্।

কাজে কিন্তু বিপরীত। এক ঈশ্বরের সন্তান সকলে। প্রেমপ্রীতির বন্ধনে সকলে আবদ্ধ আমরা। কারো সঙ্গে কারো হিংসাদ্বেষ করা উচিত নয়। সকলকে ভালবাসতে হবে প্রাণ ঢেলে—নিঃস্বার্থ ভাবে। সকলে আমার ভাই, আমার বোন।

উপদেশ মুখস্থ কেবল, অন্তস্থ হয়নি কারো। অর্থ-মর্ম বোঝেনি। বোঝেনি বলেই অন্যের ভাগ্য চাপা পড়ে যাতে, সেই চেষ্টা ! নিজের ভাগ্য খোলার নেশায় উন্মত্ত একেবারে। মেয়েরা বলে, মায়ে-ঝিয়ে মঙ্গলবার করে, যে যার মঙ্গল—সে তার করে।

অতএব মেয়ের মঙ্গল হ'লে তো মায়ের কি ? মায়ের হ'ল তো মেয়ের কি ? বাপের হ'ল তো ছেলের কি ? ছেলের হ'ল তো বাপের কি ?

পুজো প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে—আগে পরে হয়ে যাওয়ায়—অনেকের প্রিয়জনের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেছে বছরের পর বছর। এইভাবে বিচ্ছেদের বিষ ছড়িয়ে রয়েছে মাধব রাওয়ের পরিবারের মধ্যে—অনন্ত রাওয়ের পরিবারের বিরুদ্ধে। যদিও দু' পরিবারের পুরুষমানুষরা রঘুজী ভোঁসলে, ভাস্কর পণ্ডিতের অধীনে বাঙলা-বিহারে দল বেঁধে যায়—লড়াই করে চোখ

আদায় করে নিয়ে আসতে। মরণপণ লড়াই ওদের। জীবনের পরোয়া করে না একজনও। বাঙলার নবাব আলিবর্দী খাঁর ভয়ে ভীত নয় ওরা মোটে।

অনন্ত রাওদের চারপুরুষের মন্দির এটা। ঠাকুরদার বাবা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাতাদের মান্য হিসেবে, পুজোর উপচার সকলের শেষে পেঁছিলেও, দেবতার কাছে উৎসর্গ হবে আগে। সকলের পুজো বন্ধ ওদের পুজো না হওয়া পর্যন্ত।

কেন এমন পক্ষপাতিত্ব—কেন এমন অন্যায় হবে? প্রতিবাদের ঝড় তুলছে মাধব রাও কয়েক বছর ধরে। ফল হচ্ছিল না কিছু। অসীমদাস বাবাজী নিজের সিদ্ধান্তে অচল-অটল। এক চুল নড়বে না এদিকে-ওদিকে। বরাবর যে নিয়ম চলে আসছে, তাই চলবে।

কেন চলবে না? ওদের পুজো আগে করে, ওদেরই তো রমরমা অবস্থা হচ্ছে কেবল। সকলের ভাগ্য নিয়ে ওদের ভাগ্য ফেরানো—এ অধর্ম বরদাস্ত করা যায় না কোন প্রকারে। কথা না শুনলে, তার এবারের পুজো দেবতাকে না চড়ালে চরম ব্যবস্থা নেবে সে। নিজের দলবলের দিকে চোখ ঘুরিয়ে মিটিমিটি হেসে বলেছে বাবাজীকে মাধব রাও।

কেউ বিশ্বাস করে নি সত্যি কিছু করবে মাধব রাও। অমন পাগলের মতন তো অনেকবারই বলে ও। এদিকটা জ্বলে উঠতে, টনক নড়েছে এদের। তাহলে—ওই-ই কি? প্রমাণ নেই কোন। চোখে দেখেনি কেউ। সাপটে ধরার উপায় নেই কোন।

অনন্ত রাওয়ের ভাগ্য পোড়াতে গিয়ে সবটা পোড়ানো সম্ভব হয়নি মাধব রাওয়ের। নিঃসন্দেহে কতকটা ক্ষতি করে দিয়েছে।

যশোমতী কেঁদেছে হাপুস নয়নে। অনন্ত রাওয়ের হাত ধরে বলেছে, যত নষ্টের মূলে আমি রাওসাহেব। আমি অপয়া। আমাকে তুমি ঘরে না আনলে, এ জিনিস ঘটতো না।

অনন্ত রাওয়ের স্বরে স্নেহ-সহানুভূতি ঝরছে। বলেছে, তুমি পয়মন্ত, তুমি লক্ষ্মী। তুমি এসেছো বলে, কতকটাও বেঁচেছে আমার। না হলে—সব যেতে পারতো তো।

ক্ষমা কর রাওসাহেব—এটা সম্ভব হচ্ছে না আমার পক্ষে মেনে নেওয়া। মনে হচ্ছে আমায় সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে। বিয়ে পাকা করার জন্য তলোয়ার পাঠিয়েছিল মাধব রাও—ফেরৎ পেয়ে ক্ষেপে গেছে শুনেছি। আগুন হয়ে বলেছে, যশোমতীবাঈকে নিয়ে আগুন জ্বলে উঠবে। সে-আগুন নেভানোর সাধ্যি নেই অনন্ত রাওয়ের।

বলেছে, কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে—দেখে নেবো। যশোমতীবাঈকে কার সাধ্যি আটকে রাখে! কার সঙ্গে লাগছে, জানে না অনন্ত রাও। শঙ্খচূড়ের ল্যাজে পা! আর যশোমতীবাঈকেও দেখে নেবো। ওর রূপের গরব কত! ভালভাবে চেয়েছিল—অপগ্রাহ্য, অপমান। প্রতিশোধ কেমন করে নিতে হয় মাধব রাও জানে। মাধব রাওয়ের গুপ্ত কৌশলে হাতে হাতে ফল পাবে অনন্ত রাও।

অনন্ত রাও হাসতে হাসতে বলেছে, পাগলে কি না বলে! তোমাকে নিয়ে নয়—আসল ব্যাপারটা পুজো নিয়ে। তর্কবিতর্ক ঝগড়াঝাঁটি চলছে বহুদিন ধরে। পুরনো যন্ত্রণার জের টেনে।

তুমি যতই বল রাওসাহেব। আমি জানি, আমার জন্য এ ক্ষতি। ভুলতে পারছি না আমি সে দৃশ্য—কি ভয়ঙ্কর!

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে পালঙ্কের ওপর বসে পড়ল যশোমতীবাঈ। ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে। এত বাতাস টেনে নিয়েও বুক ভরে নিতে পারছে না যেন। খালি—খালি—ভেতরটা বড্ড খালি হয়ে যাচ্ছে যে তাড়াতাড়ি।

যশোমতীবাঈ পারল না বসে থাকতে। জানলায় এসে দাঁড়াল। হাঁপিয়ে উঠছে। হাওয়ায় বাগানের গাছ দুলছে। লতানে গাছে লুটোপুটি খাচ্ছে এলোমেলো উড়ে।

এত বাতাস! তবু নিঃশ্বাস নিতে পারছে না কেন যশোমতীবাঈ, কেন এমন হচ্ছে তার? এরই নাম কি মৃত্যু যন্ত্রণা? পশ্চিম-আকাশের পড়ন্ত রোদ পাহাড় ডিঙিয়ে যশোমতীর মুখে এসে আছড়ে পড়ছে। নাকছাবির হীরের রঙটা বদলাচ্ছে। দেওয়ালে রেখা টানছে—নীল সবুজ লাল···।

লক্ষ্য পড়ল যশোমতীবাঈয়ের। লাল রেখাটা বড্ড বড় হয়ে উঠছে। একি, দেওয়ালময় ছড়িয়ে যাচ্ছে—লাল টকটকে তাজা রক্ত। মাথা ঘুরছে শরীর দুলছে যশোমতীবাঈয়ের। চিৎকার করে উঠল—রক্ত—রক্ত······।

ধরে এনে পালঙ্কের ওপর শুইয়ে দিল অনন্ত রাও।

যশোমতীর মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে শিয়রে। দু'চোখ উপচে, কোণ বেয়ে জল গড়াচ্ছে যশোমতীর। কি সান্তনা দেবে অনন্ত রাও। সান্তনার কিছু নেই যে।

মাধব রাওয়ের শাসানিতে ভয় ধরেছে যশোমতীবাঈয়ের। অনন্তরাওকে অনুনয়-বিনয় করেছে।—এ দেশ থেকে যেখানে খুশি—আমাকে সরিয়ে রাখো রাওসাহেব। আমার মন বলছে, একটা কোন অমঙ্গল ঘটবে আমায় নিয়ে।

অনন্ত রাওয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে খানিক যশোমতীবাঈ উত্তরের আশায়। অনন্ত রাওয়ের চোখে কোন চঞ্চলতা দেখেনি। ধীর-স্থির শান্ত সুন্দর। মাধব রাওয়ের কোপ থেকে একে বাঁচানো যায় কেমন করে? ভেবে কূলকিনারা পায় নি।

বলেছে, রাওসাহেব, যেখানে দু'চোখ যায়—চলে যেতে দাও আমায়।

অনন্ত রাও উত্তর দেয়নি এবারও। শুধু হেসেছে আর চেয়ে দেখছে। যা করবার তাই করবে সে। শত বাধা আসুক ঝঞ্ঝা আসুক—পৃথিবী ওলোট-পালোট হয়ে গেলেও।

রাতের অন্ধকারে যশোমতী পালাতে চেষ্টা করেছে, পার্বতীর দৃষ্টির সতর্ক পাহারায় পালাতে পারেনি। অনন্ত রাও পার্বতীকে আড়ালে ডেকে হুঁশিয়ার ক'রে দিয়েছিল।

বলেছিল, পার্বতী তোমার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস। আমি জানি তুমি

রাজপুতানী—জাত মালিনী নও। ফুলের ব্যবসা তোমার। তাহলেও তোমার রক্তে এক বিন্দু বিশ্বাসঘাতকতা নেই।

পার্বতী অনন্ত রাওয়ের চোখে চোখ রাখেনি। নামিয়ে নিয়ে খুব আস্তে আস্তে বলেছে, আমার প্রাণ থাকতে যশোমতীবাঈয়ের ছায়া স্পর্শ করতে পারবে না কেউ। যশোমতীবাঈকে পালিয়ে যেতে দোব না আমি। এ মালিনীর প্রতিশ্রুতি নয়, রাজপুতানী পার্বতীর প্রতিশ্রুতি এটা।

হাসতে হাসতে চলে এসেছে অনন্ত রাও। ফিরে এসেছে সন্ধ্যায়। সেই রাতের সেই ভয়াবহ দৃশ্যে এসে হাজির হয়েছে যশোমতীবাঈয়ের সামনে। যশোমতীবাঈ অন্যদিকে পালাতে গিয়েও ছুটে এসেছে অনন্ত রাওয়েরই বাড়ির পথে। অনন্ত রাও-ও খবর পেয়ে দৌড়েছে। সামনাসামনি দেখা।

যশোমতীবাঈ বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেছে পথে। ঘরে তুলে এনেছে অনন্ত রাও।

যশোমতীকে ঘরণী করার ব্যাপার নিয়ে বাড়িতে প্রবল আপত্তি উঠেছে। যে মেয়েকে নিয়ে নানা কথা রটেছে চতুর্দিকে—একটা নৃশংস ঘটনাও ঘটে গেল —তাকে খানদানী ঘরের বৌ! মান-ইজ্জত লুটিয়ে পড়বে রাস্তার ধুলোয়।

পড়ুক—আশ্রয় যাকে একবার দিয়েছে অনন্ত রাও, তাকে ত্যাগ করতে পারবে না কখনও, অনন্ত রাওকে সকলে ত্যাগ করলেও।

পরের দিন অসীমদাস বাবাজী বিনায়কের মন্দিরে হোমের আগুনে আহুতি দিইয়েছে দু'জনের হাতে হাতে এক ক'রে। লজ্জারাঙা মুখে অনন্ত রাওকে দেখেছে যশোমতীবাঈ। আর যশোমতীবাঈকে দেখেছে অনন্ত রাও স্বামীর দৃষ্টিতে।

তারপর কিছুদিন যেতে না যেতে—আগুনের দাবদাহে যা হবার তা হয়ে গেল।

অনন্ত রাও নিঃশ্বাস ফেলল জোরে।

যশোমতীর সারা দেহের ওপর দিয়ে একটা ঝড়ের হাওয়া বয়ে গেল বুঝি। চমকে উঠে তাকাল। অনন্ত রাও চেয়ে আছে একদৃষ্টে।

—ভয় পেলে? বিব্রত গলায় বলল অনন্ত রাও।

—না, ভয় আমার নিজেকেই বেশী। আমার জন্য অনিষ্ট না হয় আরও।

—কেন মিছে এ দুর্ভাবনা তোমার সর্ব? তুমি দেবী ভবানীর দান আমার কাছে। দুর্গামণ্ডপেই তোমায় পেয়েছি। যা গেছে আমার অদৃষ্টে, যা আছে তোমার ভাগ্যে। হয়তো আমারও যাবার দশা ছিল, বেঁচে গেছি তোমার এয়োতির জোরে।

—দেবী ভবানীর আশীর্বাদে। দু'হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকাল যশোমতীবাঈ। প্রণাম জানাল ভবানীকে।

অনন্ত রাও-ও দেবীর উদ্দেশ্যে মাথা নোয়াল। বলল, দেবীর আশীর্বাদ যখন রয়েছে আমাদের ওপর, তখন মনের কোণে আর স্থান দেবে না—তোমার জন্য। কই—উত্তর দিচ্ছোনা সর্ব—সর্বাণী!

—হুঁ। একটি মাত্র শব্দ। যশোমতীর নিজের উচ্চারণ নিজের কানেই অদ্ভুত

শোনাল। বহুদূর থেকে ক্ষীণ নারীকণ্ঠ ভেসে এসেই থেমে গেল। কে ? সর্বাণী ? অনন্ত রাওয়ের চোখে লাগা মিষ্টি মেয়ে সর্বাণী ! অনন্ত রাওয়ের মনের কানে বেজে ওঠা মধুর নামের সর্বাণী !

দাঁইহাটা থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে এসে নাম জিজ্ঞেস করেছিল অনন্ত রাও। শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠেছে শুন্যে, বলেছে, যেমন মিষ্টি মেয়ে তুমি, তেমনি নামটাও !

শুনতেই মিষ্টি মেয়ে, সর্বনাশের বিষ লুকিয়ে রয়েছে রোমে রোমে।

শান্তাপুরে আসার পর তাকে নিয়েই নানান রটনা চলল গ্রামের অন্ধি-সন্ধি পর্যন্ত। নবাবী ফৌজির হাত থেকে ছিনিয়ে আনা মেয়ে। জাতিধর্ম-চরিত্র বলে কি আর কোন পদার্থ আছে ? বাঙলা দেশের মেয়ে তো—মোহিনীবিদ্যা-টিদ্যা জানে। আর তেমনি খেলোয়াড়ি বুদ্ধি।

কি খেলান না খেলাচ্ছে দু'দুটো মত্ত হস্তীকে নিয়ে ! হাতী দু'টো মত্ত হয়েছে কি আর এমনি এমনি—গুণতুকের খেলা এ সমস্ত। এদিকে মাধব রাও, ওদিকে অনন্ত রাও। সর্বাণীকে নিয়ে তো দু'জনেই চোখে সর্ষে ফুল দেখছে। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারছে না।

একজন অন্যজনের নাম শুনলে দপ ক'রে জ্বলে উঠেছে। মাধব রাও দাঁত কড়মড় ক'রে বলেছে, ছাইগাদায় শুইয়ে মুণ্ডুটা কচ্ ক'রে কেটে ফেলতে হয় তলোয়ারের এক ঘায়ে। মাটিতে রক্ত পড়লেই সর্বনাশ। আর একটা জন্মাবে। সঙ্গে সঙ্গে।

অনন্ত রাও বলেছে, এক বর্গী ফৌজের সংগ্রামী মানুষ দু'জনে ঠিকই। তা বলে মাথা কিনে নিয়েছে নাকি ! সর্বাণী লুটের জিনিস হ'ল কি করে ? ও তো ভয়ে পালিয়ে গেছল। নবাবীফৌজের দাপটে ও দিশেহারা সঙ্গছাড়া। বেআদপ-বেইমান কোন লজ্জায় বলে, সর্বাণীর তার সঙ্গিনী হওয়া উচিত।

মাধব রাও শুনে ফুঁসে ওঠে, ফেটে পড়ে আক্রোশে। বলে, অনন্ত রাও নিজেই বেসরম আদমি। চালনি ছুঁচের বিচার করেছে। লড়াইয়ে লুট যা, সবার সমান সমান ভাগ। ও সর্বাণীকে আটকে রাখার কে ? ও কি ওর স্বামী ?

অনন্ত রাও কপাল কুঁচকে বিরক্ত হয়ে বলে, বেকুবটার কোন কথা শুনতে আর ইচ্ছে করে না আমার। দলের লোকদের মানা করে দেয়। ওখানকার কথা আমার কানে তুলবে না মোটে কেউ, বলে দিচ্ছি। লুট আমি করিনি সর্বাণীকে, একটা বিপদাপন্ন মেয়েকে রক্ষে করেছি স্রেফ। ছত্রীরক্তের ধর্মপালন করেছি আমি। পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে উদ্ধার করেছিল, সহধর্মিণীর মর্যাদা দিয়েছে। আমি স্ত্রীর সম্মান দিতে পেছপাও নই।

উত্তরের বাতাস দক্ষিণে বইছে, দক্ষিণের উত্তরে। দু'পক্ষের কথাই ভাসছে, সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। লোকের মুখে মুখে কানে কানে ঘুরছে। মাধব রাও বলে বেড়াল, গ্রামে ঘরে অসতী যদি মৌরসিপাট্টা নিয়ে বসে থাকে—অমঙ্গল গ্রামের—আকাল এসে, পেটের অন্ন না জুটে মরবে সকলে।

বিবেকবুদ্ধির মানুষ অনন্ত রাও, হলেও কাঁহাতক সহ্য করা যায় ! এসব শুনলে,

কার মাথার ঠিক থাকে ? মরা মানুষও চিতার ওপর জ্যান্ত হয়ে উঠে বসবে তক্ষুনি। মাধব রাও বড্ড বাড় বেড়ে উঠেছে। সীমার শেষ কিনারে পেঁাছেছে। এমন কথা বলেছে, ওর রক্ত না দেখে জলগ্রহণ করত না—অন্য কেউ হ'লে। ঝগড়া-বিবাদের দিকে যেতে চায় না আর অনন্ত রাও। কেউ বা বলেছে, কদিনের জন্য মিথ্যে ব্যাপারটি বিসর্জন দিয়ে একটা মিটমাট ক'রে নেওয়া ভাল দু'জনের মধ্যে। দু'জনের হয়েই থাক সর্বাণী। মাধব রাওয়ের আপত্তি নেই যখন এতে, অনন্ত রাওয়েরও হবে না নিশ্চয়।

অনন্ত রাও এমনিতেই খুব চাপা মানুষ, অপরিসীম মনের দৃঢ়তা। সহজে টলে না। এবার টলল। বলল, ফের যদি আমার স্ত্রীর নামে যা-তা কথা শুনি, রক্ষে থাকবে না আর। শীগগির বিয়ে করছি সর্বাণীকে। সাবধান হয়ে বুঝে-সুঝে কথা বলে যেন এবার। তার কড়া হুকুম জানিয়ে দিল অনন্ত রাও লোক মারফত।

কানে পেঁাছতে, অট্টহাসি হেসে উঠল মাধব রাও। মুষিকের পর্বত হ'তে সাধ গেছে। বুকে দুম দুম ক'রে দু'টো ঘুষি মেরে গর্জন ক'রে উঠেছে, সর্বাণীকে বিয়ে করবে! বুকের পাটা আছে অনন্ত রাওয়ের! আছে, এই বান্দার—মাধব রাওয়ের। যত সব বুকনি—অনেক শোনা আছে অমন। ওই মেয়েকে ঘরে তুলবে ও! সকাল সন্ধ্যায় তো পার্বতী মালিনীর দরজায় ধন্না দিচ্ছে। বিয়ে ক'রে ঘরে তোলেনি কেন এতদিন ? বুজরুক কোথাকার ! তুলবো আমি।

সম্বন্ধ পাকা করার জন্য তলোয়ার পাঠিয়েছে মাধব রাও পরের ভোরে। ফেরত এসেছে সর্বাণীর কাছ থেকে। এ তলোয়ার রাখবে না সে। অনন্ত রাওয়ের বাগদত্তা সর্বাণী।

হুম্—বাঘের স্বর বার করেছে মাধব রাও গলা দিয়ে। তলোয়ারের দিকে দেখেছে আর চোখের আগুনে ভস্ম করতে চেয়েছে সকলকে। থরহরি কম্পমান সবাই। আকাশে নজর পড়তে প্রমাদ গুনেছে ওরা। ধুমকেতুর মতন কি যেন কি এটা দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট।

পার্বতীর কুঁড়েঘরে সর্বাণী রয়েছে মাসাধিককাল। তার যত্নের ত্রুটি করেনি পার্বতী। দেবীর মতন শ্রদ্ধা করেছে। কিন্তু একটা বিষয়ে সংশয় উঁকিঝুঁকি মেরেছে মনে বার বার। অনন্ত রাও দেরী করছে কেন ? বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে না কেন ? বলছে বটে ওদের একটু-আধটু অমত—আস্তে আস্তে চলে যাবে সেটা। পার্বতীর বিশ্বাস হচ্ছে না। আমীর-ওমরাহদের মন—দেরী হলে, ঘুরতে কতক্ষণ। তখন অতল তলে পড়বে সর্বাণী। রূপসী সর্বাণীর জীবনে কি আছে কে জানে ! ওকি সকলের মুখের গ্রাস হয়ে বেড়াবে ?

একজনের মুখের গ্রাস হতে চলেছিল, সে-গ্রাস ছিনিয়ে নিয়েছে অনন্ত রাও, আটকে রেখেছে এখানে। পেছনে লেগে রয়েছে মাধব রাও। চিলের মতন ছোঁ মেরে নিয়ে পালানোর জন্য অনবরত চেষ্টা। কি ক'রে বাঁচবে পার্বতী এই সব নরখাদক পুরুষদের হাত থেকে !

পার্বতী চেয়ে চেয়ে দেখে সর্বাণীকে আর ভাবে। ছোট বোন হৈমবতীর মুখখানা অনেকটা অমনি ধরনের। রুখতে তো পারেনি তাকে পাষণ্ড অনজিতের হাত থেকে, আটকাতে গেছে পার্বতী—সজোরে লাথি মেরেছে অনজিত বুকে। পার্বতী জ্ঞান হারিয়েছে।

হুঁশ হ'তে চোখ মেলে দেখে, বোন নেই ঘরে। কত খোঁজাখুঁজি—বোনের হদিস মিলল না ছ'সাত বছর বাদেও। লোকের চোখে কালো কলঙ্ক তারা। তাদের গুষ্টি। অপমান-লাঞ্ছনা সহ্য করে করে আর তিষ্ঠতে পারেনি জয়পুরে। জাতবেরাদারদের কি নির্মম ব্যবহার! তারা একঘরে।

তারা চলে এসেছে এখানে। বুড়ি দিদিমাকেও নিয়ে। একটা মস্ত সান্ত্বনা মস্ত ঐশ্বর্য পার্বতীর মালী। স্বামীর মত স্বামী। বোনের ঘটনা নিয়ে মালী তাকে অগ্রাহ্য করেনি কখনও কোনদিন। বরং মালী পার্বতী অন্তপ্রাণ হয়ে উঠেছে।

মালীকে পেয়ে মহাসুখী পার্বতী। জন্মজন্মান্তরে যেন এই স্বামীর পায়ে মাথা রেখে এয়োতির চিহ্ন সঙ্গে নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারে। দুনিয়ার মানুষ বড় অবিচারী।

কি মায়া মাখানো চোখ দুটো সর্বাণীর। খালি মনে পড়ে বোনকে। ভেতরটা হাহাকার ক'রে ওঠে। সময় সময় মনে হয় অন্ধকার রাতে ওকে এ দেশের বাইরে কোথাও রেখে আসে। তখুনি বুকটা কেঁপে ওঠে থরথর ক'রে। কোথায় রাখবে—কার কাছে রাখবে? মানুষ কই—জায়গা কই!

অনন্ত রাওকে কেমন কেমন ঠেকছে। সর্বাণীর দেবপুরুষ দেবতার এত মন্থর-গতি কেন বিয়ের ব্যাপারে! পার্বতী অস্থির হয়ে পড়ে। প্রতিক্ষণ তার কাছে প্রতি যুগ।

নিজের ভাগ্য নিজে বেছে নিচ্ছিল সর্বাণী—পালিয়ে যাচ্ছিল গহনরাতে—এ তল্লাট ছেড়ে। পার্বতীর চোখেই তো বাদ সাধল। আটকালো। সে যে প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ অনন্ত রাওয়ের কাছে। কেমন ক'রে ছেড়ে দেওয়া যায়! দু'হাত ধরে সর্বাণী কেঁদে বলেছে, দিদি, আমার মনে হচ্ছে, আমায় নিয়ে হুলুস্থুল হবে একটা। আমার মনের দেবতা মনে থাকুক—আমায় বিদায় দাও। ওকে অন্তত বাঁচাও বোন!

—সে হয় না। চারহাত দু'হাত ক'রে তবে ছাড়বো তোমায়। ভয় কি? মালী আছে, আমি আছি। রাওসাহেব কি কোন অবিচার করবে তোমার ওপর—মনে হয়?

কানে হাত চাপা দিয়ে বলে সর্বাণী, চন্দ্র-সূর্য মিথ্যে হলেও হ'তে পারে—রাওসাহেব হবে না। ওর বিষয় সন্দেহ হওয়া পাপ, সন্দেহের কথা শোনাও পাপ!

পার্বতী ঘরে নিয়ে এসেছে সর্বাণীকে। কিন্তু এখন কি করবে সে! তার নিজের দ্বিধাদ্বন্দ্বের কথাও সর্বাণীকে বলতে পারছে না এক অক্ষরও। যে পার্বতীর মতন ব্যথা পেয়েছে, সেই পার্বতীর যে কি যন্ত্রণা—বুঝবে। অন্য কেউ বুঝবে কেমন করে? ঘায়েল হি জানে ঘায়েল কি বাত, আউর না জানে কোই।

তলোয়ার ফেরৎ আসার পর থেকেই মাধব রাওয়ের এলাকা থমথমে হয়ে আছে দিবারাত্র। জোরে কথা কয় না কেউ কারো সঙ্গে। সব কথাই ফিসফিস আর কানাকানি। একটা কোন মারাত্মক গোপন ষড়যন্ত্র চলছে—বেশ বোঝা যায় লোকের মুখ দেখলে। সকলে সন্ত্রস্ত, সকলে শশব্যস্ত।

মনে মনে ভবানীদেবীর চিন্তা করে দিনরাত—হে মা জগদম্বে, সর্বাণীকে রক্ষে কর মা, অনন্ত রাওকে !

অমাবস্যার ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে ঘরের বাইরে পা বাড়ায় না বড় একটা কেউ। গুণীনরা অভিচার ক্রিয়া করে এই সময় শ্মশানে-মশানে। ওদের যজ্ঞের ধোঁয়া কখন কোনদিকে বয়—বোঝা তো যায় না। কারো গায়ে লাগলে ক্ষতি। শুধু কি তার ক্ষতি—তার সংসারের, তার আঠারো পুরুষের। সাধারণ লোকের ধারণা এই। চোর-ডাকাতেরাও মানে এদেশে।

কিন্তু মানেনি মাধব রাও। নিজের লোকদের বলেছে, কোন ভয় নেই। ও সব ভণ্ডদের প্রচার। অমাবস্যা তো মায়ের পুজোর সুবর্ণক্ষণ। আমাদের কার্যসিদ্ধি হবেই।

দলবল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে ঘিরে ফেলেছে সর্বানীর ডেরা। প্রথমে পার্বতীর বুক কেঁপে উঠেছে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপর স্থির হয়ে গেছে। পাথর যেন। পার্বতীর মনে হয়েছে, সর্বাণীকে মাধব রাওয়ের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না কিছুতেই। ওদের হাতে তুলে দেব কেমন ক'রে ? তার চেয়ে নিজে হাতে শেষ করে ফেলবে ওকে—ওরই মানসম্ভ্রম রক্ষের জন্য।

বুকের ভেতর থেকে চকচকে ছোরাটা বার করেছে পার্বতী। ছুটে গেছে সর্বাণীর কাছে। বুকের কাছে ছোরাটা নিয়ে গিয়েও বসাতে পারে নি। নিজের বুকে মোচড় দিয়ে উঠেছে। বোনের মুখ ভেসে উঠেছে সর্বাণীর চোখে। বলেছে, এটা রেখে দাও বুকের ভেতরে। ইজ্জত রক্ষের অস্ত্র।

এসেছে মালী। পার্বতীকে পরামর্শ দিয়েছে, চিৎকার করে মাধব রাওকেও বলুক—মালী দরজায় আটকাচ্ছে, বেরোতে দিচ্ছে না। সর্বাণী তোমার কাছে যাবার জন্য ছটফট করছে রাওসাহেব।

—কেমন করে হয় ! দরজা ভেঙে ওরা ঢুকবে। একথা শুনলে, তোমার আর রক্ষে নেই, দু'আধখানা করে ফেলবে যে তখুনি। এ আমি পারবো না।

—গোঁয়ার্তুমি কোরো না পারু। সর্বনাশ এসে গেছে দরজায়। অনন্ত রাওয়ের কাছে আমাদের প্রতিশ্রুতির কথা মনে কর। তোমাদের চিৎকারে ওদের দলবল দরজার দিকেই নজর দেবে—আমাকে পাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবে। এই অবসরে সর্বাণীকে পেছনের দরজা দিয়ে অনন্ত রাওয়ের বাড়ির রাস্তায় পাঠিয়ে দাও। আমার কথা রাখো। জয় ভবানী। দরজার পাশে এসে দাঁড়াল মালী।

পার্বতীর মুখের রক্ত সরে গেছে, সাদা শুকনো বাসি ফুলের রঙ। চিৎকার করতে গিয়ে দু'বার থমকেছে। তৃতীয়বার চিৎকার করে উঠেছে কান্নাভেজা গলায়।

দলের সব কটি মানুষ এক সঙ্গে লাথি মেরে, শাবলের ঘা বসিয়ে, দরজা ভেঙে

ফেলল মাটির ঘরের। মালী আটকেছে পথ। মুহূর্তে শত বিভক্ত হয়ে গেল মালীর দেহ। জলজ্যান্ত মানুষটাকে তলোয়ারের ঘায়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল সকলে মিলে।

পার্বতীর চোখের সামনেই ঘটনা ঘটল। দাঁড়িয়ে আছে পার্বতী। কাঠের পুতুল একটা। মালীর রক্ত নাইয়ে দিয়েছে ওকে। ওর এক চিন্তা, সর্বাণী যেন পেঁছে যায় অনন্ত রাওয়ের বাড়ি।

কাছে এসে জিজ্ঞেস করেছে মাধব রাও, সর্বাণী কই ?

কথা কয় নি পার্বতী। আঙুলের ইশারায় দেখিয়ে দিয়েছে শূন্য ঘর। কাঁপতে কাঁপতে মেঝেয় পড়ে চেতনা হারিয়েছে।

জ্ঞান হ'তে চোখ মেলে দেখেছে, কুঁড়েঘরে নেই পার্বতী। রয়েছে মাধব রাওয়ের খাসমহলে। নারীর যৌবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা যেখানে দিনে-রাতে! চতুর্দিকে তাকিয়েছে ভীত-সন্ত্রস্ত দৃষ্টি। এখানে সর্বাণী আছে নাকি, ধরা পড়েনি তো!

মাধব রাওয়ের কথায় তার সে চিন্তায় যবনিকা পড়ে গেছে। মাধব রাও বলেছে, সর্বাণী কোথায় গেল—জানো ?

—না। মনে মনে স্বস্তি অনুভব করেছে পার্বতী। সর্বাণীকে খুঁজে পায় নি তাহলে!

মাধব রাও বলল, তুমি যে বললে, সর্বাণী ছটফট করছে আমার কাছে যাবার জন্য ?

কি যেন কি চিন্তা করল পার্বতী। বলল, হ্যাঁ।

আমায় সর্বাণী তাই বলেছে। এক আধদিন নয়, যে কদিন ছিল—বলতে গেলে রোজই প্রায় তোমার নাম করেছে রাওসাহেব। তোমার জন্য তার মন বড় উতলা। তোমাকে দেখার পর থেকে ওই দশা তার। অনন্ত রাও বন্দী করে রেখেছে তাকে—কি করে মুক্তি পায় ? তোমার কাছে খবর দেয়া যায় কিভাবে ? আমি নাচার! আমিও তো অনন্ত রাওয়ের নজরবন্দী।

—সবই মানলুম, তাহলে পালাল কেন ? তোমার খিড়কির দরজা খোলা ছিল। জানি না—মালীর অবস্থা দেখে, ভয় পেয়ে পালিয়ে যেয়ে থাকে যদি, আমাতে আমি তখন ছিলাম না রাওসাহেব।

—মালী না আটকালে পার্বতী—মরতো না। যাক, যা হবার হয়ে গেছে—সে তো আর ফেরার নয়। তোমার ভাবনার কিছু নেই—আমি তো রয়েছি মালীর কাছে থাকার চেয়ে এখানে শতগুণ সুখে থাকবে তুমি।

পার্বতী শিউরে উঠেছে।

মাধব রাও বলেছে, আচ্ছা পারু, সত্যিই সর্বাণী আমার জন্য অস্থির হ'ত ?

বিষণ্ণ মুখে হাসি টেনে পার্বতী বলেছে, সত্যি। প্রমাণ আমি দিতে পারি।

—যদি আমায় বিশ্বাস করে ছেড়ে দাও। সর্বাণী যদি অনন্ত রাওয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠে থাকে—যদি বেঁচে থাকে রাওসাহেব—আমি মিলন ঘটাবো তোমার সঙ্গে। এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো।

দিন চারেক বাদে পার্বতীকে ছেড়েছে মাধব রাও। খবর নিয়ে জেনেছে সর্বাণী সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে রয়েছে—মরেনি। অনন্ত রাওয়ের বাড়িতে। বিয়ে করেছে অনন্ত রাও। অসীমদাস বাবাজী নতুন নামকরণ করে দিয়েছে যশোমতীবাঈ।

হাসতে হাসতে বলেছে পার্বতী, কোন ভাবনা নেই রাওসাহেব। যশোমতী-বাঈকে তোমার পাশে বসাবো আমি। তোমার মতন আমার আপনজন আর কে আছে বল দুনিয়ায়! মন-দেহ সঁপেছি তোমার হাতে—গোপন ইচ্ছে ছিল বহু-দিনের, সে আশা পূরণ করেছো আমার—তুমি নিজ হাতে। তোমার এ ঋণ শোধ করা যায় না রাওসাহেব। যশোমতীকে পেলে, তুমি সুখী হবে—এতে আমিও সুখী।

খাসমহল থেকে ছাড়া পেরে বুড়ি দিদিমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে পার্বতী। দিদিমা বলেছে, এলি কি ক'রে কালামুখী। আমি জানি মরেছিস। মরবি কেন—এসব মেয়ে তো মরে না। অখণ্ড পরমায়ু। যমের অরুচি!

পার্বতী হেসে বলেছে, আমি সুখী দিদু। আমার সুখে তোমার জ্বলুনি! ভাবতে পারিনি।

—মুখে আগুন তোর সুখের। মর মর মর।

—বোলো না ওকথা। মুখে আর এনো না। আমার সুখের এই তো সবে সন্ধ্যে—সারা রাত্তির বাকি এখন। ফুলের মালা গাঁথতে বসে গেছে টুকরি টেনে নিয়ে।

—মিছে মালা গাঁথা তোর। দেবতার গলায় চড়িয়ে পাপ বাড়াস নি আর! একে তো পাপের পাঁকে ডুবে আছিস!

—দেবতার গলায় এ মালা যাবে না। যাবে যশোমতীবাঈয়ের গলায়। পাপীর স্পর্শ দেবীর গলায়।

হেসে কুটি কুটি হয় পার্বতী।

যশোমতীবাঈয়ের কাছে পার্বতীর অবারিত দ্বার। পার্বতীর জন্যই সে অনন্ত রাওয়ের ঘরণী। পার্বতীর ত্যাগের তুলনা হয় না। মালীর ত্যাগের তুলনা হয় না। পার্বতী বেঁচে মরা, মালী মরে অমর।

নিত্য ফুলের মালা গেঁথে নিয়ে আসে পার্বতী যশোমতীবাঈয়ের জন্য। যশোমতীবাঈ দেখে, হাসে। ফুলে ফুলে যশোমতীবাঈ আর মাধব রাওয়ের নাম লেখা। জিজ্ঞেস করে—এমন মালা গাঁথা শিখলে কি করে দিদি?

—শিখিনি তো। পাতার কাঠামো করে দেয় মাধব রাও। আমি ফুল বসিয়ে বসিয়ে গেঁথে যাই খালি।

রোজই যশোমতীর সংবাদ জানাতে আসে পার্বতী মাধব রাওয়ের খাসমহলে। নিত্যনতুন রাজপুতানীর সাজে সাজিয়ে দেয় মাধব রাও। বলে, স্বর্গের অপ্সরী বুঝি বা তোমার রূপ দেখে লজ্জা পাবে। হীরে জহরতে মুড়ে দিয়েছে মাধব রাও। পার্বতী সাজে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে আর বলে, রাওসাহেব, যেদিন এই মহলে আমার বোন যশোমতীবাঈকে নিয়ে এসে তুলতে পারবো—

সেদিন আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। দুই বোন দু'পাশে বসবো। কত সুন্দর দেখাবে তোমায় রাওসাহেব।

লাল চুনির আংটিটা খুলে পার্বতীর মাঝের আঙুলে পরিয়ে দেয়। লাল রঙ তোমার আঙুলে মানায় খুব।

—মানালে কি হবে—বড্ড বড় যে!

—ঠিক আছে, এখন খুলো না। ছোট করে দিলেই হবে। হ্যাঁ, একটু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা কর যশোমতীবাঈয়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার। ওর মতন আমার মনও দেখার জন্যে ছটফট করছে খুব।

—দু'একদিনের মধ্যেই নিয়ে যাবো তোমায়। গুপ্তদ্বার দিয়ে। কথাবার্তা হয়ে রয়েছে সমস্ত যশোমতীবাঈয়ের সঙ্গে।

গভীর রাত।

রাজপুতানী পার্বতী রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে। গুপ্তদ্বার দিয়ে ওপরের দালানে নিয়ে এসেছে মাধব রাওকে। অনন্ত রাও নেই। রঘুজী ভোঁসলের আদেশে গেছে আবার বাঙলাদেশে বর্গীর দলের সঙ্গে। এই সুযোগ। শরীর খারাপ, পরে যাব বলে—উপস্থিত যাওয়া স্থগিত রেখেছে মাধব রাও। পার্বতী ঘরের খবর এনে দিচ্ছে, ওর সঙ্গে পরামর্শ করেই রেখেছে।

তেমন বুঝলে যশোমতীবাঈকে নিয়ে ও আসবে। অনন্ত রাও এসে দেখবে—বুদ্ধি কার বেশী। বুদ্ধির খেলায় জিতেছে কে! মেয়েরা মাধব রাওকেই চায়, গোমড়ামুখো অনন্ত রাওকে চায় না। ধরে বেঁধে প্রেম হয় না। যশোমতীবাঈ-ই তার নজির।

পাশাপাশি চলেছে দু'জনে। মাধব রাও আর পার্বতী। গায়ে গা ঠেকে যাচ্ছে। পার্বতী খুশী, খুশী মাধব রাও-ও। তবে দেখা না হওয়া পর্যন্ত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা যাচ্ছে না। মনটা অস্থির অস্থির করছে।

দালান মাড়িয়ে, বাঁকের মুখ ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল পার্বতী। দালানের মতন এখানেও সারি সারি প্রদীপের ঝাড় জ্বলছে দুধারের দেওয়ালে। মিঠে আলোয় যেন রহস্যপুরী হয়ে উঠেছে জায়গাটা।

সাজসজ্জায় আর আলোর আভায় অপরূপা দেখাচ্ছে পার্বতীকে।

জিজ্ঞেস করল মাধব রাও, নিচে কেন পার্বতী? যশোমতী তো ওপরে থাকে বলেছে?

হ্যাঁ। ভবানীদেবীকে প্রণাম করে শুভকাজে অগ্রসর হওয়া ভালো। যশোমতীবাঈয়ের সঙ্গে দেখা করা, নিয়ে যাওয়া—শুভকাজ ছাড়া আর কি! এজন্যে দেবীর আশীর্বাদ প্রয়োজন।

—এত কাছে এসে একটুখানি সময় তো—এতে এমন দেরী হবে না। এইটাই আসল।

মন্দিরে প্রবেশ করল পার্বতী। বলি দেওয়ার তলোয়ার কপালে

ছোঁয়ানোর নাম করে সজোরে বসিয়ে দিল গলায়। মুখে চিৎকার করে জয় ভবানী।

ফিনকি দিয়ে রক্ত ছিটকে গেল পাথুরে দেবীর ঠোঁটে। বলির তলোয়া
নিজেকেও বলি দিল পার্বতী মালিনী—রাজপুতানী পার্বতী।

অমৃতাবাঈ দেখছে ভবানী-মন্দিরে বসে বসে। এখান থেকে সিঁড়ি, ওপরে
দালান পরিষ্কার দেখা যায়।

যশোমতীবাঈ দেবী-ভবানীর মূর্তির সামনে এলো বুঝি। তরতর ক
সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো যেন।

ঢং-ঢং আওয়াজে সচেতন হয়ে উঠল অমৃতাবাঈ। রাতের শেষ প্রহর। ঠি
এই সময় পার্বতীকে দেবীর সামনে বসে স্মরণ করতো যশোমতীবাঈ ও
মৃত্যুদিনে।

এই সময় পার্বতী আত্মবলি দিয়েছে দেবী মন্দিরে।

যতদিন বেঁচেছিল যশোমতীবাঈ—পালন করে গেছে। বংশের ওপর নির্দে
দিয়ে গেছে—বড়বৌ পালন করে যেন ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমী তিথির রাতে।

কত পুরুষ চলে গেছে। আজও সেই দিনটি পালন করে চলেছে বংশে
বড়বৌ। অমৃতাবাঈয়ের পালা এবারে।

অমৃতাবাঈ দেবীর দিকে তাকাল। পার্বতীর মুখ কেমন ছিল জানে না
তবে মনে হচ্ছে, যেন দেবীর মুখে পার্বতীর মুখ হাসছে!…

দুই

সেই পাইনের জঙ্গল। সম্পূর্ণ পাহাড়ী পথ। পাশে মরণ খাদ। দিনের বেলাতেই রাতের অন্ধকার। রুদ্ধনিশ্বাসে আমি আর অর্জুন মিশ্র চলেছি দু'জনে। এই গা ছমছমে রাস্তায় মানুষ দিশেহারা হয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষার আগেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

এই সর্বনেশে রাক্ষুসে জায়গায় পুষ্পক এসে পড়েছিল সেদিন। এসে পড়েছিল জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে।...

গম্ভীর স্বর শুনলুম কার। পাইনের জঙ্গল থেকেই ভেসে এলো। আমি দেখতে পাচ্ছি না কাউকে। ঘন সবুজ অরণ্যে কালো ছায়া পড়েছে একটা। সন্ধ্যে নামছে। আবহাওয়াটা ঠাণ্ডা হয়ে উঠছে ক্রমে।

ডাঃ শর্মার স্যানাটোরিয়ামে যাবো, যা নির্দেশ দেওয়া ছিল—কিছু চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না। ভুল পথে এসে গেছি মনে হচ্ছে। ধারে কাছে কোন লোক বসতি বা কোন গ্রাম নজরে আসছে না।

আবার কণ্ঠস্বর শুনলুম, এদিকে নয়—ডাইনে বেঁকে—এগোও।

আমার মনে হল, যে বলছে, আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না। নিশ্চয় বনের মধ্যে থেকে বলছে। আমি যদি গাছের ফাঁকে ফাঁকে গলে গিয়ে ভেতরে পেঁছিতে পারি, ঠিক রাস্তার হদিসটা ভালোভাবে বুঝে নিতে পারবো। আর ভুলভাল হবে না। নিশ্চিন্ত মনে গন্তব্যস্থলে পেঁছে যাবো তাড়াতাড়ি।

গাছের ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকছি। সপ্তমে চড়া স্বর—পাহাড়-বন কেঁপে উঠল থর থর করে। বেশ ধমকের সুরেই বলল আমায় নেপথ্যলোকের লোক।—বারণ শুনছো না কেন? এদিকে নয়।

একবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হ'ল—কোনদিকে ভালো করে বলুন না আর একবার। পারলুম না। যা ধমক খেয়েছি, হৃৎকম্প হচ্ছে এখনো। ভেতরটা ভীষণ গুড়গুড় করছে। দাঁড়িয়ে থাকতে আর মন চাইল না আমার। বরাত ঠুকে ডানদিকেই পা বাড়ালুম। পাহাড়ী পথ—উঁচু-নিচু, সংকীর্ণ সরু। এ দিকে বিপদ প্রতি পদক্ষেপে। আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেতে হচ্ছে। চোখের সামনে আর অন্য রাস্তা দেখছি না। খুব সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে চলছি।

খানিক যাওয়ার পর, একটা থমথমে ভাব অনুভব করলুম আমি। অজানা ভয় একটা আমার পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে নামা-ওঠা করছে। আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছি। কোনটা ডাইনে কোনটা বাঁয়ে—বুঝে উঠতে পারছি না। কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে একটু দাঁড়িয়ে রইলুম। কিন্তু কতক্ষণই বা আকাশের তলায় এভাবে

দাঁড়িয়ে থাকা যায়। বাধ্য হয়েই পা বাড়ালুম ডাইনে কি বাঁয়ে না বুঝেই।

আবার সেই কণ্ঠস্বর।

আগেরটা মনে হয়েছিল, ওইটাই বুঝি সপ্তগ্রাম। এর ওপর ওঠার নেই আর আমার ধারণা ভুল। এ স্বর আগের চতুর্গুণ। আকাশ ফাটানো যাকে বলে এবারে স্বরটা একবার শুনলুম না। বার চারেক। জানিনা প্রতিধ্বনি, না অজ্ঞাত-অদৃশ্য মানুষ চারবারই হুঁশিয়ার করল আমায়। বলল, ডানদিক। যেখানে পা বাড়াচ্ছো—চোখ খুলে দ্যাখো ভালো করে।

জায়গাটা বেশ অন্ধকার অন্ধকার। কিছু চোখে পড়ছে না। অথচ কে, দেখতে পাচ্ছি না। রহস্যময় পুরুষ আমাকে ভুল নির্দেশ দিয়ে আমায় কব্জায় রাখতে চাইছে না তো! হয়তো ওর দুরভিসন্ধি আছে কোন। কাছে যা কিছু আছে—কেড়ে নিয়ে ফতুর করার মতলব। আমি ওর নির্দেশ শুনে চললে ওর খপ্পরের অতলে তলিয়ে যাবো। আর ওর কোন কথা নয়। সামনে এসে বলতে যার সাহস নেই—সে কেমনতর লোক! ভালো নয়—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলুম, ওর কথা শুনবো না। এভাবে শুনে, হয়রান শেষে রাতের ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে জমে যাই আর কি!

আবার পা বাড়াতে যাচ্ছি, শত আর্তকান্না শুনে চমকে উঠলুম, দাঁড়ালুম থমকে। এবার দেখতে পাচ্ছি আমি। অন্ধকারে চোখ ফুঁড়ে দেখছি কে যেন ঘাড় ধরে দেখাচ্ছে। বিরাট মরণখাদ একটা আমার পায়ের তফাতে। আমি পেছিয়ে এলুম তখুনি। মৃত্যু আমাকে গিলে ফেলত মুহূর্তে। কি বাঁচান বেঁচে গেছি। পাহাড়ের গায়ে দেহ এলিয়ে দাঁড় আছি।

আর অগ্রসর হয়ে দরকার নেই। মরিবাঁচি এখানেই রাত কাটাবো। পথ চলা শুরু করবো। রাতভোর থাকলেও—মরণের হাত থেকে বেঁচে। যখন—আর মরণ হবে না। যে অলক্ষ্যে থেকে আমায় সাবধান করেছে, সে না হোক—মেরে ফেলতে যে চায় না এটা নিশ্চিত। মনে আবার ভিন্ন চিন্তারও উদয় হচ্ছে। মরে গেলে ওরই তো লোকসান। এখনো হাতিয়ে পারে নি তো এক কপর্দকও।

এই সুযোগে আসবে। ওর মনস্কামনা পূর্ণ করে, খেলনার পুতুলের আমার টুঁটিটি টিপে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে খাদে অনায়াসে।

আমি নিরুপায়। এটা আমার বিদেশ। এখানে আসার জন্য বিশেষ করেছে আমায় আমার বন্ধু অর্জুন মিশ্র। বিলেতে একসঙ্গে দু'জন এব থেকেছি, একসঙ্গে খাওয়া, একসঙ্গে শোওয়া—মায় সব কিছু।

আমি অর্জুনের চেয়ে অনেক আগে গেছলুম। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া শেষ গেছে আমার। কৃতিত্বের ছাপ নিয়ে দেশে ফিরছি। পুলকে টুইটম্বুর বিদায় নেওয়ার পালা সারছি বন্ধুবান্ধব মহলে, হাত দু'টো চেপে ধরে অর্জুন, পুষ্পক, আমার এ কথাটা তুই অতি অবিশ্যি রাখবি—কথা দে।

আমি বললুম, বল আগে—না শুনে কেমন করে কথা দি রে ! তুই তো
মায় চিনিস—সম্ভব হ'লে—রাখবো, নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস ।

অর্জুন ডাক্তারি পড়তে গেছে । ওর শেষ হয় নি এখনো । ওর মামা ডাঃ শর্মা
-যার স্যানাটোরিয়ামের খোঁজে আমার এখানে আসা—সেই মামা ডাক্তারি
পূর্ণ না করে—'পাদমেকং ন গচ্ছামি' মনোভাব নিয়ে বিলেতের মাটি আঁকড়ে
ড়ে থাকতে হবে—বলে দিয়েছে । মুখ উজ্জ্বল করে দেশে ফিরলে, মামার ইচ্ছে
রণ হবে ।

মামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানিয়ে দিতে বলেছে অর্জুন—মামার ইচ্ছেই পূর্ণ
রে দেশে ফিরবে সে । তবে মামাকে দেখার বাসনাটা এত প্রবল হয়ে ওঠে মাঝে
ঝে, নিজেকে রোখা দায় হয়ে পড়ে । মনে হয়, চলে যায়

বাপ মরা ছেলে অর্জুন ।

মামা নিজে ডাক্তার—তাই বড্ড সাধ—অর্জুন বড় ডাক্তার হয়ে আসুক বিলেত
থকে । অনেকের নিজের বাবাও ছেলের জন্য এতখানি ভাবে কিনা সন্দেহ ।

অর্জুন মামার চিঠি পায় । যা লেখে সে, তার জবাব নয় সেটা । মামুলি
কে বাঁধা কথা স্রেফ । তাও দু'চারটের বেশী নয় । পনের দিন বাদে বাদে
কখানা করে চিঠি পায় । একই বয়ান একই ভাব । —এখানে আসার জন্যে
স্থির হবে না মোটে । আমি ভালো । মনযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবে ।

এত অল্প কেন ? অর্জুনের সন্দেহ হয়—মামা অসুস্থ নিশ্চয় । এইটুকু ছাড়া
বেশী লেখার ক্ষমতা নেই । তাকে অসুখ গোপন করে রেখেছে ।

তাই বন্ধুকে অনুরোধ—মামার সঙ্গে দেখা করে আসল খবর জানায় যেন ।

আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি । এসেছিও । কিন্তু এমন বিপদে পড়েছি যে
হতব্য নয় । আমি আর চিন্তা করতে পারছি না । আমার স্নায়ু দেহ—সব
হয়ে আসছে । বসে পড়লুম আমি পাহাড়ে হেলান দিয়ে ।

অবাক হয়ে দেখছি দীর্ঘদেহী পুরুষ একজন আমার সামনে দিয়ে চলে গেল ।
র সুমুখটা দেখতে পেলুম না । পুরো পেছনটা দেখছি । ঘাড়ের কাছে একটা
—ার চেন হার অন্ধকারেও চিকচিক করছে ।

দাঁড়িয়ে পড়ল পুরুষ ।

একটু কাত হয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকল । আমি যাবো না ভেবেছি, কিন্তু
পড়েছি একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে । মন্ত্রমুগ্ধের মতন অনুসরণ করেছি ওই
ও আমায় না ছুঁয়ে আমার হাত না ধরে—তফাতে তফাতে থেকেও
হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যেন আমায় ।

আমি চলেছি ডাইনে বেঁকে বাঁয়ে, আবার ডাইনে আবার বাঁয়ে আবার
এবার সিধে ! পাশের পাইনগাছের আড়ালে চলে গেল পথপ্রদর্শক ।
ম অবাক । ডাঃ শর্মার স্যানাটোরিয়ামের সামনে দাঁড়িয়ে ।

দোতলা দেবদারু কাঠের বাড়ি । চতুর্দিক ঘিরে আপেলগাছ আর রঙবেরঙের
ফুলের বাগিচা ? চমৎকার পরিবেশ, মনোরম জায়গা । আলো জ্বলছে লনে ।
প্রত্যেক ঘরের লাল-নীল-হলুদ নেটের পরদা ফুঁড়ে রঙিন আলোর ফুল-

খুশি ফুটছে বাইরেও।

কাঠের বাড়ির দেয়ালে কত না সুন্দর সূক্ষ্ম কারুকার্য। গোটা রামায়ণ-মহাভারতকে ছোট্ট করে এঁকেছে শিল্পী কাঠের খোদাইয়ে বিচিত্র ঢংয়ের ছবির রেখায়। এত ভালো লাগছে আমার—স্বর্গের নন্দনপুরীতে এলুম বুঝি—

ভাবছি, কাকে ডাকি! পথের দুর্ভোগ বিদায় নিয়েছে মন থেকে। তবে আশ্চর্য লোক বিদায় নেয় নি। মনে দাগ কেটে বসেছে ওর চলন-বলন। যাই হোক, আমার ভাবনার দরজায় ঘা মেরে সচেতন করে তুলল একটি নেপালী মুখ।

দরজা খুলে মুখ বার করেই বলে উঠল, সাব আয়া হ্যায় ?

আমি মনে করলুম, চিঠি দিয়ে অর্জুন জানিয়ে দিয়েছে হয়তো। বললুম, হুঁ।

নেপালী জওয়ানটি বেরিয়ে এলো। আমার দিকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে কিছুক্ষণ। নিজে নিজেই ঘাড় নাড়ল। বলল, নহি, নহি। হামারা সাব নহি। আপ হামারা সাব কো দেখা ? দেখা সড়ক মে ?

আমি বলতে যাচ্ছি, কাকে যেন দেখছি—ওর সাব কিনা—জানি না। মনের কথা মুখেই রয়ে গেল। বেরোল না আর। দোতলার জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে একটি সুবেশা-সুন্দরী তরুণী মিঠে গলায় বলল, বাহাদুর, ভেতরে যাও! ভদ্র-লোকের সামনে পাগলামো করো না আর।

আমায় লক্ষ্য করে মৃদু হেসে বলল, ও পাগল। কোন পেশেণ্ট আছে কি ?

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলল আবার, যাচ্ছি নিচে। আপনি ভেতরে আসুন।

ভেতরে ঢুকতেই দেখি, সারি সারি চেয়ার পাতা একদিকে। করিডোরের অন্য দিকটা ফাঁকা। মেঝেতে নরম লাল-কাশ্মীরী কার্পেট। দেয়ালে ডাঃ শর্মার ছবি টাঙানো। এই ছবিরই ছোট্ট কপি দেখেছি আমি অর্জুনের পার্সের মধ্যে। ও নিজে বার করে, মাথায় ঠেকাত রোজ সকালে। ঘুম থেকে উঠে দুচোখ খুলেই মাথায় বালিশের তলা থেকে পার্সটা টেনে নিত।

বলত, আমার মামা দেবতা। পুষ্পক, কখনো যদি দেখা হয়, দেখবি কি মানুষ! নিজের মামা বলে বলছি না। কি অমায়িক কি প্রাণখোলা—সরল শিশু।

অর্জুন ভাগনে বলে ডাঃ শর্মা ওর সামনে নিজেকে শ্রদ্ধেয় করার কোন চেষ্টা করেনি কোনদিন। বন্ধুর মতন খোলাখুলি সব কথাই বলত। নিজের অতীত জীবনের গোপন কথাও বাদ যায় নি।

ডাঃ শর্মা বিয়ে করতে চেয়েছিল মাধুরীকে। মাধুরী যে কোন অজুহাত দেখিয়ে বিয়ের প্রস্তাব নাকচ করলেও করতে পারত। ডঃ শর্মা নির্বিবাদে সরে আসত। এমনই মানুষ—কোন ক্ষোভ-দুঃখ-অভিমান-দাবি—কিছুই করত না।

শর্মার চরিত্র মাধুরীর নখদর্পণে। তবু কেন শর্মার বুকে নির্মম আঘাত হানার আশ্রয় নিল, ভাবতেও বিস্ময় লাগে। এ পরিহাসে কি আত্মতৃপ্তি পেল—ও নিজেই জানে।

শর্মাকে বিদ্রুপের তীক্ষ্ন বাণ ছুঁড়ে মারল হাসতে হাসতে মাধুরী—ডাক্তারিতে

সারও তো জমে ওঠে নি এখনো। সাগর ছেঁচে রত্ন তোলার সাধ হয় কেমন রে—আশ্চর্য!

কাশতে কাশতে বমির ভান করেছে।—আমার সাজসজ্জা স্নো-পাউডার রাগানোর ব্যবস্থা আছে জমার খাতায়? কদিনের মতো? তারপর তো কাবলি-ওলার কাছে হাত পাততে হবে।

ডাঃ শর্মা মৌনমুখে মাথা নিচু করে বসে আছে দেখে সেটাও সইতে পারল মাধুরী। মুখের আগল এমনভাবে খুলল, যে কোন লোক—যার গায়ে দ্রতার চামড়া আছে এতটুকু, বসে থাকবে না, পালিয়ে বাঁচবে।

মাধুরী ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠেছে, লজ্জাসরমের বালাই যদি একটুও থাকে। রুষের প্রেম-টেম বিশ্বাস করি না আমি। যত সব ভণিতা। আমার কাছে য়সাই প্রেম। বুঝলে—পয়সা।

টেবিলের ওপর একটা ঘুষি মেরে, বসার ঘর থেকে ওপরে উঠে গেছে মাধুরী। টবিলে কাচের ফুলদানিটা উল্টে পড়েছে। জলে ভিজে উঠেছে টেবিলক্লথের ানিকটা জায়গা। আলগা গোলাপের তোড়াটা মুখ থুবড়ে পড়ে ধুঁকছে। ক'টা াপড়ি খসে পড়েছে।

আসার সময় তোড়াটা এনেছে শর্মা। বাসিফুল ফেলে দিয়ে নিজেই গুঁজে দয়েছিল তরতাজা ফুল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, ফুলের তোড়াটা তুলে নিয়ে, শর্মা বেরিয়ে গেছে ঘর থকে।

আগ্রার বাড়িতে আর থাকে নি।

দেশে দেশে ঘুরেছে আমীর বনার উদ্দেশ্যে। দেখিয়ে দেবে মাধুরীকে। অর্থ পার্জন কাকে বলে।

লক্ষ্মী যখন আসে, যশ যখন আসে কোথা দিয়ে কেমন ভাবে আসে কেউ লতে পারে না। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে বুদ্ধির ঘরে বৃহস্পতি এসে বসে। মানুষ লো মুঠি ধরতে সোনা মুঠি ধরে। মানালীতে এসে তাই হ'ল শর্মার।

স্বাস্থ্যকর স্থান। ধনীদের আগমন। স্যানাটোরিয়াম করলে কেমন হয়? াবাও যেই করাও সেই। আস্তে আস্তে স্যানাটোরিয়ামের নামডাক ছড়িয়ে পড়ল তুর্দিকে। ভিন্ন দেশের মানুষের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগল ডাঃ শর্মার ্যাতি।

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল ডাঃ শর্মার। শর্মা ধনী, শর্মা গুণী। তার স্যানাটো-রিয়ামে কি সুব্যবস্থা কি সেবাযত্ন! বিদেশেও আপনজনের সঙ্গ পায় লোকে। নে হয় না স্যানাটোরিয়ামে—নিজের বাড়িতে যেন। অসুস্থ মানুষকে সুস্থ রে তোলার কি প্রাণপণ চেষ্টা শর্মার।

রাতেও ঘুমোয় না লোকটা। প্রত্যেকের ঘরে এসে নিজে দেখে যায় স্বচক্ষে। ার কি সুবিধে, কার কি অসুবিধে। তার ডাক্তার নার্সরা ঠিক মতো কর্তব্য ালন করছে কিনা।

ডাঃ শর্মার ধন্যি ধন্যি মানালীর আকাশে বাতাসে মাটিতে পাহাড়ের চুড়োয়

ঘুরে ফেরে। টাকা যেমন আসে, তেমনি সদ্ব্যবহারও হয়। শর্মা গাঁয়ের লোকের, গরীবের মা বাবা।

এখনো আমি শর্মাকে দেখিনি। চেয়ারে বসে বসে ছবি দেখছি আর অর্জুনের কথা ভাবছি। ছবির চোখেই স্নেহের কাজল টানা যার, তার এমনি চোখ না না জানি কত সুন্দর। আমার ভাগ্য—একজন মহান লোকের সঙ্গে দেখা হবে আজ।

তরুণীর কথায় সচেতন হয়ে উঠলুম। পাশে দাঁড়িয়ে বলছে, কি দেখছেন? উনি আমার স্বামী। আমি মিসেস কোহিনুর শর্মা। আপনি?

আমি কে—কেন এসেছি, পরিচয় দিলুম। শুনে কোহিনুরের মুখখানা কি রকম হয়ে গেল। কয়েক পল মাত্র। হেসে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ। শর্মার মুখে শুনেছি বটে। বড় ভালো ছেলে। আমাকে অর্জুন চেনে না। ও যখন বিলেতে—আমাদের বিয়ে হয়েছে।

প্রথমেই তরুণীর মুখে 'আমার স্বামী' কথাটা শুনে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছি। কারণ অর্জুনের কাছে শুনেছি—শর্মা অবিবাহিত। সেই শর্মা বিয়ে করল, অথচ চিঠিপত্র দেয়াদিয়ি চলছে—একবারও অর্জুনকে জানাল না। আজ অবধি নয়। মাধুরীর কথা যে সবিস্তারে বর্ণনা করে ভাগনেকে শোনাতে পারে, সে এটা চেপে গেল কেন?

আর শুনেছি যা—শর্মার বয়েস হয়েছে। এই বয়সের মেয়ের সঙ্গে—আমি আকাশ থেকে পড়লুম। যাক গে থাক—এদের ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে আমার চিন্তা না করাই উচিত। যে জন্যে এসেছি, সেই কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলে সরে পড়াই ভালো।

আমি দেখা করতে চাইলুম শর্মার সঙ্গে। একটু কথা আছে, আর অর্জুনের চিঠিটাও দেব।

কোহিনুর বিমর্ষ মুখে খানিক চুপ করে থেকে বলল, মাস চারেক হ'ল—উনি এখানে নেই। কোথায় গেছেন, কোথায় আছেন—কিছুই জানি না। বড় দুর্ভাবনায় রয়েছি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি, খবর পাইনি কোথাও। এখনো।

আমি বললুম, সে কি! উনি তো এখানকার ঠিকানা দিয়েই অর্জুনকে চিঠি লিখেছেন। আমি চলে আসার দু'তিন দিন আগে।

তাই নাকি? কোহিনুরের দু'চোখে বিস্ময়। জলে ডুবে গেল চোখের তারা। বলল, দেখুন, আমাদের একখানা লিখলে—দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাই।

চেয়ারটা টেনে মুখোমুখি বসল কোহিনুর। সন্ন্যাসিনীর বেশে। গেরুয়া শাড়ী গেরুয়া জামা। রুক্ষ চুল। পিঠ অবধি ছড়ানো। বিষণ্ণ হাসি মাখানো ঠোঁটে। কি বলতে যাচ্ছিল, বেহালার বাজনা কানে যেতে অস্থির হয়ে উঠে পড়ল।—মাপ করবেন, আমি এখুনি আসছি। ওঘরের পেশেণ্টকে দেখে আসি একটু। আমি গিয়ে না খাওয়ালে—ও আবার খাবে না কিছু। রাতভোর উপোস করে থাকবে। আপনি আমাদের এখানে দু'চার-দিন থাকুন না। অর্জুনের মামি যখন, তখন আপনারও তো।

নিশ্চয়-নিশ্চয়। আমাকে আর আপনি বলে লজ্জা দেবেন না।

ঠিক আছে। বদিয়াকে দিয়ে তোমার শোওয়া-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তোমার এখন বিশেষ দরকার একটু বিশ্রাম।

দ্রুতপায়ে চলে গেল কোহিনূর।

যে ঘরে বদিয়া আমায় নিয়ে এলো, বেশ সাজানো-গোছানো। কাঠের দেয়ালে সবুজের ঝরনা। এমন জীবন্ত রঙ আমি দেখিনি কোথাও। গোটা ঘরটায় তিরতির করে বইছে যেন। দেয়ালে-দেয়ালে শর্মার নানা ভঙ্গীর ছবি টাঙানো। কোনটায় প্যাণ্ট-কোট পরনে, কোনটায় ধুতি-পাঞ্জাবি। একটা ছবি কোহিনূরের সঙ্গে। টেবিলে বসানো। প্রত্যেক ছবিকে ছবি বলে মনে হচ্ছে না আমার। আমি প্রাণের পরশ পাচ্ছি। ওই একটা ছাড়া—কোহিনূরের সঙ্গে। ও ছবিটা কেমন নিষ্প্রাণ।

বদিয়ার কাছ থেকে জেনেছি, ঘরখানা শর্মার। ছিমছাম ঘরে একজন শোওয়ার খাট পাতা একখানা। নরম গদিতে সবুজ-সুজনী বিছানো।

বিছানায় বসতে দ্বিধা আসছে আমার। ইতস্তত করছি! কোহিনূর ঘরে ঢুকল। দাঁড়িয়ে কেন?

—ডাঃ শর্মার ঘর এটা। বদিয়া ভুল করেই বুঝি নিয়ে এসেছে আমায়।

—ভুল নয়, আমিই এই ঘরে আনতে বলেছি।

একটা দমকা নিঃশ্বাস ফেলে, গলা নামিয়ে বলল কোহিনূর, কোন অতিথি এলে, উনি নিজের ঘর ছেড়ে দিতেন। উনি এসে শুনলে খুশী হবেন খুব।

একটু আনমনা হয়ে পড়ল কোহিনূর। উদাসীন দৃষ্টি মেলে ধরল ওর নিজের পাশে দাঁড়ানো শর্মার ছবির ওপর।

ওপাশের ঘরে বেহালায় একটা করুণ সুর বেজে উঠল। ঘরে শূন্য প্রাণের হাহাকার প্রতিটি ছবির পায়ে মাথা খুঁড়ে মরছে। সব কটি ছবিতে চোখ ঘুরল কোহিনূরের।

আমার মুখে এসে থমকেছে। টস টস করে জল ঝরছে দু'চোখ উপচে। আমারো চোখের কোণ জ্বালা জ্বালা করছে। এমন পতিপ্রাণা স্ত্রীকে না জানিয়ে শর্মার আত্মগোপন করে থাকার কোন মানে হয় না।

অল্পক্ষণের আলাপ—তাতেই যেটুকু বুঝেছি, কোহিনূর স্বামীর ধারা অনুপস্থিতিতেও পুরোমাত্রায় বজায় রেখেছে। রাখতে চেষ্টাও করছে ত্রুটিহীন ভাবে। শর্মাহীন যজ্ঞে—যা দেখছি, ভেঙে পড়ছে, কিন্তু অতি কষ্টে নিজেকে সংযত রেখে কর্তব্য সাধন করে চলেছে। কোহিনূর রূপসী হলেও গেরুয়া বসন। দেখে মনে হয় খুব শান্তিপ্রিয়, শান্ত। এ মেয়ে ঝগড়া-বিবাদ করতে জানে না। বেশীর ভাগ মেয়ের জীবনে প্রসাধনটাই সর্বস্ব। এর কিন্তু তার লেশ-মাত্র নেই। এমন স্ত্রীকে—

জানি না মনের কথা বোঝার কোন বিদ্যা জানে কিনা কোহিনূর। নিজেই চোখের জল মুছতে মুছতে ধরা গলায় বলল, চলে যাওয়ার মাসচারেক আগে থেকেই কেমন হয়ে গেছলেন উনি। এক সাধুর কাছে দীক্ষা নিলেন। তারপর

গেরুয়া বসন পরে দিনরাত ধ্যানধারণা শুরু করে দিলেন।

কোহিনুর নিজের শাড়ীর দিকে তাকাল। —ওঁর দেখাদেখি আমিও সব ত্যাগ করলুম। স্ত্রী সহধর্মিনী। স্বামীর ধর্মই তার ধর্ম, স্বামীর কর্মই তার কর্ম। ওঁর মতন খাওয়া-দাওয়া, আমিও একাহারী হলুম। উনি বলেছিলেন, কোহিনুর, আমার গুরুদেবের কাছে তুমি দীক্ষা নিয়ে যাও। গুরুদেব তো এক জায়গায় থাকার লোক নয়—কখন কোথায় চলে যায়। মানুষের জীবনের ভরসা কি? নিঃশ্বাসে নেই বিশ্বাস। সময় থাকতে পরকালের কাজ সেরে রাখা ভালো। মৃত্যুটাই তো আসল সত্য। একথা অস্বীকার করা যায় না। আমি বললুম, তুমিই আমার যথার্থ গুরু। দীক্ষা নিতে হয়, তোমার কাছেই নেব। আনন্দে ওঁর মুখে একটা অসাধারণ জেল্লা ফুটে উঠেছে। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখেছি শুধু। পরদিন, সকালে উনি আমায় দীক্ষা দিলেন। তারপর, আসছি বলে বেরিয়ে গেছেন স্যানাটোরিয়াম থেকে। সেই ওঁর যাওয়া।

এতক্ষণ অন্য রাজ্যে চলে গেছেন কোহিনুর। আমিও ওর সঙ্গে এক সর্ব-ত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীর জীবনবেদ শুনছিলুম।

কোহিনুর সচেতন হয়ে উঠল। একি বাবা, তুমি দাঁড়িয়ে এখনো! আশ্চর্য ছেলে তো তুমি!

সত্যি কথা বলতে কি বসতে খেয়াল ছিল না আমারো। বসলুম আমি। বললুম, আপনি চেয়ারটায় বসুন না! আপনিও তো দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

মৃদু হেসে বলল কোহিনুর, দাঁড়িয়ে থাকাই আমার কাজ যে বাবা। এখানে যারা আসে, নানা রোগে ভুগে-ভুগে দুর্বল হয়ে পড়ার পর ওরা যাতে সবল-সুস্থ হয়ে দেশে ঘরে ফিরে যেতে পারে সেই চেস্টাই করতেন উনি। ঘুরে ঘুরে তত্ত্বাবধান। আমারো সেই ডিউটি বাবা। চলে যাওয়ার ক'দিন আগে বলতেন, কোহিনুর, তোমার দায়িত্ব অনেক। যারা আসবে মায়ের স্নেহ ঢেলে দেবে তাদের। আমি জানি—তোমায় না বললেও, সেটা তোমার কাছ থেকে পাবেই।

আমার পাশের ঘরে পাগলের মতন হা-হা করে কে হেসে উঠল। আমি চমকে উঠেছি। একটা ব্যথার ছোঁয়া লাগা পবিত্র পরিবেশ ভেঙে খান খান হয়ে গেল।

কোহিনুর চঞ্চল হয়ে পড়ল। বলল, ভদ্রলোকের একমাত্র ছেলে হারিয়ে এই দশা। কখনো হাসেন কখনো কাঁদেন। কখনো স্বাভাবিক একেবারে —বেশ ভালো কথা কন। বলেন, ছেলে আমার যাবে কোথা! যম দেহ নিয়েছে, তার আত্মাকে নিতে পারে নি তো। আত্মা যে অমর। যম ঠকেছে খুব। এই চিন্তা এলেই উনি হেসে ওঠেন। আমি যাই বাবা ওঁর কাছে একবার।

কোহিনুরের মতন এমন এমন স্নেহ-মমতায় ভরা মাতৃমূর্তি সত্যিই খুব বিরল। কোহিনুরের পা ছুঁয়ে নমস্কারের জন্য নিচু হয়ে হাত বাড়াতেই বুঝতে পেরে পা সরিয়ে নিয়েছে। বলছে, ও কি বাবা! তোমার মধ্যেও নারায়ণ রয়েছে। তুমি আমি ভিন্ন নই। বুদিয়াকে দিয়ে খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ঘুম ভালো হচ্ছিল না আমার। নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ। ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়েছি বিছানায়। যতবার চোখ বুজতে যাচ্ছি, ততবার শর্মার প্রত্যেক ছবি কটি এক এক করে ভেসে উঠছে। এতে আমার কোন অস্বস্তি নেই, বরং দেবতাদর্শনের মতন দর্শন করছি। আর কোহিনুরের কর্তব্যজ্ঞান জপমালা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই চলছে আমার শুয়ে শুয়ে।

রাত গড়াচ্ছে, চতুর্দিকে নিশুতি। একটু তন্দ্রার ঘোর চোখের পাতায় ছুঁই ছুঁই করছে সবে, দরজায় টোকার আওয়াজ শুনলুম আমি। দরজা খুলতেই দেখি, সেই নেপালী যুবক—বাহাদুর।

চনমন করে তাকাল পেছন দিকে। সন্দেহ ভঞ্জন করে নেওয়ার জন্য কি যেন দেখে নিল। কানের কাছে মুখ এনে খুব চাপা গলায় ফিস্-ফিস্ করে বলল, সাব, হম পাগল নহি। মেমসাব যা বলল আপনাকে ঠিক নয়। আমার সাব আসে। আমি দেখেছি। এ বাড়ীতে ঢোকে না! ওই মেমসাবের জন্য, ওই সজ্জন গুপ্তার জন্য। সাব আমায় দার্জিলিং থেকে নিয়ে এসে লড়কার মতন মানুষ করেছে। রুগী দেখতে গেলে, আমাকেই সঙ্গে নিয়ে গেছে। ওরকম মালিক হবে না সাব। রাস্তায় আমার সাবকে দেখেছেন কি?

বাহাদুর! পাগলপন মত কর—শোনে দেও সাব কো। কোহিনুরের কণ্ঠস্বর।

বাহাদুর চমকে উঠে দৌড়ে পালাল।

দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে কোহিনুর। আমাকে দেখে হাসল। হাতের ইশারায় দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়তে বলল।

আবার বেহালার সুর শুনছি আমি। সুরের এমন মাদকতা আমার ভেতরটা ছুটে যেতে চাইছে কোন অজানা দেশে। একটা দলা পাকানো ব্যথা বুকের তলায় খিল খিল করে হেসে উঠছে যেন যন্ত্রণা চাপতে। হাসিতে কান্না ঝরছে।

আমার চোখে ঘুম আসছে না। আর তাছাড়া আমার ঘুমোতেও ইচ্ছে করছে না মোটে। জেগে বসে আছি আমি। আবার দরজায় টোকা। খুলবো না মনে করেও, খুললুম। বাহাদুর নয়। একজন অচেনা লোক। কম আলোয় মুখখানা কি বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে। যেন একটা প্রেতাত্মা।

গাল ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি, সজারুর কাঁটার মতন গোঁফ। কাঁচায়-পাকায় মেশানো। উসকো খুসকো চুল। দু'কষ বেয়ে রক্তের মতন পানের পিক গড়াচ্ছে। বলল, ও, নতুন অতিথি! নিজের পরিচয় নিজেই দি মশাই।

গলা খাঁকারি দিয়ে শ্লেষ্মা-ঘর্ঘর গলা সাফ করে নিয়ে বলল, দেয়ার ইজ সামথিং রঙ্। বাহাদুর পাগল নয়। মিসেস শর্মা হাজারো বার বললেও আমি বিশ্বাস করি না। এই স্যানাটোরিয়ামের মধ্যে—ওরই মাথার ঠিক আছে।

লোক-চরিত্র জানতে আর বাকি নেই আমার। আজ না হয় রিটায়ার্ড হয়েছি, ভগ্নস্বাস্থ্য, হলে কি হবে, ভিমরতী হয় নি আমার এখনো। বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পায় নি মোটে। পুলিশ-ইন্সপেক্টোরি লাইনে দীর্ঘদিনের এক্সপিরিয়েন্স নিয়েই বলছি।

কোহিনুরের ডাকে সচেতন হয়ে উঠল ইন্সপেক্টর। কোহিনুর সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলছে, ইন্সপেক্টর সাব! ওঁকে একটু বিশ্রাম করতে দিন, প্লীজ।

ইন্সপেক্টর চলে গেল।

আমাকে বলল কোহিনুর, বড্ড জ্বালাতন করছে এরা তোমাকে! তুমি আর কাউকে দরজা খুলো না। কাল সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব'খন।

বাহাদুর-ইন্সপেক্টর এরা আমায় দোনামোনায় ফেলে দিয়ে গেল। এরা সত্যি পাগল—না, নয়? নিজের মনকে নিজেই আমি প্রশ্ন করেছি, যতক্ষণ জেগে থেকেছি।

ক্রমশ স্যানাটোরিয়াম একটা রহস্যপুরী মনে হয়েছে আমার কাছে। একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুম ভাঙল বেহালার করুণ কান্নায়। আমার ভেতরও একটা অজ্ঞাত যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

এবারে আর টোকা মেরে কেউ দরজা খোলায় নি আমায়। আমি নিজেই শুয়ে থাকতে পারলুম না। দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লুম করিডোরে। পায়ে পায়ে এগোলুম ওপাশের ঘরের দরজায়, বেহালায় কান্না শুনছি যেখান থেকে।

ঘরের দরজা দুহাট ক'রে খোলা। স্প্রীংয়ের লোহার খাটে পা ঝুলিয়ে বসে বেহালার ছড় টানছে দ্রুতলয়ে বাদক। আমি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে শুনছি লক্ষ্য নেই।

পেছনে এসে দাঁড়াল কোহিনুর।

কারো অস্তিত্ব অনুভব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘাড় ফিরিয়েছি। ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে ইঙ্গিতে কথা কইতে বারণ করেছে কোহিনুর।

আড়ালে ডেকে নিয়ে এসে বলল, ওঁর পা দুটো পড়ে গেছে। ইনভ্যালিড-চেয়ার ছাড়া নড়া-চড়ার উপায় নেই। এখানে আছেন অনেকদিন। পছন্দ করেন না বাজনার সময় কেউ কাছে আসুক। তুলকালাম করবে। ক্ষেপে পাগল, রেগে আগুন। বাড়ির সঙ্গে বনিবনা নেই ওঁর এই জন্যে। এই জন্যেই উনি এখানে থাকেন। জীবনে অনেক দুঃখু পেয়েছেন উনি। বাজনাই ওঁর স্ত্রী-পুত্র কন্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিয়ে করতে চাননি একদম।

অতি দ্রুত লয়ে বাজছে বেহালা। উৎকর্ণ হয়ে শুনল খানিক কোহিনুর। —দ্যাখো, বলতেও লজ্জা। আমি নিজে মেয়ে, তবু মেয়ে জাতটাকে ঘেন্না করি! বিমলাপ্রসাদের সুযোগ নিতে কসুর করে নি রাধামালা। এমন ভাব দেখাল— বাজনা শুনে পাগল। বিমলাপ্রসাদ তাকে চরণে ঠাঁই না দিলে আত্মঘাতী হবে সে নিশ্চিত। বিয়ে হ'ল, ঘর বাঁধা আর হ'ল না।

বুক ভাঙা নিঃশ্বাস ফেলল কোহিনুর।

বিয়ের পর ঝগড়ায় ঝগড়ায় ব্যতিব্যস্ত করে মেরেছে রাধামালা বিমলাপ্রসাদকে।

দিনরাত বাজনা-বাজনা, তার ওপর কোন টান নেই। সংসার স্ত্রী রসাতলে যাক, কোন খেদ নেই। বাজনা নিয়ে উনি মশগুল হয়ে থাকবেন। দেখাচ্ছে সে। একদিন বিমলাপ্রসাদের অনুপস্থিতে বেহালা ভেঙে রাস্তায় ফেলে দিল রাধামালা।

কোহিনুর ঘরটার দিকে তাকিয়ে আবার বলতে শুরু করল।—নিদারুণ আঘাত পেয়েছে বিমলাপ্রসাদ। স্নায়ুগুলো দুমড়ে-মুচড়ে নিস্তেজ নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। সায়েটিকায় আক্রান্ত হ'ল দুটো পা-ই। প্যারালিসিসের মতো অবশ, ক্ষমতা-বিহীন। চিকিৎসা ইনজেকশনে পায়ের বল ফিরে পেল, কিন্তু পর পর তিনবার সায়েটিকার আক্রমণে দুটো পা-ই অকেজো হয়ে গেছে। সুর বাজনাই সম্বল ওর। এমন দেবতাতুল্য স্বামীকে হেলায় হারাল রাধামালা। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে!

বড় বড় জলের ফোঁটা চোখের কোণে টলমল করছে কোহিনুরের। পরের জন্যে এত দুঃখ যার—এ সাক্ষাৎ দেবী—কখনোই মানবী হ'তে পারে না।

ও ঘরের বাজনা থেমেছে। ইনভ্যালিড চেয়ারে বসে, হাতল ঘোরাতে ঘোরাতে বেরিয়ে এলো বিমলাপ্রসাদ।

মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল। দাড়ি-গোঁফ কামানো। টকটকে না হোক, বেশ ফর্সা। মাঝ বয়েসী হলেও যৌবনের লালিত্য চোখে-মুখে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। আপন মনে গুন গুন করে করে কি একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে এদিকে আসছে।

আমাদের দু'জনকে—আমাকে আর কোহিনুরকে দেখেই ভূত দেখার মত চমকে উঠল। মুখে কালি ঢেলে দিল যেন কে নিমেষে। মুখের আদলটাই পালটে গেল বুঝি। গলা দিয়ে একটা বিকৃত স্বর বেরিয়ে এলো। চিৎকার করে বলে উঠল, কে আপনি! স্ত্রীজাতিকে বিশ্বাস করবেন না মশাই। আমি ভুক্তভোগী। কি হাল হয়েছে আমার আমিই জানি। অন্যে কি বুঝবে বলুন—অন্যে কি বুঝবে!

বিমলাপ্রসাদ অসহায় শিশুর মতন কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল আবার ঘরে।

কোহিনুর সান্ত্বনার বাণী শোনাল আমায়। বাবা, দুনিয়া বিচিত্র। ঈশ্বরের সৃষ্টি বড় বিচিত্র। কেন কাউকে সুখী করেন, কেন কাউকে দুঃখী—ক্ষুদ্র জীব আমরা বুঝবো কেমন করে বাবা! এই তাঁর লীলা। আমাদের হাসিয়ে কাঁদিয়ে। তাই বলি, আর যাই কর প্রভু, মোরে ত্যাজিও না কভু!

ঝর ঝর করে পড়ল কোহিনুরের চোখের জল। বেহালার রাগিণীতে বেজে উঠল হতাশার নিঃশ্বাস। ভেসে এলো কানে পুত্রশোকে কাতর পিতার অট্টহাসি। যম তুমি ঠকেছো, ঠকেছো! দেহ নিয়েছো, খোকার আমার আত্মা নিতে পেরেছো কি? আত্মা যে অমর। দুয়ো যম, তোমায় দুয়ো। গো হারান হারছো তুমি। লজ্জা, লজ্জা!

গলায় কর্কশ স্বর শুনতে পাচ্ছি ইন্সপেক্টরের।

—দেয়ার ইজ সামথিং রঙ্, রঙ্, রঙ্।

বাহাদুর থেকে থেকে আওয়াজ দিচ্ছে। ঘুমিয়ে কি জেগে, বলতে পারছি না। তবে ঘুমিয়েই বোধহয়। জড়ানো কথা। জাতা হুঁ সাব। মত্ জাইয়ে, মত্ জাইয়ে।

মাথাটা আমার কি রকম করছে। এ আমি কোথায়! হালকা বাতাস ভারী হয়ে উঠছে। একটা অজ্ঞাত অস্বস্তিতে আমি অস্থির হয়ে পড়ছি। আমার মাথার মধ্যে সব ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। চিন্তা প্রশ্ন ধারণা কি দারুণ ঘুরপাক খাচ্ছে।

চোখের সামনে স্পষ্ট কিছু দেখছি না আমি। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। দু'ধারের রগের শির তিড়িং-তিড়িং করে লাফাচ্ছে। অসহ্য যন্ত্রণা। মাথাটা খসে পড়ে আর কি! আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।

একটি সৌম্যদর্শন ধুতি পাঞ্জাবি পরনে লোক এসে আমার হাত ধরে বলল, ভাইসাব, ঘরে চলুন! রাত অনেক, শুয়ে পড়ুন এবার। আমাদের রাত জাগতে হয়, এখানকার অনেক পেশেন্ট রাতে জাগেন দিনে ঘুমোন বলে।

লোকটির সহানুভূতির পরশে আমার শরীর-মন জুড়িয়ে গেল। ঘরে নিয়ে এলো আমায়। বিছানায় বসিয়ে দিয়ে, চেয়ারে বসল নিজে। হাসিমুখে বলল, আমি সজ্জন গুপ্তা। স্যানাটোরিয়ামের ওষুধ-বিষুধ আনা-নেয়ার জন্য বাইরে বাইরেই থাকতে হয় বেশীদিন। এসে, শুনেছি, আপনার কথা মিসেস শর্মা বলেছেন। ডাঃ শর্মা কি বন্ধনে যে ফেলে গেছেন বলার কথা নয়।

বাইরে শোঁ-শোঁ আওয়াজ হচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাস স্যানাটোরিয়ামের কাঠের দেয়ালে আছড়ে-আছড়ে পড়ছে। ডাঃ শর্মার প্রত্যেক ছবি ক'টা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

বেশ বিচলিত দেখাচ্ছে সজ্জন গুপ্তাকে। বলল, আমি যাই। পেশেন্টদের ঘরে দরজা-জানলা ঠিক-ঠিক বন্ধ আছে কিনা দেখি গে। দরজা বন্ধ করে, র‍্যাগটা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ুন। কাল সকালে দেখা হবে আবার। গুড নাইট।

আজ তিনদিন হ'ল রয়েছি আমি। কোহিনুরের যত্নআত্তিতে বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না। কোহিনুর শুনে বলেছে, প্রতিপদ থেকে নবরাত্রি পড়ে গেছে তো। আজ পঞ্চমী। আর পাঁচটা দিন বাকি মাত্র। দশেরাতে এখানে বিরাট উৎসব। এখানকার উৎসবের নতুনত্ব আছে। তাই আশ্বিন মাসে বাইরে থেকে অনেকেই আসে। এসে পড়েছ, না দেখে ফেরা উচিত হবে না একদম। আর তোমায় এর মধ্যে ছাড়ছেই বা কে!

কৌতূহল চাপতে না পেরে, বলে ফেললুম, নতুনত্ব কি একটু বলুন না। আমাদের এলাহাবাদেও তো খুব হয় দশেরা উৎসব।

হ্যাঁ, হয় সব জায়গাতেই। এটা সম্পূর্ণ আলাদা। মধ্যমপাণ্ডব কে জানো তো? ভীম। ভীমের স্ত্রীকে নিয়ে উৎসব—হিড়িম্বাদেবীকে নিয়ে কি ঘটা! কি বিশাল মিছিল। দেখার মতন।

মনস্থ করলুম দেখেই যাবো।

দেখে যাওয়ার জন্য সজ্জন গুপ্তাও অনুরোধ করল। সজ্জন গুপ্তা আমার কাছে মাঝে মাঝে এসে সুবিধে-অসুবিধের খোঁজ-খবর নিয়ে যায়। সে দিনের বেলাতেও যেমন রাতেও তেমন। ওর সুন্দর মুখের মিষ্টি হাসি মিষ্টি কথা আমায় মোহিত রাখে। মানুষটি বড় আমুদে। যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ ওর

দিকে মন-চোখ আটকে থাকবেই। আমি বলেছি, আপনার মধ্যে একটা চুম্বকের শক্তি আছে। সকলের ভেতর মেলা ভার।

সলজ্জ মুখে, খুব বিনয়ের সঙ্গে সজ্জন গুপ্তা বলছে, কি যে বলেন—আমি বুঝি না। আপনাদের সেবা করা—পারি যদি একটুখানি আনন্দ দেয়া—এ সব তো আমার জীবনের ব্রত। আপনাদের যে আমাকে ভালো লাগে—এটাই আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার। ঈশ্বরের অসীম দয়া।

কোহিনুর-সজ্জন গুপ্তা আমার চোখে আদর্শ। কোহিনুর তপস্বিনী, সজ্জন গুপ্তা তপস্বী। এদের আতিথেয়তা এদের নিষ্ঠা এদের সেবাব্রত—সমস্ত কিছু অর্জুনকে লিখে জানাবো।

নিস্তব্ধ নিঝুম রাতে চিঠি লিখতে বসলুম আমি। প্যাডের কাগজে কলমটা ঠেকিয়েছি সবে, দরজায় মৃদু টোকা। প্রথমটায় খুলি নি। আলোটা নিভিয়ে দিলুম বরং। আলো না দেখলে, যে এসেছে, ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে ফিরে যাবে।

ফিরল না, টোকা চলল একনাগাড়ে। বিরক্তির এক শেষ। ভদ্রতার মাথা চিবিয়ে খেয়েছে, এমন লোক তো নেই কেউ স্যানাটোরিয়ামে। এ কে? বেজার মুখে দরজা খুলতেই দেখি, বাহাদুর। দাঁত বার করে হাসছে। সর্বশরীর জ্বলে উঠেছে আমার। পাগলামোর একটা সময় আছে, একটা সীমা আছে।

বাহাদুর মুখ দেখে আঁচ করেছিল কিছু। বলল, সাব, আমি পাগল নই।

রেগেই আমি বললুম, নও তো নও। এখন যাও—আমি ঘুমোবো।

দু'টো পাল্লায় হাত রাখতে যাচ্ছি, দরজা বন্ধ করবো। তার আগেই বাহাদুর ভেতরে ঢুকে পড়ল। নিজেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, ক্ষমা করবেন সাব। আপনি আসার পর থেকে, রাতে ঘুমোতে ঘুমোতে উঠে পড়ছি আমি কেবল। অর্জুন সাবের দোস্ত জেনে অবধি—একটা জিনিস না দেখিয়ে পারছি না আমি। আমি তিনদিনই আমার সাবকে স্বপ্নে দেখছি। সাব বলছে, ওই সাবকে দেখাও, ওই সাবকে দেখাও। নিয়ে আসবো?

পাগলের প্রলাপ ভেবে, বাহাদুরকে হটানোর জন্য বললুম, এখুনি—আজ দেখাতে হবে না কিছু। আমি রয়েছি ক'দিন। একদিন তোমায় ডাকবো'খন।

বাহাদুর সজোরে ঘাড় নেড়ে বলল, না সাব।

—না সাব বললে কি হবে—আমার ভালো লাগছে না এখন কোন কিছু। আমাকে নিয়ে পড়েছো কেন—তোমার মেমসাব-সজ্জনসাবকে দেখাও গে না।

বাহাদুরের মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে। অনুনয় ক'রে বলল, দোহাই সাব, ওদের কানে একথা তুলবেন না। আমার সাবের মানা।

এখুনি তো তোমায় মেমসাব ডাকবে। সজ্জন গুপ্তাও ডিউটিতে আসবে।

বাহাদুরের শুকনো মুখে হাসি ফুটল। —না সাব, কেউ আসবে না। সজ্জন সাব যে ক'রোজ থাকবে—মেমসাব বেরোবেনা ঘর থেকে।

—কেন?

—সে কথা পরে। স্যুটকেসটা নিয়ে আসি আগে।

বিদ্যুৎগতিতে গেল আর এলো বাহাদুর। কালো রঙের ছোট্ট স্যুটকেস

হাতে। ঘরের সমস্ত জানলা-দরজায় কুলুপ এঁটে দিল বাহাদুর ভেতর থেকে, খুব সন্তর্পণে খুব সাবধানে।

ওর কথাবার্তায় অসংলগ্ন উক্তিই শুনেছি আমি। ওর আচার-ব্যবহার অদ্ভুত লাগছে। কে জানে স্যুটকেসের ভেতর কি সাপ-ব্যাঙ আছে! পাগল পেয়ে বসেছে আমায়। না দেখালে, ওর যেমন স্বস্তি নেই তেমনি না দেখলে আমারো নিস্তার নেই। ওর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ছটফট করছি আমি, অথচ উপায় নেই। কেবল মনে মনে কোহিনুরের নাম জপ করছি। বাহাদুরকে ডাকলেই আমার রেহাই।

অদৃষ্টে দুর্ভোগ থাকলে খণ্ডাবে কে! অন্য সময় বাহাদুর ঘরের দোরে এসে দাঁড়ালেই, ডাকে। আজ ডাকছে না। বলছে না, বাহাদুর পাগলপন মত্ কর। সাব কো শোনে দেও।

এই বন্ধ ঘরে পাগলের কব্জায় পড়ে ওই কথা শোনার জন্য আমি যে কি উদগ্রীব হয়ে উঠেছি, তা শুধু আমি ছাড়া অন্য কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির জানার জো নেই।

বাহাদুর স্যুটকেস খুলে, কাঁপা হাতে একখানা মোটা কালো মলাটের লম্বাটে ধরনের খাতা তুলে দিল আমার হাতে। কান্নাভেজা গলায় বলল, সাব আমায় যত্ন ক'রে রাখতে বলেছে। অর্জুন সাব এলে, তার হাতে তুলে দিতে। লুকিয়ে লুকিয়ে কত আর রাখবো সাব, পারছি না। আপনি অর্জুন সাবকে দিয়ে দেবেন।

একটু চুপ করে থেকে বাহাদুর বলল, আমার সাব আসে, আমি দেখেছি। এখানে ঢোকে না। দূরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। দূর থেকেই চলে যায়। কাছে যেতে গেছি ছুটে কতবার। বাধা দিয়েছে মেমসাব। বলেছি, সাবকে পাকড়ে নিয়ে আসি। মেমসাব যেতে দেয়নি। বলেছে, পাগল কোথাকার। আমি দেখছি না, তুমি দেখছো! তাজ্জব ব্যাপার! চোখের দোষ হয়েছে।

খাতাটা খুলতেই আমি অবাক হয়ে গেলুম। ভেতরে একটা ডীড্ অফ গিফটে'র দলিল। অর্জুন মিশ্রের নামে।

বাঁদিকের লাইনটানা পাতায় ডাঃ শর্মা কি সব লিখেছেন। বাহাদুরের দিকে চেয়ে দেখি, ও নিষ্পলকে তাকিয়ে আছে। বসতে বলে পড়তে শুরু করলুম আমি।

ডাঃ শর্মা লিখেছে।—লিখতে গিয়ে মাধুরীর কথা না এসে পারে না। মাধুরীর অভিশাপ ফলল, না আমার দর্প চূর্ণ হল বুঝতে পারলুম না।

মাধুরীর বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের পর ভেবেছিলুম ও আমায় মন থেকে মুছে ফেলে দিয়েছে চিরজন্মের মতন। কিন্তু তা নয়, মাধুরী আমায় ভোলে নি। আমার খোঁজ-খবর—আমি না জানলেও—রেখেছে গোপনে। যশ-অর্থের চরম শিখরে যখন আমি, ও এলো এই স্যানাটোরিয়ামে। বলল, আমি এখনো অপেক্ষা করে রয়েছি তোমার জন্যে।

বলল, তোমায় সেদিন ফিরিয়ে দিয়ে যে আঘাত দিয়েছি, না দিয়ে উপায় ছিল

না আমার। তোমার বাড়ির আর আমার বাড়ির লোকেরা আমায় লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় শেষ করে ফেলছিল। তুমি কল্পনাবিলাসী, অবাস্তব মনোভাবের লোক। তোমাকে নাকি আরো অবাস্তব করে তুলেছি, ঘরকুনো করে তুলছি। তোমার জীবনটা আমিই নাকি বরবাদ করতে বসেছি, আমি একটু কড়া হ'লে, তুমি বিশ্বের ধনদৌলত মুঠোয় পুরে নিয়ে আসতে পারো—এ বিদ্যে আছে তোমার। তোমায় অবহেলা দেখানোর জন্য উৎসাহী ক'রে তুলেছে সকলে আমায়। আজ সত্যিই তুমি বড় হয়েছো। সকলের মতন আমারো আনন্দের সীমা-পরিসীমা নেই। সেদিন অনিচ্ছাকৃত দুঃখ দেবার জন্য ক্ষমা চাইছি।

ডাঃ শর্মা মাধুরীর কথায় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দুলেছে। লেখার মধ্যে তাই ধরা পড়েছে। লিখেছে, মাধুরীর চোখের জল অনুতাপ ক্ষমা চাওয়া—সব আমার কাছে জোলো মনে হয়েছে, এ সমস্ত বানানো। আমার বৈভবের টানেই ও এসেছে।

পরক্ষণেই ওর চোখের দিকে তাকাতেই মনে হয়েছে, সত্যি সত্যিই মাধুরী নিজের কষ্ট বুকে চেপে, ওর দুর্ব্যবহারে আমাকে দুর্জয় ক'রে তুলতে চেয়েছে। মাধুরীর মত আপনজন দুনিয়ায় আর কেউ নেই আমার। মাধুরী মহীয়সী।

মাধুরী সম্বন্ধে আমার দুর্বলতা বরাবরই। ওর ব্যক্তিত্বকে আমি ভালোবেসেছিলাম। সেই মাধুরী নিজে এসে ধরা দিতে চাইছে আমায়। কম সৌভাগ্যের কথা নয়। ঘরণী করবার ইচ্ছে প্রকাশ করতে গিয়েও পারলুম না। সদ্যবিধবা বোন এসে ঘরে ঢুকল। কদিন এসেছে। এই বোনটি সকলের ছোট। আমার অতি প্রিয়। দেখেশুনে আমিই বিয়ে দিয়েছিলুম, সুখী হবে। হ'ল না। বরাত ভাঙল। মায়ের পেছু পেছু অর্জুনও ঢুকেছে ঘরে।

মা-ছেলেকে দেখে, মনে হল এদের ঘর ভেঙেছে, আর আমি ঘর বাঁধতে যাচ্ছি। কি নিষ্ঠুর আমি, কি স্বার্থপর! আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলুম মাধুরীকে। বললুম, এখন বিয়ে-থা করা অসম্ভব আমার পক্ষে। মাথায় মহাদায়িত্ব। অর্জুনকে মানুষ করে তুলতে হবে। আশা করি, তুমিও এটা চাও।

মাধুরী হ্যাঁ-না কিছু বলে নি। মুখের পানে চেয়েছে একবার। জলে ডবডবে হয়ে উঠেছে দু'চোখ। তবু হেসেছে। আসি বলে, বিদায় নিয়ে চলে গেছে।

নিজেকে সামলাতে কি কষ্ট যে পেয়েছি আমি, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না তা।

মাধুরী-পর্বের ছেদ পড়ে গেল চিরদিনের মতন এখানেই। আর আসে নি কখনো, চিঠিতেও বিরক্ত করে নি কখনো।

দীর্ঘদিন পর যে এলো, তার বিষয় লিখতেও আমার মাথা লুটিয়ে যাচ্ছে বয়েসও হয়েছে, অর্জুনকে বিলেতে পাঠিয়েছি মাসছয়েক, এমন সময় কোহিনুর।

বয়েসে অনেক তফাৎ। আমার ঠিক সময়ে বিয়ে হলে, মেয়ের বয়সী। সজ্জন ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো। অনাথ, এদেশ-ওদেশ ক'রে মরছে, পেটের

অন্ন জোটাতে পারছে না। রূপ আছে, সকলে অসৎ পথে টানতে চায়। ও বলে, ভিক্ষে মেগে খাবো সেও ভালো।

সজ্জন গুপ্তা বলেছে, যেখানে এসে উঠেছি আমরা, সেই বাড়িটার দোরগোড়া পড়ে আছে তিনদিন। ও অসুস্থ। আপনার উদার মনের কথা শুনেছি এখানে অনেকের মুখে। দয়া করে সুস্থ হয়ে ওঠার ওকে যদি একটু সুযোগ দেন এই স্যানাটোরিয়ামে—কৃতজ্ঞ থাকবো। খরচ যা পড়ে—আমিই না হয় দেব। আপনার যাতে কোন ক্ষতি না হয়—

আমি বললুম, সেজন্য কোন চিন্তা করতে হবে না আপনাকে।

কোহিনূর রয়ে গেল। চিকিৎসার কোন রোগই দেখা গেল না তার। আমি ছুটি দিলাম। ও যেতে চাইল না। বলল, চতুর্দিকে লোভী কুকুররা ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাকে লক্ষ্য ক'রে। আমার মাংসের ওপর লোভ ওদের। আমাকে পেলে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। না রাখতে চান, আমার আত্মঘাতী হওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই আর। মজুরানীর কাজে রাখলেও এখানে আমার শান্তি। মহতের আশ্রয়ে তবু নির্ভয়ে থাকতে পারবো।

ডাঃ শর্মা লিখেছে, কোহিনূরের চোখে জল দেখে, আমার ভেতরটা গলল বললুম, তুমি রুগীদের দেখাশোনা করো তাহলে।

মাঝে মাঝে এসেছে সজ্জন গুপ্তা।

আমার মহানুভবতার তারিফ করেছে। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়ায় ভূরি ভূরি প্রশংসা ধন্যবাদ জানিয়েছে। এই প্রশংসা এই ধন্যবাদের মধ্যে একটা ধারাল কুচক্র যে বনবন করে ঘুরছিল আমাকে কেটে খণ্ড খণ্ড করে ফেলার জন্য আগে টের পাই নি। টের পেলুম মাস দু'য়েক পর।

প্রতিদিন সকালে কোহিনূর নিজে হাতে আমার ঘর পরিষ্কার, বিছানাপত্র ঠিকঠাক করে দিতো। মজুরানীকে ঢুকতে দিত না। বলত, আমি মরে গেলে করবে ও। ডাঃ শর্মার ঘর আমার দেবমন্দির। আমার পুণ্যের জন্য ও কাজ আমিই করবো।

একদিন ঘরের কাজ সেরে ও বেরোচ্ছে, জনাছয়েক জোয়ান স্যানাটোরিয়ামে প্রবেশ করে ওকে দাবি করল। কোহিনূরকে তাদের চাই-ই। খুঁজে খুঁজে হয়রান। কোহিনূর আমার পায়ে কেঁদে পড়ল। —বাঁচান আমাকে। ওরা আমার আপন কেউ নয়। দেহটা নিয়ে কারবারে লাগানর জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পালিয়েও রেহাই নেই আমার। আপনি কৃপা করলে, ওরা এমুখো হবে না আর, আমিও বেঁচে যাবো। শুধু মুখের একটি কথা আপনার।

—কি কথা? আমি জিজ্ঞেস করেছি।

—আপনি আমায় বিয়ে করেছেন। আপনি না বললে, ওরা আপনার নামে কলঙ্ক রটাতেও পেছপা হবে না আমাকে জড়িয়ে।

আমি বলতে চাই নি প্রথমে—ও আমার স্ত্রী। ওর কান্নাকাটি আর পীড়িতে শেষ পর্যন্ত বললুম। মন্ত্রের মতন কাজ হ'ল। ওরা ওকে আর করল না। মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেছে স্যানাটোরিয়াম থেকে।

এর পরের ঘটনা—সত্যি সত্যিই আমার স্ত্রীর অধিকার দিতে হয়েছে কোহি-
কে।

নিত্য এসে সজ্জন গুপ্তা বলেছে, শয়তানরা চতুর্দিকে রটিয়ে বেড়াচ্ছে,
হিনুরকে ডাঃ শর্মা শাদি করেছে। ওরা যদি এতটুকু বুঝতে পারে এটা
ানো, তাহলে আর কোহিনুরের অস্তিত্ব থাকবেনা কোন। সেই ভয়ঙ্কর
নর কথা স্মরণ করে আমি শিউরে উঠি। সকলের সামনে টেনে-হিঁচড়ে বার
নিয়ে যাবে কোহিনুরকে।

খপ্ করে আমার দু'হাত চেপে ধরেছে সজ্জন গুপ্তা। বলেছে, ডাক্তার সাব,
ার অনুরোধ—মেয়েটিকে বাঁচান আপনি। এমনিতেই তো সকলে জেনে গেছে
। আইনত বিয়েটা করে রাখা ভালো। বদমাশরা কোন সময় হামলা করলে,
র চোখের সামনে মোক্ষম অস্ত্র ছুড়ে কাবু করে ফেলতে পারা যাবে সঙ্গে
রেজিস্ট্রি বিয়ের ডকুমেণ্ট।

না-না ক'রে সময় নিয়েও আমিও রেহাই পাইনি। সজ্জন গুপ্তার ফাঁদে
ার পা দিতেই হয়েছে। স্যানাটোরিয়ামের রেজিস্ট্রার আনিয়ে আমাকে দিয়ে
করিয়ে নিয়েছে।

লজ্জায়-ঘেন্নায় নিজের ওপর ধিক্কার এসে গেছে আমার। অর্জুনকে জানা-
চিঠি লিখে, জানাইনি অর্জুনের মাকেও। ও শ্বশুর বাড়িতে। আমি
ূর্ণ কোহিনুর আর সজ্জন গুপ্তার কব্জায় চলে গেলুম।

আমায় আমার মন বলছে কেবল, যখুনি আমি অবকাশে একা বসে থেকেছি
-তুমি জড়িয়ে পড়লে নিজে বিপদে। বিপদকে বরণ করে নিলে। আরো
আসছে তোমার ভবিষ্যতে।

পত্তর আপনজন থেকে বিচ্ছিন্ন আমি, আমি একা। কোহিনুর-সজ্জন গুপ্তার
পার-স্যাপার দেখে, আমার বদ্ধমূল ধারণা জন্মে গেছে, এরা ষড়যন্ত্র করে
থায় নিয়ে যাচ্ছে কে জানে! বেরোতে দেয় না। চোখে চোখে রাখে
জনে। সদাই বলে, আমি অসুস্থ। দিন দিন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছি নাকি।
বেরোলেই দু'জনে সঙ্গে যাবে। রাস্তা-ঘাটে একা ছাড়তে ওদের ভয়।

জ্জন গুপ্তা নাকি খবর পেয়েছে, কোহিনুরের ব্যাপারে অনেকেই অখুশী।
মধ্যে একটা শক্তিশালী দল পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চায় ডাঃ
াকে।

সজ্জন গুপ্তা আমার কানে কানে বার বার এক কথা তোলাতে—আমার মনে
ছে, ওরা আমায় ভয় দেখিয়ে শক্তিহীন করে রাখতে চায়। আমার মনের
রকে শেষ করে দিতে চায়। বুঝতে পারছি বিষয় আমার বিষ। বিষয়ের
এসেছে ওরা, চিল যখন পড়েছে, কিছু না কিছু নিয়ে তবে উড়বে। এদের
না দিলে আমায় ছাড়বে না। এদের ওপর রোজ বিরক্ত হয়ে আমি পারছি

এদের দেখলেই আমি মানসিক নির্যাতন ভোগ করি খুব। সত্যিই আমি
ক্রমে দেহে-মনে অসুস্থ হয়ে পড়ছি। এদের বিদায় করবো কেমন করে এই

চিন্তা মাথার মধ্যে কুরে কুরে খাচ্ছে। মনের সাম্যভাব হারাতে বসেছি আমি।
এই দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য ওদের দু'জনকে একসঙ্গে সামনে
বললুম, আমার শরীরের অবস্থা ভালো নয় মোটে। যদি কিছু হয়—
রের ব্যবস্থা রেখে যেতে চাই একটা। এটা শোনার জন্য মুখিয়ে ছিল ওরা।
পরের দিনই আমাকে দিয়ে উইল করিয়ে নিল সজ্জন গুপ্তা।
কোহিনুরের—স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি। দেখাশোনার ভার সজ্জন গুপ্তার
অবিশ্যি আমি ম'লে কার্যকারী হবে।

এদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা আর আকাশছোঁয়া আশায় আমি বিস্মিত হয়েছি।
করবো না ভেবেও সই ক'রে দিয়েছি। সই না করলে এরা আমায় খুন
ফেলতেও দ্বিধা করবে না

অর্জুন আমায় বিষয় থেকে খারিজ হবে কেন? তাকে ছেলের মতন
করেছি—বলতে গিয়ে মুখটা কে যেন আমার সজোরে চেপে ধরল। যা
মন-মন। মনোভাব জানানো উচিত হবে না একদম। এদের
দিয়েছি, অত লক্ষ্য রাখবে না আর আমায়।

যা ভেবেছি, তাই-ই হল। পথে-ঘাটে বেরোলে ওরা আর বেরোয় না
বলে, স্যানাটোরিয়াম দেখবে কে, রুগীদের তত্ত্বাবধান করবে কে?

কোহিনুর বলে, যে কঠিন ভার দিয়েছো, তৈরী হ'তে হবে তো
আমরা উপযুক্ত হয়েছি, দেখে গেলেও শান্তি তোমার।

সজ্জন গুপ্তা থাকা শুরু করে দিয়েছে এখানে। কোহিনুর একা সব
লাবে কেমন করে! সজ্জন গুপ্তার ঘর থেকে কোহিনুর বেরিয়ে আসে
দুপুরে—বাহাদুর আমার ঘুম ভাঙিয়ে দেখিয়েছে। নিত্যকার ঘটনা
দাঁড়িয়েছে এটা।

আমি জিজ্ঞেস করে সচেতন ক'রে দিতে চাইনি আর ওদের। নিজের
নিজেকে করে যেতে হবে।

বেরোতে আরম্ভ করলুম রুগী দেখার নাম করে। বাহাদুর আমার
বয়ে নিয়ে যেত। ওকে বলেছিলুম, আমার স্যুটকেসটা যত্ন করে রেখে
ও আমার খুব বিশ্বাসী, আমার জন্য জীবন দিতে পারে। আগের উইল
নাকচ করেছি। অর্জুনের নামে আমার সম্পত্তি 'ডিড্ অফ গিফট' করে
আমি জানি, বাহাদুরের জিম্মায় রেখেছি যখন, অর্জুনের হাতে নিঃসন্দেহ
আমার আদেশ ভগবানের আদেশ বলে মান্য করে ও!

এবার ডাঃ শর্মা লিখেছে, তার মৃত্যু ভয়ের কথা। আমাকে সরিয়ে
হবে আঁচ পাচ্ছি যেন আমি। বাহাদুরকে নিয়ে পালানোর মতলব করেছি
কোথাও—পারি নি।

আবার ওরা নজর রাখছে আমার ওপর।

সন্ধ্যে নামছে সবে। বিপাশা নদীর কি দুরন্ত বেগ। আমি দেখতে
আসছিলুম আর ভাবছিলুম, আমার মনের এই বেগ এসেছিল একদিন
জন্য। আমি সক্রিয় হয়ে উঠেছিলুম। আজ মাধুরীকে বড্ড দরকার।

বার এসে অন্তত আমার ভেতরটাকে জাগিয়ে দিয়ে যাক। আমার মনের গতি হ'য়ে উঠুক এই রকম। আমি ভয়ডর তুচ্ছ করে বেরিয়ে যেতে পারি এখান থেকে।

ফাঁকা রাস্তায় চলছি। কাছে-পিঠে নেই কেউ। হঠাৎ দেখলুম পেছনে কার ধ্বনি। আমি ফিরে তাকিয়ে অবাক। ওরা দুজনে। কোহিনুর আর ন গুণ্ডা। আগে চিনতে পারি নি। ভূতের মতন দেখাচ্ছিল। আপাদ-ক কালো কাপড়ে ঢাকা। কাছে এসে, ওরা নিজেরাই আবরণ সরিয়ে লল ওদের।

আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে হেসে উঠল দুজনে। কোহিনুর বলল, ভয় পেয়ে ছ তো! তুমি একা রাস্তায় বেরোতে শুরু করেছো কোন সাহসে। জানো চারদিকে দুশমন ওৎ পেতে বসে আছে। আমারও তোমার পেছু পেছু রয়েছিলুম, গার্ড দিয়ে চলেছি।

অন্যের দ্বারা আমার জীবন সংশয় হতে পার—এ ভাবনা আমার আসে না উও। এদেরই আমার বেশী ভয়।

এই দু'জনকে এই সাজে দেখতে আরম্ভ করলুম আমি প্রায় দিনই রাতে। ার ঘরের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। এ বন্দীদশা আমার অসহ্য হয়ে াল। আমাকে দিয়ে খানদশেক চিঠি অর্জুনের নামে লিখিয়ে নিয়েছে ওরা। এখানে আসার জন্য অস্থির হবে না মোটে। আমি ভালো। মনোযোগ য় পড়াশোনা করবে। লেখানোর কারণ বলেছে কোহিনুর, স্বপ্ন দেখি একটি ন তোমার চিঠি আশায় গালে হাত দিয়ে ভাবছে। আমার মনে হয়, ওই মার অর্জুন। আমরা ঠিক সময়ে চিঠি পোস্ট ক'রে দেব। ওর পড়ার ত হবে না। আমি ভাবি, নিজের ভাগনেকে চিঠি লেখারও স্বাধীনতা নেই ার। সবেতেই এদের পরাধীন হয়ে থাকতে হবে আমায়!

আমি এভাবে থাকতে পারছিনা আর। পালানোর সুযোগ খুঁজছি। যে নদিন সুযোগ পাবো—নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়াবো।

ডাঃ শর্মার লেখা খাতাখানা—'ডিড অফ গিফট' সমেত আমি যত্ন করে টকেসের ভেতর পুরে রাখলুম।

বাহাদুরকে বললুম, ঠিক আছে। তুমি ঘুমোও গে।

—সাব, আমার আঁখিতে নিদ আসে না রাতে। সাব আমার জেগে ঘুরছে নের জঙ্গলের ধারে, খাদের ধারে। কেউ আসার কথা থাকলে, আমার সাব জ গিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসতো তাকে। কতবার আমিও সঙ্গে থেকেছি। বলতো ডাইনে বাঁয়ে, ডানদিক বেঁকে—ডানদিক, ডা দিক।

আমি বিস্ময়বিমূঢ়। আমাকেও তো এই নির্দেশ দিয়েছিল আসার পথে না কে একজন! সেই কি ডাঃ শর্মা? বাহাদুর যে বলে, তার সাব আসে এখানে, ঢোকে না—সত্যিই তাহলে!

কোথায় থাকে কোথায় যায়—খুঁজে বার করতে হবে আমাকে।

চার দিন ধরে নিশুতি রাতে সবার অগোচরে খোঁজ করতে বেরিয়েছি, পাই

নি। আবছা দেখেছি একজনকে সরে যেতে। টর্চের আলো ফেলেছি-
গাছগাছালি, লোকজন কেউ কোথাও নেই। দূরে উঁচু পাহাড়টায় কে যেন
ঝুলিয়ে বসে আছে।

হ'তে পারে মনের ভুল, হ'তে পারে চোখের ভুল—আমি যাই নি।

আজ দশেরা। কোহিনুর সকাল না হতেই ঘরের দরজায় টোকা দে
খোলাল। একগাল হেসে বলল, আজ কিন্তু তৈরী থেকে। তোমাকে অ
জায়গা ঘুরিয়ে দেখবো। দেখবে ধুঙ্গরী মন্দিরে হিড়িম্বাদেবীর প্রতি
আসবে—কত বাজনাবাদ্যি কত লোক! মন্দিরটাও দেখার মতন। দেব
কাঠের তৈরী চারতলা। ঠিক একটা প্যাগোডা। হিড়িম্বাদেবী এলে,
দশেরা উৎসব শুরু। সারা বছর গাঁয়ের মন্দিরে থাকেন, ওই দিনটিতে আ
কেবল।

হিড়িম্বাদেবী দশেরা উৎসব বা অন্য কোন দর্শনীয় জায়গা দেখার আ
ঘুচে গেছে আমার শর্মার খাতা পড়ার পর থেকে। জঘন্য মনের নো
চরিত্রের কোহিনুরের মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না আমার আর। আমার ধ্যা
দেবী সাক্ষাৎ রাক্ষুসী। কথা কইতে ইচ্ছেও করে না। তবু—মুখের দি
চেয়ে উত্তরের আশায় অপেক্ষা করছে দেখে বললুম, ঠিক আছে। আ
যখন বলেছেন, রাখলেন যখন ওই জন্য—নিশ্চয় তৈরী হয়ে থাকবো আপনা
আগেভাগে।

পা টিপে টিপে বাহাদুর এসে হাজির। এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে দে
নিল কেউ আসছে কিনা, কেউ দেখছ কিনা, চাপা গলায় বলল, সাব, আ
সাবকে দেখতে পেলে ছাড়বেন না মোটে। নিয়ে আসবেন ধরে। বলে
আপনার বাহাদুর আপনার জন্য রয়েছে এখনো।

সামনে ঘাড় ঝুঁকিয়ে আশ্বাস দিলুম ওকে। কানে কানে বললুম, তো
সাবকে পেলে এবার আর ছাড়ছি না। তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো।

বাহাদুরের দু'চোখ চিকচিক করে উঠল। বলল, পশুপতিনাথ আপ
ভালা করে সাব। নমস্তে, নমস্তে।

মিছিলের ঘনঘটা হিড়িম্বাদেবীর আগমন দশেরা উৎসব আমার মনটা আ
ভরে উঠেছে। 'হিড়িম্বাদেবীজি কি জয়' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখ
গোটা মানালী শহরটা ভেঙে ওড়েছে এই উৎসবে। ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পু
সব বয়েসের লোক এক বয়েসী হয়ে গেছে। কি হুল্লোড় কি উল্লাস! স্বর্গে
সুষমা নেমে এসেছে মর্তধামে।

ভিড়ে না আমি হারিয়ে যাই, আঘাত না পাই—দু'জনে দু'পাশে আগ
রেখেছে আমায়। পথে মিছিলে উৎসবে সর্বক্ষেত্রে কোহিনুর আমার ডাই
বাঁয়ে সজ্জন গুপ্তা।

স্যানাটোরিয়ামে ফেরার কথা ভুলে গেছি আমি। অগুনতি মানুষের মে
একটা অন্তহীন আনন্দের জোয়ার বইছে। ওই জোয়ারে ভেসে চলেছি অ
কোন অজানা দেশে।

সজাগ হয়ে উঠলুম কোহিনূরের ডাকে। পুষ্পক, এবার ফিরতে হবে যে বাবা। এখনো ঝিন্নারাণার দুর্গ দেখতে বাকি। এদিকে সন্ধ্যে হয়ে আসছে।

ভিড় থেকে বেরিয়ে এলুম আমরা তিনজনে।

চলেছি ঝিন্নারাণার দুর্গ দেখতে। উঠছি চড়াইয়ের পথে। ওপরে আরো ওপরে, আরো ওপরে। পাহাড়ের চুড়োয় দুর্গ।

সজ্জন গুপ্তা বলল, ওই দুর্গে ঝিন্নারাণাকে খুন করেছিল তার রানী।

আমি শিউরে উঠলুম। স্বামীকে স্ত্রী খুন করল! দরকার নেই আমার ওখানে গিয়ে। ওখানে যাওয়া পাপ।

কোহিনূর খিল খিল করে হেসে উঠল। —আচ্ছাই পাগল তো! আমার তো বিশ্বাস হয় না সত্যি এটা। এটা প্রবাদ বোধহয়! কোন স্ত্রী-বিদ্বেষী পুরুষ প্রচার করে থাকবে হয়তো কোন কালে—নিজের আত্মতৃপ্তির জন্য।

আমরা অনেক ওপরে এসে গেছি। একটা খাদের ধার দিয়ে চলেছি। খানিক যাওয়ার পর আচমকা একটা বাজ পড়ল যেন আমার পেছনে। আমাকে থেমে যেতে হল। জামার ভেতর থেকে রিভলভার বার করে, আমায় তাক করে দাঁড়িয়ে সজ্জন গুপ্তা। চিৎকার করে বলছে, এক পা নড়বে না বলে দিচ্ছি। ডাইনীর হাসি হেসে উঠল কোহিনূর। হি-হি-হি-হি-হি। মুখখানা কি বীভৎস দেখাচ্ছে।

আমি নিস্পন্দের মতন দাঁড়িয়ে।

এগোলে মৃত্যু পেছোলে মৃত্যু। সঙ্কীর্ণ পথ। পাশে মরণখাদ। এ জায়গাটায় কোহিনূরই এগিয়ে দিয়েছে আমায়। বলেছে, আমাদের তো দেখা। তুমি নতুন, এইখানে দাঁড়িয়েই দেখে নাও দুর্গ। ওরা দু'জনেই পেছনে সরে গেছে চোখের পলকে। তারপর নিজেদের মতলব হাসিল করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।

আমাকে মেরে ওদের লাভ কি? ভাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখতে পেলুম সেই লোককে আবার। আমার পূর্বের পথ প্রদর্শককে। আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে। ঘাড়ের কাছে সেই সোনার হার চিকচিক করছে। একটা কালো মেঘের আবরণ যেন সামনে। আমি ওদের আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। না কোহিনূরকে, না সজ্জন গুপ্তাকে।

আমাকে পেছনে ফেলে ক্রমশ সামনের দিকে এগোচ্ছে ওই মিশমিশে কালো মেঘের আবরণের পুরুষ। গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি আমি। কোহিনূর আর সজ্জন গুপ্তার দুটি গলার একটি আর্তনাদ শুনলুম—আমি। একবারই। আমার আড়াল সরে গেল চোখের সামনে থেকে।

আমি অবাক বিস্ময়ে দেখলুম, ওই পুরুষ ওপাশ দিয়ে উৎরাইয়ের পথ ধরে নামছে খাদে। আমায় যেন হাতছানি দিয়ে ডাকল। আমি চলেছি অনুসরণ করে ওর প্রবল আকর্ষণে।

হৃৎকম্প হয়েছে আমার নিচে এসে। দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে ওই

পুরুষ। একটা কঙ্কাল পড়ে রয়েছে, গলায় সোনার হার। যা আমি আগে দেখেছিলুম, পরে দেখেছি—আবারো দেখছি এখন। বাহাদুরেও কথায় কথায় বলেছে একবার—সাবের মা মরার সময় নিজের গলার হার খুলে সাবের গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। সাব সেটি খোলেনি কখনো সেই থেকে।

আরো দেখছি আমি। ডাঃ শর্মার কঙ্কালের দু'ধারে প্রাণহীন দেহে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে কোহিনুর আর সজ্জন গুপ্তা! দেহ দলা পাকানো, মুখ বিকৃত। চেনা যায় না।

তিন

কল্পনার চেয়ে বাস্তব যে এত রোমাঞ্চকর, এত ভয়ংকর—তা প্রত্যক্ষ দর্শন না হলে, ঠিক মত বুঝতে পারা যায় না বুঝি। সুহাসের জীবনে মর্মান্তিক ঘটনা নেমে আসতে আসতে আশ্চর্য ভাবে থমকেছে। কিন্তু আগের মানুষদের ? পৃথিবীর আকাশ-বাতাস-মাটি খুঁজেও হদিস মিলবে না।

সুহাসের মুখ-চোখে আজও আমি তখনকার আতঙ্কের ছায়া স্পষ্ট দেখছি। দেখছি মুখের কথার সঙ্গে সেই সব ভয়াবহ দৃশ্য আমার চোখের সামনে জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে। ঘুরছে ফিরছে চলছে।............

নিথর নিস্তব্ধ।

নিস্তব্ধতা কেঁপে উঠছে, থেকে থেকে একটা উত্তাপ গলা নিঃশ্বাসের ঝড়ে। এ ঝড়ের আকর্ষণ প্রচণ্ড। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে টেনে নিয়ে পেটে পুরবে নিমেষে।

ঝড়টা এগিয়ে আসছে, টানছে সকলকে। আবার থেমে যাচ্ছে। আবার আসছে, আবার যাচ্ছে। এ নিঃশ্বাসের ঝড় কোন জন্তু-জানোয়ারের নয়। তবে কি কোন ছায়ামূর্তির ?

ঘন অন্ধকার নেমে এসেছে জায়গাটায়। থমথমে ভাবটা জমাট হয়ে উঠছে ক্রমে। মূর্তিটার চোখ দুটো দপদপ করে জ্বলছে। দুটো আগুনের ভাটা।

নিঃশ্বাসের ঝড়-হাওয়ার সঙ্গে ওই আগুনের ভাটাও এগিয়ে আসছে, থেমে যাচ্ছে। আবার আসছে। আগুনের ভাটার কি আক্রোশ! সমস্ত জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক না করে নিবৃত্তি নেই বুঝি ওর।

গভীর অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না ও কে। চোখ ছাড়া আর নিঃশ্বাস ছাড়া বোঝার উপায় নেই—ওখানে একটা কেউ বসে আছে।

যে বসে আছে, সে বিশাল দেহী। উঠে দাঁড়াতে মনে হল—একটা ছায়ার বিরাট নিমগাছ। সমস্ত শরীর যেন তার থর থর করে কাঁপছে। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! কোথাও কেউ নেই, জনপ্রাণীশূন্য, তবু কাকে যেন দু'হাত বাড়িয়ে ডাকছে। হাত দুটো ছড়িয়ে দিচ্ছে লম্বা করে সামনে দিকে। একটু স্থিরভাবে রেখে, গুটিয়ে নিচ্ছে নিজের বুকের কাছে। আবার ছড়িয়ে দিচ্ছে।

আমার মনে হচ্ছে, অনেক ছায়ামূর্তি মিছিল করে এগিয়ে যাচ্ছে ওই বিশাল-দেহীর কাছে। তারপর অদৃশ্য। আবার আসছে। কিছু বুঝতে পারছি না আমি। এ কোন প্রহেলিকা, না স্বপ্ন, না সত্যি ?

একটা ধোঁয়াটে এলোমেলো চিন্তা আমার মাথায় তালগোল পাকাচ্ছে। আমি কিছু বুঝতে পারছি না—আমি কোথায়। চতুর্দিকে গাছপালা ঘেরা গহন জঙ্গল। নিজের গায়ে নিজে হাত দিয়ে দেখছি, অনুভূতি লোপ পায়নি। আমার গায়েই আমার হাত পড়ছে!

মাথার ওপর আকাশ দেখতে পাচ্ছি না। অশথ-বটের ডাল পাতা ঝুলছে—দুলছে। এরাও হাত নেড়ে ডাকছে যেন আমায়—ওই যমদূত নিম-মূর্তিটার হাতের মতন হাত নেড়ে নেড়ে।

সমস্ত জঙ্গলটা দুলছে আমার চোখে। অশ্বত্থগাছের গুঁড়িটা আঁকড়ে ধরলুম আমি প্রাণপণে। ভীষণ দুলছে গাছটা। আমার ছিটকে ফেলে দেব এখুনি। তারপর এই গাছটা আর আশেপাশের সমস্ত গাছ প্রতিযোগিতা করে, কিংবা এক-সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সবেগে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপর। আমায় পিষে মেরে ফেলবে এই প্রেতপুরীতে।

সমস্ত জায়গা জুড়ে একটা অট্টহাসি নেচে উঠল—আকাশ চিরে বাজ পড়ল যেন। আমার বুকের ধুকধুকটা ঢকঢক শব্দে বাজছে ঘন ঘন। দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠছে। হাত ছেড়ে দিয়ে, বুকটা চেপে বসে পড়ার জন্য একটু সরে আসতে চেষ্টা করছি, পারছিনা। গাছটা টেনে রাখছে আমাকে। রাক্ষুসে গাছ নাকি এটা? ভুল করে, অশ্বত্থ বলে আঁকড়ে ধরেছিলুম! কি সর্বনাশ!

আমি ছটফট করছি—কিছু ফল হচ্ছে না। আমার মাথার ওপরের ডাল দুটো ভীষণ দুলছে। এপাশ ওপাশ নয়। নিচে থেকে ওপর, ওপর থেকে নিচে। ঝপাৎ করে দু কাঁধের ওপর আঘাত হানল জোরে। আমি চিৎকার করলুম মনে মনে—মা গো! মুখে বোবা হয়ে গেছি।

ডাল দুটো আমার গলায় চেপে বসছে সাঁড়াশীর মতন দু'ধার দিয়ে। গাছটা তার দেহের সঙ্গে সারা দেহ আটকে রেখেছে আমার—এবার চাপ দিচ্ছে গলায়—টুঁটির কাছ বরাবর।

দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার।

এতটুকু বাতাসও উবে গেছে বোধহয়, এখন থেকে। বুকের ভেতর আনচান করছে। প্রাণটা বেরোবে বুঝি এখুনি দেহ ছেড়ে। এই কি মৃত্যুর আসল রূপ! এই কি যন্ত্রণা! জ্ঞান নিয়ে মরলে কি মানুষের এই ভোগ ভুগতে হবে!

আমার সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে। বোধশক্তিটা এখনও রয়েছে। বল নেই পায়ে হাতে দেহের কোন অঙ্গে। তবু পড়ে যাচ্ছি না আমি। গাছটা ধরে রেখেছে। আমার প্রত্যেক শিরা-উপশিরা কেমন অদ্ভুত ধরনের শিরশির করছে। আমার সমস্ত রক্ত চনচন করে বেরিয়ে যাচ্ছে শরীর থেকে। কে যেন মুখ দিয়ে টেনে শুষে খেয়ে নিচ্ছে।

দেহের একটা জায়গা থেকে টানছে না। প্রতি রোমকূপে শত সহস্র মুখ বসিয়ে একসঙ্গে টানছে জোরে জোরে। এই রাক্ষুসে গাছের ছাল আমার চামড়ায় আটকে গেছে আঠার মতন।

আমার গোটা দেহের রক্ত শুষছে পুরো গাছটা। গলায় আটকানো ডাল

দুটো আগের তুলনায় চতুর্গুণ মোটা হয়ে উঠছে। আবার অট্টহাসি শুনছি আমি। শ্রবণশক্তি হারিয়ে ফেলছি। এবারের হাসিটা খুব ক্ষীণ। তেমন জোরালো নয়। অনেক—অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে। কানে তালা ধরছে আমার। যা-ও বা অস্পষ্ট দেখেছিলুম সব, তাও দেখতে পাচ্ছি না। দু'টো আগুন চোখ আমার চোখে চেপে বসছে ধীরে ধীরে।

দু'চোখ বুজে আসছে আমার। অন্ধকার—ঘোর অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যাচ্ছি আমি। আমার বুকের বাঁদিকটায় ওই লম্বাহাতের স্পর্শ পাচ্ছি। কি কঠিন! হাড় পাঁজরা ভেঙে ফেলছে মটমট করে। হৃৎপিণ্ডটা টেনে বার করছে লোহার আঙুলে টিপে ধরে।

দেহ থেকে আমার প্রাণটা ছিনিয়ে নিল ওই ছায়ার হাত। আমি হারিয়ে গেলুম এ দুনিয়া থেকে চিরজন্মের মতন।

একি দেখছি আমি!

আমিই দেখছি আমাকে। দেহছাড়া আমি আমার মৃতদেহটাকে দেখছি। আমার দেহটা লেপটে রয়েছে একেবারে গাছের সঙ্গে। আমি দাঁড়িয়ে সামনে। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে—এভাবে অকালে কেন আমি ম'লুম!

আমার সমস্ত সাধই অপূর্ণ রয়ে গেছে। চব্বিশটি বসন্ত একটা উষ্ণ নিঃশ্বাসে শুকিয়ে গেল। কেমন করে এখানে এলুম, কে নিয়ে এলো, কি নিয়ে এলো, কি অবস্থায় নিয়ে এলো—সবই আমার অজানা।

যখন থেকে জানি আমি—আমার মনে পড়ে—তখন আমি মৃত্যুর গহ্বরে দাঁড়িয়ে। পালনোর উপায় নেই, বাঁচার উপায় নেই—সম্পূর্ণ অসহায়। নিজের যত সত্তা—অস্তিত্ব নেই। আমি আর আমাতে ছিলুম না।

গাছ আর ওই ছায়া—ওই দু'টো আমায় শেষ করেছে। একি নিছক ওদের খিদে মেটানোর তাগিদে? একটার দেহের খিদে, একটার প্রাণের খিদে। ছায়া প্রাণটা খেয়েছে, গাছ দেহটা। এখনও খাচ্ছে।

আমার নধর কোমলকান্তি দেহ—কত যত্নের আদরের—সেই দেহের নরম মাংস গাছের ছালে মিশে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। মাংসহীন করে ফেলল গাছটা। কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে। আমার পুরো কঙ্কাল। প্রমাণ মাপের মানুষের মাথা থেকে পা অবধি হাড়ের কাঠামো। সাদা হাড়ের।

উঃ, কি নিষ্ঠুর গাছ!

ওই গাছের ছালে-ডালে কি আছে কে জানে—হাজার-হাজার মানুষখেকো রাক্ষস। সমস্ত হাড়ও শেষ হয়ে আসছে। গাছটাকে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে শেষ করে ফেলার ইচ্ছে হচ্ছে আমার।

আমি হাত তুলতে গিয়ে থমকালুম। আমার হাতের আকার আছে, কিন্তু কোন কিছু করার শক্তি নেই। টুকরো টুকরো মেঘে জমা হাত একখানা। পাতলা মেঘ—হালকা মেঘ। আমার সমস্ত শরীর এই বস্তুর।

আমার কান্না আসছে। একি হলুম আমি! ইচ্ছে করছে ডাক ছেড়ে—চিৎকার করে কাঁদি। পারলুম না। আমার স্বর নেই। ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে আমার

আগের জগতে, আগের মানুষ হতে।

একটাও হাড়ের টুকরো পড়ে নেই গাছের তলায়—সবুজ ঘাসের ওপর। আমার আগের দেহ নিশ্চিহ্ন। এতটুকু খুঁজে পাওয়া যাবে না আর কোথাও। আমি জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছি। আমার নিঃশ্বাসে বাতাস নেই।

আমি আছি, কিন্তু আগের মানুষের লেশমাত্র নেই আর। আমার হাত থেকে হাত নেই—সব থেকেও সব নেই। আছে একটা আকাশ জোড়া হাহাকার। হাহাকার আমায় ঘিরে ঘুরছে কেবল।

আমার কি যে যাতনা বোঝানো যাবে না! প্রতিকার নেই কোন। আমি নিজে নিজেই বলি—কেউ কি নেই যে, আমাকে আগের দুনিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যায় আবার!

মঞ্জুষাকে দেখার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠছি। জানিনা, এই নতুন দেহ নিয়ে পেঁছিতে পারবো কিনা তার কাছে। সে কি আর চিনতে পারবে আমায়? নিজের হাত-পা তো নিজেই চিনতে পারছি না।

মঞ্জুষার কাছে যাবার জন্য পা বাড়াতে যাচ্ছি। কি আশ্চর্য! পা তুলতে পারলুম না—চলা তো দূরের কথা। কে যেন আমায় একটা কঠিন শেকলে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে পেছন থেকে টেনে ধরে রেখেছে! আমার নড়বার চড়বার কোন ক্ষমতা নেই। একটা অদৃশ্য শেকল একটা অদৃশ্য হাত টানছে আমায়, যেতে দেবেনা। আমার ইচ্ছেমাফিক কোন কাজ করতে দেবে না।

সেই অট্টহাসির শব্দ আবার শুনতে পাচ্ছি আমি। শুনেছি ঠিকই, তবে আগের চেয়ে তফাৎ একটু। অতখানি গুরুগম্ভীর গলার নয়। একটু বিকৃত, একটু ফ্যাসফেসে। পরীক্ষা করে দেখার জন্য নিজের নাম ধরে নিজে ডাকতে চেষ্টা করলুম। নিজের গলা বুঝতে পারলে—এ হাসির গলাও আগের কিনা —বা অন্য—এখুনি ঠিক হয়ে যাবে। ডাকলুম, সুহাস সুহাস সুহাস…

কানটাই একটু অন্য রকমের হয়ে গেছে। আগের সেই মিষ্টিমোলায়েম স্বর শুনলুম না। এ স্বরও ফ্যাসফেসে, একটু কর্কশ।

আবার হাসি শুনছি। আমি নিশ্চিন্ত। একই গলার হাসি এ। হাসির সঙ্গে সঙ্গে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে কোন অজানা পথে কোন অজানা দেশে, জানিনা। পুতুলের মতন চলেছি আমি।

থামলুম। নিজে নয়, ওই অদৃশ্য হাতই আমাকে দাঁড় করিয়ে দিল। যে জায়গায় দাঁড়ালুম, আমার মতন আরও তিনজন দাঁড়িয়ে! ঠিক আমার মতম দেহ এদের। এরাও পুতুলের মতন চলেছে, আমিও চলছি আবার।

দেখতে পাচ্ছি, চিতার আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। এগোচ্ছি আমরা। চতুর্দিকে মরার হাড় ছড়ানো। একটা সদ্য মরা মানুষ পড়ে। শেয়াল খুবলে মাংস গিলছে।

আরও এগোচ্ছি, কবরের মতন মাটি খুঁড়ে রেখেছে কারা। একটা মানুষ প্রমাণ গর্ত। মঞ্জুষাকে জনাচারেক ধরাধরি করে নিয়ে আসছে। মঞ্জুষা অচেতন। মৃত নয়। একটু একটু এপাশ ওপাশ করছে। জ্ঞান ফিরছে।

একি কাণ্ড! ওরা চনমন করে চারদিক তাকিয়েই গর্তের মধ্যে ফেলে দিল মঞ্জুষাকে। মঞ্জুষা নড়ে উঠল। চারজনে চারদিক থেকে কোদালে মাটি টেনে গর্ত ভরাট করতে লাগল তাড়াতাড়ি।

এ যে জ্যান্ত সমাধি! মাটি ফুঁড়ে গুমরানো মৃত্যুকান্না আমার কানে ভেসে আসছে। আমার ওকে উদ্ধার করার ইচ্ছে বৃথা। প্রমাণ হয়ে গেছে, আমার ইচ্ছে এখন অকেজো।

হাঁপাতে হাঁপাতে জটাজুটধারী অর্ধ উলঙ্গ একজন—সন্ন্যাসী বোধহয়—এসে হাজির হ'ল মাটি ঢাকা সমাধির কাছে।

সমাধির ওপর উটের চামড়ার আসন পেতে দিল ওদের একজন। সন্ন্যাসী বসে পড়ল সমাধির আসনে। দু'চোখ বুজে সন্ন্যাসী নিঃশ্বাস টানছে, নিঃশ্বাস ছাড়ছে। বেশ জোরো জোরে। বুক পেট ফুলে ফুলে উঠেছে। মাঝে মাঝে স্থির হয়ে যাচ্ছে। বুক-পেটের ওঠানামা বন্ধ। সন্ন্যাসী দমবন্ধ করে রাখছে।

দমবন্ধ করা অবস্থায় মাটি থেকে এক বেগদা শূন্যে উঠে পড়ছে সন্ন্যাসী। কিছুক্ষণ চলল এই সাধনা। সন্ন্যাসী চোখ খুলে, দাঁত কড়মড় ক'রে ভাঙা ধরা গলায় বলল, মরার মাথার ঘিলু কোই? যজ্ঞের আগুন জ্বাল।

যজ্ঞের আগুন জ্বলে উঠল। দুটো মরার খুলিতে ঘিলু রাখা হয়েছে, সন্ন্যাসী দু'দিকে ডাইনে-বাঁয়ে। যজ্ঞের আগুনের তাপে ধরে ঘিলু গলিয়ে নিল সন্ন্যাসী। দু'টো খুলির। একটা ভাঙাখুলির খানিকটা ডুবিয়ে গলা ঘিলু তুলছে আর যজ্ঞের আগুনে ঢালছে। মুখে বিড়বিড় করে বলছে কি। ··· 'মারয়ে মারয়ে' কথাটা শুনছি শুধু আমি।

সন্ন্যাসী অপর খুলির গলা ঘিলুটা বিরাট হাঁ করে, গলায় ঢেলে দিল ঢকঢক ক'রে।

হুঙ্কার দিয়ে উঠল সন্ন্যাসী—শিবা শিবা। গলায় মরার হাড়ের মালা কেঁপে উঠল। সন্ন্যাসী হাত বুলিয়ে মনে মনে কি জপ করল। আবার হুঙ্কার—শিবা শিবা।

গোটা আষ্টেক শেয়াল দৌড়ে এসে সন্ন্যাসীকে গোল করে ঘিরে ফেলল। আসন থেকে নেমে দাঁড়াল সন্ন্যাসী। চারজন অনুগত চেলা চারকোণে। বসে আছে চোখ বুজে জোড়হাত করে। পা মুড়ে কুশাসনের ওপর।

আঙুলে টুসকি দিয়ে, ইশারায় সন্ন্যাসী ডাকল ওদের। কাছে আসতে বলল। বলল নয়—নির্মম আদেশ দিল। —মাটি সরিয়ে মঞ্জুষাকে বার কর। ওর দেহটা আগুনে আধপোড়া করে কুড়ুলে খণ্ড খণ্ড কর। অষ্টনায়িকা আটটি শিবার ভোগে লাগা। এরা শিয়াল নয়—শিবা। বুঝলি?

চারজনে একসঙ্গে ঘাড় নেড়ে জানাল, বুঝেছে।

আমার মোটে ইচ্ছে ছিল না মঞ্জুষার মৃতদেহের ওই ভাবের সাজাটা স্বচক্ষে দেখি। আমার ইচ্ছেয় তো আর কোন কিছু হবার নয়। দেখতেই হচ্ছে। নির্দয় সাজা।

সেই অট্টহাসি শুনতে পাচ্ছি আবার। অবাক হয়ে যাচ্ছি। এই সন্ন্যাসীর

গলা থেকে সেই ভয়ঙ্কর গলার হাসি বেরিয়ে আসছে। হা-হা-হা-হা!

বলছে সন্ন্যাসী আমার নাম ধরে।—সুহাস রাক্ষুসে গাছটা এইভাবে কাটতে চেয়েছিল। সুহাসের পাপে তাই মঞ্জুষার এই সাজা। হা-হা-হা-হা।

আমার একি সাজা! এসমস্ত দেখতে হচ্ছে, শুনতে হচ্ছে অসহায়ের ভূমিকা নিয়ে। একটা মৃত্যু হয়ে গেছে আমার! বেঁচে থাকতে শুনেছিলুম মৃত্যুর পরে যে সুক্ষ্ম দেহ থাকে—জরাব্যাধি শূন্য, শোক-দুঃখ রহিত। কেবল শান্তি আর শান্তি।

কই এসবের একটা তো পাচ্ছিনা আমি। মরেছি, সে দেহ নেই, সে অনুভূতির ইন্দ্রিয় নেই। নেই নামে—সমস্তই তো হচ্ছে আমার। বেঁচে থেকে যেমন সক্রিয় ছিলুম সব তাতে। এখন নিষ্ক্রিয়--কিছু করার ব্যাপারে স্রেফ। দুর্ভোগের ব্যাপারে পুরোদস্তুর উপলব্ধি।

আমার এও একটা আলাদা জগতের আলাদা জীবন। এ জীবনের কি মৃত্যু নেই?

সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর শুনলুম—আছে, আমার হাতে আছে। এগিয়ে আয় তোরা।

এগিয়ে যাচ্ছি চারজনে, সঙ্গের তিনজন আর আমি।

সন্ন্যাসীর কাছাকাছি যেতেই কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গেলুম আমি। দ্বিতীয় আমির অস্তিত্ব অনুভব করিনি একদম। কিছু দেখিওনি, কিছু শুনিওনি। নিজেই নেই, তা কি দেখবো, কি শুনবো!

আবার দেখলুম, আবার শুনলুম।

মঞ্জুষার দেহটা চেনা যাচ্ছে না আর। দেহই নেই, চেনা যাবে কেমন করে! দু' একটা হাড়ের টুকরো পড়ে রয়েছে। শিবারা খেয়োখেয়ি করছে সেই নিয়ে। টানাটানি হেঁচড়া-হেঁচড়ি কামড়া কামড়ি।

মঞ্জুষার মৃত্যুতে আমার ভেতর না থাকলেও ভেতর মোচড়ানো অনুভূতি পাচ্ছি আমি। আমি পাগল হয়ে উঠছি। বলছি, সন্ন্যাসী তুমি পিশাচ! তোমার মৃত্যু কিভাবে হয় দেখো! নির্দোষ মঞ্জুষাকে তুমি নির্দয়ভাবে খুন করেছো, গুম করেছো। তার দেহটাকেও লোকচক্ষুর আড়ালে অদৃশ্য ক'রে দিলে। কেন--কেন করলে এমন?

বেঁচে থাকার রাগ-উত্তেজনা আসছে আমার। আমি রাগে ঠকঠক করে কাঁপছি। বলছি, তুমি সন্ন্যাসী নও, তুমি আস্ত একটি রাক্ষস, মানুষও নও।

সন্ন্যাসীর অট্টহাসি শুনছি। আমার রাগ সপ্তমের সীমা ছাড়িয়ে গেল। বললুম, তুমিই আমায় আমার অজান্তে নিয়ে এসেছ রাক্ষুসে গাছের কাছে। আমায়ও তুমি শেষ করেছো।

সন্ন্যাসী জ্বলন্ত চোখে তাকাল আমার দিকে। পা অবধি জটা লুটোচ্ছে। দু'হাতে পাকিয়ে-পাকিয়ে জটার গোছাটাকে একটা অজগরের মতন করল। মাথায় চেপে চেপে হিমালয়ের চুড়ো তৈরী করল।

যজ্ঞের আগুন পরিক্রমা করছে দুম দুম করে পা ফেলে। কটমট করে দেখছে

আর ঘুরছে, ঘুরছে আর দেখছে।

ওই আগুনের মধ্যে টানছে আমায়। আমি সহ্য করতে পারছি এত উত্তাপ। পুড়ে মরার ভীষণ জ্বালা। তাপেই শোচনীয় অবস্থা। আবার মরতে চেয়েছি। কিন্তু এ মৃত্যু নয়। কে রুখবে? ওই নরদানবের হাত থেকে কে রক্ষে করবে আমায়?

আমি দেখছি, আমারই মতন দেহ নিয়ে আমার এগোনোর পথে এসে দাঁড়াল মঞ্জুষা। তুষার জমা চেহারা। শুচিশুভ্র সুন্দর। ভারি ভালো লাগছে। আগুনের আঁচ আর আমায় স্পর্শ করতে পারছে না একটুও। তুষার-মানবী মঞ্জুষার দেহের হিমেল-হাওয়া আমার সর্বশরীর জুড়িয়ে দিচ্ছে।

ওই সন্ন্যাসীর কোপ থেকে আমি বেঁচে গেলুম বোধহয় এ যাত্রা। ভয় ধরছে আমার মঞ্জুষার জন্য, মঞ্জুষা আমার জন্য আত্মত্যাগ করতে এসে দাঁড়াল কেন? ওর তুষার-প্রতিমা গলে জল হয়ে যাবে যে এখুনি!

না, আমি স্বস্তি পাচ্ছি। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। মঞ্জুষা গলছে না, সদ্য-ফোটা যুঁইয়ের মতন টপটপ করে ঝরে পড়ছেনা আগুনের ওপর। রাতের শিশির বিন্দুর মতন প্রখর তাপে শুকিয়েও যাচ্ছে না। বরং যজ্ঞের আগুনের শিখা নেমে আসছে ধীরে ধীরে। নিভু নিভু হয়ে আসছে মঞ্জুষার কি একটা মন্ত্র উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে। বীজমন্ত্রটা এত আস্তে, আমি শুনতে পাচ্ছি না স্পষ্ট। তারপরের কথাটা কিন্তু পরিষ্কার শুনছি। ...রুদ্রেশ্বরায়াং গচ্ছ, গচ্ছ...।

সন্ন্যাসীর মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠছে। যন্ত্রণামলিন। ডানহাতে বাঁদিকের বুক চেপে ধরে ধপাস করে বসে পড়ল। বসে বসে টলছে। বসে থাকতে পারল না বেশীক্ষণ। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে মুখ গোঁজরাচ্ছে মাটিতে। গোঁ গোঁ আওয়াজে বাঁশ ঝাড়ে কাঁপুনি লাগছে।

ঘাড় তুলতে চেষ্টা করছে সন্ন্যাসী। সেই মুহূর্তে আবার মন্ত্র-উচ্চারণ করছে মঞ্জুষা, সেই আগের মন্ত্র। ...রুদ্রেশ্বরায়াং গচ্ছ গচ্ছ...। সন্ন্যাসীর মাথা লুটিয়ে পড়ছে। আবার তুলতে চেষ্টা করছে।

মঞ্জুষা ফিরল আচমকা আমার দিকে। আমার হাত দু'টো ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিচ্ছে। বলছে, জাগো জাগো! ওঠো।

আমি শুনছি, কোন সুদূর থেকে যেন ওর কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। এত কাছে থেকে—সামনাসামনি—তবু বহুদূরের ডাক যেন এ!

প্রথম ছায়া-পুরুষের মতন অবস্থা তোমার হতে দেব না কিছুতেই সুহাস —মঞ্জুষা খুব তাড়াতাড়ি বলল আমায়। আমি বুঝতে পারছি না কি বলছে ও। আমি চেয়ে আছি ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু।

মঞ্জুষা অস্থির হয়ে পড়ল। বলল, কান দিয়ে শোন ভালো করে। সময় খুব অল্প। প্রথম ছায়া-পুরুষের কাহিনী সংক্ষেপে শোনাচ্ছি তোমায়। তোমার পেছনে যে তিনজন দাঁড়িয়ে—এদেরই প্রথম জনের কাহিনী।

সন্ন্যাসী রুদ্রেশ্বরের আশ্রমে এসে উপস্থিত হল অরূপের জ্যাঠামশাই আর জেঠিমা। রুদ্রেশ্বরের নামডাক খুব। দ্বিতীয় ভগবান। মানুষের মৃত্যু রুখে

দিচ্ছে মুহূর্তে। গুণী বটে। অসাধ্য সাধন করার ক্ষমতা অপরিসীম হয়কে নয়, নয়কে হয় করে দিয়ে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে তাবড় তাবড় লোককে।

এত কাছে—এই মহেশপুরেই এমন সন্ন্যাসীর আশ্রম যখন—ধন্না দিলে—ছেলেটার বংশের অভিশাপ মাথা থেকে যদি নামে—বরাত জোর বলতে হবে তাহলে—যেতে দোষ কি? জেঠিমা পেড়াপেড়ি করল জ্যাঠামশাইকে আসতে। এলো সস্ত্রীক জ্যাঠামশাই।

বংশের ছেলে বাঁচে না। বাইশে পড়তে না পড়তে কোথা থেকে একটা কাল ব্যামো এসে ঝাঁপিয়ে পড়বেই পড়বে। তারপর একদিন ডাক্তার-কবিরাজ—সকলের চেষ্টা, চিকিৎসা ব্যর্থ করে দিয়ে চলে যাবে সেই ছেলে। জ্যাঠা জানেনা—কিসের অভিশাপ বংশের ওপর—কেন এমন হয়—তার ছেলেও গেছে। ভাইপোটি বাঁচলেও তবু বংশের বাতি জ্বলবে। ওর বাপ-মা নেই। জেঠিমাই মা। এ ছেলে বাঁচবে কেমন করে? একটানা অসুখ লেগেই আছে।

দু'পায়ে মাথা রেখে চোখের জলে ধুইয়ে দিয়েছে জেঠিমা। চুলের গোছা দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছে। রুদ্রেশ্বরের চোখের পাতা ভিজে উঠেছে। বলছে, এ ছেলেও থাকবে না। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, কিছু করার নেই, আর তা ছাড়া চেষ্টা করে দেখলে অনেক টাকার শ্রাদ্ধ। অকারণ দরকার নেই। মাকে ডাকো! মা যা করে—তাই হবে।

মা আমাদের মতো পাপীদের ডাক শুনবে কেন বাবা? শুনলে তো ছপ্পর ফুঁড়ে দিয়েছিলেন তিনি, রাখতেন—রাখলেন কই! আপনারা মায়ের সন্তান। আপনাদের কথা শুনবেন মা। টাকার জন্য ভাববেন না। ওর বাবা তো উড়িয়ে-পুড়িয়ে যায়নি কিছু—সব বজায় আছে। টাকার জন্য ভাববেন না।

রুদ্রেশ্বর গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইল খানিক। পরে বলল, ঠিক আছে। ক্রিয়া করে দেখি আগে।

দিনের পর দিন ক্রিয়া চলেছে। রুদ্রেশ্বর জ্যাঠাকে বলে আশ্রমে আনিয়েছে অরূপকে। আশ্রমে থাকলে—স্বয়ং যম এসেও, তার এলাকা থেকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না। এখানে যমের জারিজুরি চলবে না।

মাস ছয়েক ছিল অরূপ।

এলো আষাঢ়ের সাত তারিখ, এলো বছর ঘুরে অম্বুবাচী। প্রতি অম্বুবাচীতে কামাখ্যায় চলে যায় রুদ্রেশ্বর। মায়ের ডাক আসে। কামাখ্যদেবী অম্বুবাচীর তিনদিন আগে থেকে নাকি রুদ্রেশ্বরকে স্বপ্নে ডাকে। এ ডাক এড়ানো অসম্ভব তার পক্ষে। যেতেই হবে। রুদ্রেশ্বর গেল।

অবাক হবার কথা। রুদ্রেশ্বর চলে যাবার পরদিনই মারা গেল অরূপ। ফুলের মতন ছেলেটা হারিয়ে গেল পৃথিবী থেকে।

ফিরে এসে রুদ্রেশ্বর হা-হুতাশ করেছে অনেক। বলেছে, নিয়তি কে ন বাধ্যতে! আমার পরে ওকেই আশ্রমের মোহন্ত করে যেতুম—সে আর হ'ল না। যম আড়ালে-আবডালে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরছিল। আমার সরার অপেক্ষায় ছিল কেবল। যেই সরেছি একটু—টপ্ করে গিলে ফেলল অমনি। যাক, ও তো

ওর সম্পত্তি দিয়ে গেছে তাকে। কুঁড়ে ঘরের আশ্রম পাকা করে ফেলা হোক তাড়াতাড়ি। ওর স্মৃতি বেঁচে থাকবে তবু। বিরাট জটায় বার দুয়েক হাত বুলিয়েছে রুদ্রেশ্বর। গাঁজার ছিলিমটা দু'টান টেনে, ধোঁয়া ছেড়ে, গান গেয়ে উঠেছে, অতি পাষাণ হৃদয় তব, ওমা তারা ত্রিনয়নী··· ।

এবার শোনো সুহাস, দ্বিতীয় ছায়া-পুরুষের কথা। আবার একটা ঝাঁকুনিতে আমার সমস্ত দেহে নাড়া দিয়ে বলল মঞ্জুষা। প্রথমটা শুনে, অরূপের শোকে আমি কাতর হয়ে পড়লুম কেন—জানি না। অরূপ আমার জ্ঞাতি নয় জাতি নয়। আমার আপনজনদের মধ্য পড়েনা সে। তবু আপনজন বিয়োগের ব্যথা আমায় পাগল করে তুলল। আমি বললুম, থামো মঞ্জুষা। আর শুনতে চাই না আমি।

মঞ্জুষা জোর দিয়ে বলল, শুনতে হবেই তোমায়। একদণ্ড দেরী করলে আমার চলবে না। এর কাঠামোটা বলবো স্রেফ। ছোট্ট।

চব্বিশ-পঁচিশ বছরের যুবক রতন। চেহারা চাবুক একটা। চালে-চলনে কথায়-বার্তায় একটা বীরপুরুষ। পাখি মারার শখ। বন্দুক কাঁধে ঝোলানো। এদিকে এসেছে শিকার করতে। সঙ্গে ওরই বয়েসী বন্ধু একজন। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। জলের জন্যে এসেছে আশ্রমে।

রুদ্রেশ্বর ভেতরে ডেকে যত্ন করে, মাদুরের ওপর বসিয়ে নিজে হাতে বাতাসা আর জলের গেলাস দু'জনের মুখে তুলে দিয়েছে।

বন্ধুর কাছে খবর নিয়েছে প্রচুর পয়সার মানুষ রতন। সৌখিন শিকারী। শহরে ওদের প্রতিপত্তি কে না জানে! লাল মাটির মিহিধুলো উড়িয়ে, ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাচ্ছিল ওরা। চিৎকার করে হাত নেড়ে পেছু ডাকল রুদ্রেশ্বর।

রতন ঘাড় ফিরিয়ে দেখে একবার ফিরল না। ঘোড়ার লাগামটা আলগা করে দিল আরও। এমনিতেই সাধুসন্ন্যাসীকে ভালো লাগে না ওর। ভণ্ড ভণ্ড মনে হয়। পিপাসার খাতিরে আসা। তা বলে ভাব জমাতে হবে নাকি!

বন্ধুর দোনামনা ভাব। ডাকছে যখন ভদ্রতা খুইয়ে লাভ কি—কি বলছে—শোনা বই তো নয়।

বন্ধু এলো কাছে। রুদ্রেশ্বর গলা চড়িয়ে বলল,—ফাঁকা মাঠে হাওয়ায় ভেসেও কথাটা রতনের কানে পেঁছিয় যাতে—শিকারে আজ যেও না তোমরা! যেও না, যেও না! আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি—মস্ত বিপদ!

হুঁঃ বিপদ! মুখ ভেংচাল রতন। বন্ধুকে বলল, চলে আয় শীগগির বলছি। যত সব বুজরুক! এখান থেকে জঙ্গলের ভেতর আমার বিপদ দেখছেন উনি! মন দুর্বল করে দিয়ে পয়সা ঝাড়ার ফিকির। একখানা এক টাকার নোট রুদ্রেশ্বরের দিকে ছুঁড়ে দিল রতন। নোটটা বাতাসে ভেসে দৃষ্টি থেকে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায়।

মৃত্যু ফাঁড়া কাটে নি। যে কোন সময় কাল গ্রাস করবে। আশ্রমে থাকলে সেটা সম্ভব নয়। বাড়িতে গেলে, যমের পোয়াবারো। রতনের ফাঁড়া কাটানো ক্রিয়া চলতে লাগল রোজ। বাপ-মা এসে রুদ্রেশ্বরের পাদপদ্মে টাকা ঢালছে

রাশি রাশি। অবিশ্বাসী ছেলে ক্ষেপে উঠল একদিন। বলল রুদ্রেশ্বরকে, তোমার কারসাজি যত সব। তুমি আমায় পাগল বানিয়ে রাখতে চাও কামিনী-দেবীর মতন। কামিনীদেবীকে দেখে আমার চোখ খুলে গেছে। ওর বাড়ি নিয়েছো—আমারও বিষয়-সম্পত্তি লুটেপুটে নেবে ভেবেছো—সেটি হতে দেব না। তোমাকে তার আগে খুন করে ফেলবো আমি। তোমার সাধুগিরি ফলানো—কীর্তিকলাপ সকলের কাছে বলে দেব।

মায়ের কথা আর আমার কথা বলাতে রুদ্রেশ্বর গুম হয়ে গেল সুহাস।

মা রাতেদিনে কেবল একই কথা ঘুরতে ফিরতে বলে, তুমি কোথায় গেলে? আর তো আগের মতো আসো না! কথা কও না? তোমার জন্যেই আমি রইলুম এখানে। তুমিই তো আমাকে বললে, এখান ছেড়ে কোথাও যাবেনা—যদ্দিন বাঁচবে। আমি এখানেই রয়েছি তোমার জন্যে। কই তুমি?

বাবা অফিসের কাজে এলাহাবাদে গেছল; বুকের অসুখ, মা ছাড়তো না কোথাও একা। সব জায়গায়—যেখানে যখন গেছে, মাকে সঙ্গে নিয়েছে বাবা। সেবারে জিদ ধরল, মাত্র সপ্তা খানেকের জন্য। তোমার আবার যাওয়া কেন? ঝক্কি তো কম নয়,লটবহর নিয়ে ট্রেনে ওঠাউঠি।

সাতদিন বাদে বাবা ফিরল না। টেলিগ্রাম এলো মারা গেছে বুকের কষ্টে। মা কেমন হয়ে গেল শুনে। কেবলি বলে, আমি থাকলে চলে যেত না। কতবার তো অমন কষ্ট হয়েছে বাইরে। বাবার সঙ্গে শেষ দেখা হয়নি। দেখার জন্যে মা ভীষণ উদগ্রীব হয়ে উঠল। যেখানে সাধুসন্ন্যাসীর নাম শোনে, দৌড়ে যায় নাওয়া-খাওয়া ভুলে। সাধুসন্তদের বলে, ওঁকে দেখাতে পারেন?

কেউ বলে, মনকে শান্ত কর—নিজেই দেখতে পাবে। কেউ বলে, যে যাবার গেছে, সে কি আর ফিরে আসে! মিছে মায়ামোহ ত্যাগ কর। কেউ বলে, আত্মাকে কষ্ট দিয়ে আর ডেকে এনে কি লাভ! যেখানে গেছে বেশ শান্তিতে আছে। এখানে শুধু অশান্তি আর অশান্তি।

এত কথা শোনার পরও বাবাকে দেখার স্পৃহা মায়ের এতটুকু কমেনি। বেড়েছে শতগুণে। শান্তি পেয়েছে এসে রুদ্রেশ্বরের কাছে। রুদ্রেশ্বর বলেছে, তোমার স্বামীকে তুমি দেখতে পাবে। অমাবস্যার রাতে এখানে চলে আসবে।

এসেছে মা।

রাত্তির বেলা পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো রুদ্রেশ্বর। মাকে ঘরের বাইরে বসিয়ে রেখে দরজা বন্ধ করে ভেতরে ছিল এতক্ষণ।

মা দেখেই চমকে উঠেছে। বলেছে, সত্যিসত্যিই তুমি এসেছো আমার ডাকে! সুহাস, আমি কিন্তু রুদ্রেশ্বরকেই দেখেছি! বাবাকে দেখিনি! মাকে বলেছি, তুমি কি বলছো কাকে! সাধুবাবা যে।

আমার সামনে হাতটা দোলালো রুদ্রেশ্বর। ঘুম এলো আমার। দু' চোখ বুজে দেওয়াল ঠেসান দিয়ে বসে রইলুম। তখন এগারো থেকে বারোয় পড়ছি! ছ' সাত বছর আগের কথা সেটা।

কানে—মায়ের কথা শুনছি ঘুমের ঘোরে শোনার মতন। মা বলেছে, তুমি

খানে থাকতে বলছো মঞ্জুষাকে নিয়ে—নিশ্চয় থাকবো। কোথাও যেতে মানা ? নিশ্চয় যাবো না। তুমি আমার জন্যে—এখানে থেকে গেলে বলছো ?
ই আমার যে কি আনন্দ বলে বোঝাবো কি !

এই মতই প্রথম প্রথম কদিন দেখার পর বাবাকে দেখেনি আর। দেখতে াইত কেবল। উন্মাদ একেবারে। আমার কাছে শুনেছে রতন। খুন করতে : রুদ্রেশ্বরকে। হাত-পা অবশ হয়ে এসেছে। বাক্‌রোধ হয়ে গেছে।

তার দু'দিন বাদে রুদ্রেশ্বর আবার বাইরে গেছে। শ্মশানে কালীপুজো ; হবে তাকে। মা স্বপ্নে আদেশ করেছে। পরের দিন দৌড়ে এসে বলেছে, আমার কি রকম করে উঠল মঞ্জুষা। ঘট-স্থাপনা করতে গিয়ে হাত কেঁপে ট উলটে পড়ে গেল। আমি পরিষ্কার দেখতে পেলুম, একটা ছায়া রতনকে াপটে ধরেছে।

আমি রুদ্রেশ্বর রতনের ঘরে প্রবেশ করেই শিউরে উঠলুম। রতন খাট থকে মেঝেয় মুখ থুবড়ে পড়ে।

মঞ্জুষা আবার আমায় ডাকল।—শুনছো সুহাস ?

আমি বললুম, হ্যাঁ। তোমায় বারণ সত্ত্বেও এই সমস্ত শোনানোর কারণ ৳—বুঝছিনা।

—পরে বুঝবে! এবারে বেশীক্ষণ নয়, লগ্ন বয়ে যাবার মুহূর্ত এগিয়ে াসছে। একটু পরেই শুরু। তৃতীয় ছায়াপুরুষের কাহিনী তাড়াতাড়ি শেষ রে ফেলতেই হবে আমাকে। একটুখানি।

সৌরভ।

সৌরভ এসেছে জঙ্গল সাফ করতে। ঘন জঙ্গলের বাঁশঝাড় বড় বড় গাছ বিক্রি করার ইজারা নিয়ে এসেছে। হাসি হাসি মুখ, লম্বা ছিপছিপে ওয়ান। বছর তিরিশ বয়েস। ধোপদুরস্ত শার্ট-প্যাণ্ট জুতো-মোজা! মুখে

জায়গা-জমি গাছগাছালি—চতুর্দিকে চোখ বুলোচ্ছে। ভোরের মিষ্টি াতাসে লাল ধুলোর রেশ ভেসে ওঠেনি। বাইরের চাতালে বসে নারকোল ালার হুঁকোয় মুখ দিয়ে গুড় গুড় করে তামাক টানছে রুদ্রেশ্বর।

একটা পাটির আসনে পা ঝুলিয়ে বসেছে। মাটির ওপর খড়ম দুটো পড়ে। মাথার অজগর জটা লুটোচ্ছে। রক্তচক্ষু ঘুরছে ক্ষণে ক্ষণে, কিছু একটা তলব ভাঁজছে। পরনের টকটকে লাল ধুতিটা পেটের কাছে কষি খোলা। ভূরিভোজের ভুঁড়ি ঝুলে পড়েছে উরু অবধি। কুচকুচে কালোবরণে লাল কাপড় মূর্তিমান ভয় একটা।

পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল সৌরভ, গলা খাঁকারি দিল রুদ্রেশ্বর। থমকাল সৌরভ। রুদ্রেশ্বর ডাকল—মশাইয়ের আসার কারণ ?

কারণ জানাল সৌরভ। রুদ্রেশ্বর বিচলিত হ'য়ে পড়ল খুব। কি যেন ভাবল। বলল, মশাইয়ের সময়টা কিন্তু ভালো দেখছিনা। একটা বিপদ—বলি—ভয় পাবেন না তো!

—না, না। বলুন না! আমার ভয়ডর অত নেই, দেশবিদেশে ঘুরি।

—দিন আষ্টেক বাদ দিয়ে না হয় গাছকাটা শুরু করুন! ওটা শ্মশ জঙ্গল। অনেক সাধুর সমাধি আছে ছোট ছোট। তা-ছাড়া বাতাসে কত প্রেত-আত্মা ভেসে বেড়াচ্ছে ওখানে। ওখানের গাছের সঙ্গে গাছ হয়ে মি রয়েছে।

—দেখুন একটা প্রশ্ন আমার—যখন আত্মার কথাই তুললেন—আত্মা কারো অনিষ্ট করতে পারে?

পারে। রুদ্রেশ্বর মোটা-মোটা ভুরু নাচিয়ে বেশ জোর দিয়েই বলল বলল, আমি প্রমাণ পেয়েছি ভূরি ভূরি। এখনকার ছেলেছোকরারা করবে না। ফল ভোগও করছে তেমনি। কথায় বলে, লঘুগুরু মানন কালের শাসন জাননা! কটা দিন অপেক্ষা করলে ক্ষতি কি মশাইয়ের!

—ক্ষতি—আর্থিক ক্ষতি।

প্রাণের চেয়ে কি ওটাই বড় হ'ল?

—ভূত কি ঘাড় মটকাবে নাকি?

—পরিহাসের কথা নয়। ভেবে দেখুন, ওটা অভিচার ক্রিয়ার স্থান।

—আচ্ছা, অবান্তর হলেও, আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন? আত্মা যদি এতই প্রবল—যে মানুষকে খুন করা হল, তারা আত্মা খুনের প্রতি শোধ নেয়না কেন?

—নেয়। মৃত্যুর সময় যে মানুষের মনে হয়—প্রতিশোধ নেব, তার আত্মাই নেয়। যে কোন কিছু ভাববার আগেই শেষ হয়ে যায়—সে নিতে পারে না। এতেই আপনি ভেবে নিয়েছেন—প্রতিশোধ নেয় না কেন?

সাঁওতালী কুলিরা এসে জানিয়েছে সৌরভকে—পদে পদে মড়ার খুলি বা মাথার সঙ্গে ঠোক্কর খেতে হচ্ছে তাদের, ভয়ে জঙ্গলের ভেতর ঢুকতে চাইছে না কেউ। মুরগী বলি দিয়ে গাছতলায় জাহির দেবতার কাছে প্রার্থনা করছে ওরা। অপদেবতারা না ঘাড়ে চাপে গাছ কাটার সময়।

রুদ্রেশ্বর হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, মশাই, গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগে—বুঝলেন? গোঁয়ারতুমি করা পাপ। যাবেন না। আমি একটু ক্রিয়াকলাপে কাটিয়ে দি-ই—তারপর।

আবার বাইরে চলে গেছে রুদ্রেশ্বর। এবারে আর জায়গার নাম করেনি। কেবল বলছে—স্বপ্নে দেখেছি, পূর্বদিকে একটা মহাশ্মশান। খুঁজে নেব ঠিক—জগদম্বাই পথ দেখিয়ে দেবেখন।

আটদিন সময় দিয়েছিল রুদ্রেশ্বর। অপেক্ষা করেছিল সৌরভ। সাত দিনের দিন জীবন প্রদীপ নিভে গেল তার। স্বপ্নে কি সব বিভীষিকা দেখে—অনেক ভয়াবহ অসংলগ্ন কথা বেরিয়েছিল নাকি মুখ দিয়ে। পাশের লোক ডেকে—ঠেলে ঘুম ভাঙাতে পারেনি ওর। মরণনিদ্রা নেমে এসেছে সারা দেহ জুড়ে।

কথা শেষ হতে আমার সামনে থেকে সরে দাঁড়াল মঞ্জুষা। পেছু ফিরে

াকিয়ে হেসে উঠল। সেই বৃদ্ধা—সৌম্য শান্ত মূর্তির পরিব্রাজিকা-ন্ন্যাসিনী হাসিমুখে এগিয়ে আসছে লাঠি ঠুকে ঠুকে।

সন্ন্যাসিনী চিত্তেশ্বরী মায়ের সঙ্গে আগে একবার দেখা হয়েছে আমার। ামি-মঞ্জুষা যখন দু'জনে পাশাপাশি টিলার ওপর বসে। বিয়ের পাকাপাকি য়ে গেছে। দুজনে আনন্দে বিভোর।

পৃথিবীতে এত আনন্দ কোথায় জমা ছিল জানিনা। ওইদিনই অনুভব রেছি আমি। ওই দিন বলতে—কালকের বিকেলে।

চিত্তেশ্বরী আমাদের পেছনে এসে খিলখিল করে হেসে উঠেছে। পাশে এসে সে পড়েছে বেহায়ার মতন। আমরা ওর হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে উঠে ড়েছি। দেখি, সঙ্গ নিয়েছে চিত্তশ্বরী। পেছু পেছু আসছে লাঠি ঠকঠক রে।

আমরা মহা ফাঁপরে পড়লুম। পাগলী নিশ্চয়—হাসিটা কেমন কেমন। া চলালুম খুব হনহন করে—যাতে না আমাদের নাগাল পায় ও।

ওকে অনেক তফাতে ফেলে চলে গেছি। আমাদের নজরে পড়ছে না ার। একটা অনেকখানি চওড়া গুঁড়িঅলা বটগাছের তলায় এসে বসলুম ামরা!

আষাঢ়ের বিকেল।

মাথার ওপর থেকে রোদ সরেছে। টুকরো টুকরো মেঘ জমছে। যেদিন ামি এসেছিলুম এখানে, অর্থাৎ এদেশে—মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে সম্পূর্ণ াকাশ। সেটা মাঘের মাঝামাঝি। কি বৃষ্টি—ঝেঁপে একেবারে।

কোথায় দাঁড়াই—তলকূল খুঁজে পাচ্ছি না। ধু-ধু প্রান্তর। গাছ নেই কটাও যে, তলায় আশ্রয় নেব। একে শীতের আমেজ রয়েছে বেশ। তার পর আরও জেঁকে বসতে লাগল। হাড়ে-হাড়ে ঠকঠকানি।

দাঁতকপাটি পড়ার যোগাড়। ভিজছি দৌড়চ্ছি কাঁপছি। মাঠের পর ঠ পেরিয়ে এলুম আশ্রমবাড়ির ধারে। দূর থেকে অন্ধকারে আলো দেখে-ছলুম। একতলা কোঠা। মানুষের বাস আছে তাহলে এই নির্জন জনবসতি-্য প্রান্তরে।

আমার তখন এমন অবস্থা—হাতেপায়ে খিল ধরছে—বুকের ভেতর গুড়-ড়ে। একটু তাপ একটু আগুন না পেলে, বুকের রক্ত হিম হয়ে আসছে কেবারে—জমাট বেঁধে যাবে।

উন্মত্তের মতন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়েছি। হাত ালিয়েছি, পা চালিয়েছি। হাতের ঘুষি পায়ের লাথি। দস্যির মতন অত জোর কোত্থেকে পেলুম জানি না। বাড়ির দরজা কাঁপছে থরথর করে—সঙ্গে গোটা বাড়িটাও বুঝি।

দরজা খুলে, অবাক চোখে তাকাল মঞ্জুষা। ভেবেছিল রুদ্রেশ্বর, দেখল

অচেনা আগন্তুক। মুখ দেখে মনে হল, ভড়কে গেছে খুব।

ওর ভয় ভাঙার জন্য আমি বললুম, অজানা হলেও, আমি চোরডাকাত নই বিশ্বাস করে একটু আশ্রয় দিতে পারেন নির্ভয়ে। বড় দুরবস্থা আমার দেখছে তো!

আশ্রয় দিয়েছে মঞ্জুষা।

ঝড়ঝঞ্ঝা মাথায় করে—কোথায় গেছল কে জানে—ফিরে এসেছে রুদ্রেশ্ব বাড়িতে। আমাকে দেখে বিস্মিত। আমি তখন কাঠের আগুন পোহাচ্ছি ব্যবস্থা করে দিয়েছে মঞ্জুষা। ছবি আঁকার ক্যানভাস-স্ট্যাণ্ড আঁকার সরঞ্জা পাশে রাখা।

রুদ্রেশ্বর চেয়ে দেখে বলল, এসব কি? বাবাজীবনের থাকা হয় কোথায়?

—এখানে—পাণ্ডব বর্জিত জায়গায় আসার উদ্দেশ্য?

আমি সবিনয়ে বললুম, আমি শিল্পী। আমার বাবাও। কলকাতা থেকে আসছি। হেতাহোথা ঘুরে ঘুরে প্রকৃতির ছবি আঁকি।

—ও বুঝেছি! বেশ বেশ, এখানে থেকে যাও কিছুদিন। এ জায়গা ভালো লাগবে। মানুষের ছবিও আঁকোটাকো নাকি?

হ্যাঁ, আপনাদের দয়ায় পারি সব। আপনাকে দেখে আঁকতে ইচ্ছে করছে এখুনি। সন্ন্যাসীর ছবি আঁকিনি কোনদিন।

—এখনও তো কাঁপুনি যায়নি তোমার! আজ আর নয়। রইলে যখ —ধীরেসুস্থে হবে'খন।

রুদ্রেশ্বরের সেবাযত্নে আমি অভিভূত হয়ে গেছি। মনে হয়েছে, বাইরে অতি আপনজনের কাছে এসে গেছি। ওকে আমার খুব ভালো লেগেছে এ দুনিয়ায় এমন মানুষও আছে! 'খুঁজলে রত্ন পাওয়া যায়', প্রবাদটা সত্যি।

রাত হলে, আশ্রমে ফিরে এসে শুয়েছি, ভোর হতেই বেরিয়ে গেছি ক্যানভাস স্ট্যাণ্ড কাঁধে করে। সারাদিন ঘোরা আর আঁকা,আঁকা আর ঘোরা। এ গাছে তলা, এ-টিলা থেকে ও টিলা, ও টিলা থেকে সে-টিলা।

প্রকৃতির দৃশ্য এঁকেছি, সেই দৃশ্যের মধ্যে রুদ্রেশ্বরকে বসিয়েছি জ্যোতির্ম পুরুষ এঁকে। রুদ্রেশ্বর দেখে, ভাবে গদগদ হয়ে পড়েছে। বলেছে, আমি এমন—আমার দেহে দিয়ে এত জ্যোতি বেরোচ্ছে—এ আমি জানতুম না।

হেসে বলেছি, আমার ধারণা, বাবার মুখে যা শুনেছি, সন্ন্যাসীরা মানুষকে আলোর রাজ্যে নিয়ে যান—তাই আপনার দেহের চর্তুর্দিক দিয়ে জ্যোতি বেরোচ্ছে —দেখিয়েছি!

বেশ করেছো, বেশ করেছো! বড় ভালো ছেলে বাবা তুমি। তুমি অনে বড় হবে। তোমার দেখার চোখ আছে। ধারণা নয়, সত্যিই এঁকেছো তুমি আমার ভক্তরা বলে, পুজোর সময় নাকি আমি এমনটি হয়ে যাই। আর আঁকো আরও আঁকো। সস্নেহে আমার পিঠে হাত চাপড়েছে রুদ্রেশ্বর।

পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করেছি আমি। রুদ্রেশ্বর মাথায় হাত দি

আশীর্বাদ করেছে প্রাণভরে। মুখে বলেছে, শিবা, শিবা। সুহাসের মঙ্গল করিস। অন্তত আমার মুখ চেয়ে।

প্রাণের আবেগ গড়িয়ে গড়িয়ে পড়েছে মাতালের মতন রুদ্রেশ্বরের গানের স্বরে। মন মাতালে মাতাল আমি, সুধা খাই মা সুরা বলে। মদের বোতলের ছিপি খুলে ঢক ঢক করে ঢেলেছে গলায়। আবার গান ধরেছে, বাবা বো-বো ব্যোম বলে, মদ খেয়ে মা গায়ে পড়ে ঢলে, আমি তাদের পাগল ছেলে।

আমি বলেছি আমার ইচ্ছের কথা।—সাধনার যজ্ঞের ছবি একটা আঁকবো।

সারা শরীরটা অদ্ভুত ভাবে নড়ে উঠল রুদ্রেশ্বরের। বলল, গোপন সাধনা প্রকাশ হওয়া নিষেধ। অধিকারী নয় যে, সে অন্ধ হয়ে যায় দেখলে। অমন ইচ্ছে মনে ঠাঁই দিওনা বাবা!—পাষাণী মা গো আমার অবোধজনে কর নিজগুণে ক্ষমা।

রুদ্রেশ্বরের ছবি এঁকেছি আমি অনেক। রুদ্রেশ্বর আহ্লাদে আটখানা। আর আমার মনও পুলকে হাবুডুবু খেয়েছে। ছবি এঁকেছি আমি মঞ্জুষারও! নানা ভঙ্গির। মঞ্জুষা দেখে অবাক হয়ে বলছে, কোথায়—কখন—এ অবস্থায় দেখলেন আপনি আমায়?

আমি বলেছি, শিল্পীর ভেতর এক অদৃশ্য চোখ আছে। তাতেই সব দৃশ্য ধরা পড়ে—সব অবস্থা কি আর সবার চর্মচক্ষে দেখতে হয়!

মঞ্জুষা বলেছে, প্রকৃতির পূজারী আপনি, আমার ছবি নিয়ে এত মাতামাতি কেন?

মঞ্জুষার চোখ ওর আচার-ব্যবহার আমায় এমন মুগ্ধ করে রেখেছে যে, আমি প্রকৃতির সাঁঝ-সকাল-দুপুর আঁকতে গিয়ে মঞ্জুষাকে এঁকে ফেলি নিজের অজ্ঞাতসারে। মঞ্জুষা মাসচারেক আমার হৃদয়ে বাসা বেঁধে ফেলেছে। নিজের উচ্ছ্বাস চাপতে না পেরে, আমি এই প্রথম ওকে 'তুমি', সম্বোধন করে ফেললুম।

বললুম, তুমিও আমার প্রকৃতি।

ওর মুখখানা কিরকম যেন হয়ে গেল। বলল, বাড়ি ফিরবেন কবে?

তখনও কি অপনার প্রকৃতি হয়ে থাকবো আমি, না হারিয়ে যাবো? মঞ্জুষা হেসে উঠল।

আমি ওর ওই ছবিটাও আঁকলুম। টিলার ওপরে বসে মঞ্জুষাকে দেখাচ্ছি, এসে পড়ল রুদ্রেশ্বর। ছবি দেখতে চাইল। দেখে ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছে। বলেছে, মঞ্জুষা কুমারী জানবে।

—আমি জানি। আমি ওকে বিয়ে করতে চাই। আজই আপনাকে বলবো বলবো ভাবছিলুম।

—তোমার বাড়ি রাজি হবে?

—আমার মতেই বাড়ির মত। আমার বাড়ি খুব উদার—সমস্ত সংস্কার-

মন্ত। আমার দাদাও নিজে বিয়ে করেছে। বাড়ি বিবাহ-উৎসব করেছে ধুমধামে।

কোন কথা না কয়ে, কি ভাবতে ভাবতে এলোমেলো পা ফেলে ফেলে চলে গেছে রুদ্রেশ্বর।

আমি বললুম, মঞ্জুষা, 'আপনি' কথাটা ছাড়ো এবার। বড্ড পর পর মনে হয়। নামের সঙ্গে 'বাবু' —বড্ড কানে লাগে।

—তবে কি 'দাদা' ?

—আরে রাম কহ। কেন—নাম ধরলে কি হয় ?

—অভ্যেস হয়ে গেলে, বাড়ীর লোক বলবে কি ?

—আমার নিজস্ব মত—জীবন সঙ্গিনী মস্ত বড় বন্ধু। এখানে অন্য কিছু শুনতে ভালো লাগে না আমার।

মঞ্জুষা একটু চুপ করে থেকে বলেছে, অভ্যেস করতে হবে।

দিন সাতেক কেটে গেল। রুদ্রেশ্বরের মুখের মেঘ কাটল না। হেসেছে, তার মধ্যে দিয়ে কান্না ঝরছে যেন। বিয়ের দিনও ধার্য করে দিয়েছে নিজেই, তবুও মনে ওর সুখ নেই, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কেন ? হয়তো কারো বিপদ কাটানোর জন্যে ব্যস্ত।

চিত্তেশ্বরীর হাত থেকে পালিয়ে বেঁচেছি ভেবেছিলুম, জষ্ঠির আকাশে মেঘ জমতে মাঘের বৃষ্টির রাজ্যে ভেসে চলে গেছলুম—সজাগ হয়ে উঠলুম চিত্তেশ্বরীর ফোগলা মুখে কাঁপাগলার হাসি শুনে।

বুড়ি এসে গেছে, ছুঁড়ির পেছনে।

সামনে এসে বলল, বুড়ি হলে কি হবে—এখনও চলার শক্তি ঠিকই রেখে-ছেন মা ভবানী। মঞ্জুষাকে কাছে ডেকে বলেছে, আয় মা! তোর জন্যেই আমার আসা।

মাথায় হাত রেখে দিল খানিক। ঠোঁট দুটো নড়ছে শুধু! কিছু বলছে বোধহয় চিত্তেশ্বরী। দু চোখ বুজে রয়েছে মঞ্জুষা।

চিত্তেশ্বরী হাত সরিয়ে নিতেই চমকে উঠে চোখ খুলেছে মঞ্জুষা। ভয়ের ছায়া চোখে মুখে। চিত্তেশ্বরীকে জড়িয়ে ধরে বলেছে, একি দেখলুম আমি ? তুমি মাথায় হাত রাখতে এমন হল কেন আমার! একি অলক্ষুণে ব্যাপার! কেন তুমি এলে—কে তুমি ? আমার এ সর্বনাশের ভয় কেন দেখালে তুমি! বল বল বল, পাগলের মতন দুহাত ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে চিত্তেশ্বরীকে।

আমি কিছু বুঝতে পারছি না—কেমন হয়ে যাচ্ছি। মঞ্জুষাকে চিত্তেশ্বরীর কাছ থেকে টেনে নিয়ে এলে ভালো হয়—কি দেখল—কেন ও অমন হয়ে গেছে—মনের চিন্তা মনেই মিলিয়ে যাচ্ছে, উঠতে ইচ্ছে করছে না। দেহে যেন শক্তি নেই কোন আমার। আমি বসেই আছি। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে টিলার ওপর।

চিত্তেশ্বরীর হাত ছেড়ে দিয়ে মঞ্জুষা কাঁদছে হাউহাউ করে।

চিত্তেশ্বরী মঞ্জুষার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, অস্থির হলে

চলবে না মা। একটুও ভয় দেখাইনি তোকে। যা সত্যি—দেখেছিস।

নিজের পরিচয় দিয়েছে চিত্তেশ্বরী। সে দেশে দেশে বেড়ায় গুরুর নির্দেশে। যেখানে যেখানে অমঙ্গল শক্ত ভিত গেড়ে বসেছে—ও চোখের সামনে দেখতে পায়। আসে। গুরুর শক্তি ওকে দিয়ে যা করায় ও তাই করে। গুরুর বাণী—মানুষের জন্যেই তন্ত্রের ক্রিয়া সাধনা। অমঙ্গল করার জন্যে নয়। লোকের মনের ছবি দেখার শক্তি অর্জনের ক্রিয়া গুরুদেব শিখিয়েছে অতি যত্নে। গুরুর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে বলে, গুরুদেবই নামকরণ করেছে ওর চিত্তেশ্বরী।

চিত্তেশ্বরীকে এই গাঁয়ে কে যেন টেনে নিয়ে এসেছে জোর করে। সাত রাত্তির স্বপ্নে আসছে একটি লোক। বছর চল্লিশ বয়েস। বড় বড় চোখ, কোঁকড়ানো চুল, চিবুকে কাটা দাগ, তপ্তকাঞ্চন বর্ণ।

বিস্ময়ে বলে উঠেছে মঞ্জুষা, আমার বাবা।

চিত্তেশ্বরী বলেছে, ওই পুরুষ—এই গাঁও দেখিয়েছে আমায় স্বপ্নে, দেখিয়েছে তোকে, দেখিয়েছে ওই ছেলেটিকে, এসে পড়েছি আমি অনেক ঘুরতে ঘুরতে। দেখা পেয়েছি তোদের।

আমি অনুভব করেছি, এখানকার আবাহাওয়ায় প্রেতাত্মার অভিশাপ। আমি আমার মনের চোখে দেখেছি এক একজন প্রেতাত্মাকে। দেখেছি কিভাবে মৃত্যু হয়েছে তাদের—কি কারণে—তাও জেনেছি। প্রথম জনের বিষয় লিখিয়ে নেওয়ার পর শেষ করেছে প্রতিফলন ক্রিয়ায় নরপিশাচ লোকটা। এখানে আসার পথে যার অত সাধুনাম শুনেছি, সেই অসাধু রুদ্রেশ্বর।

ভয়ের ছবি চিন্তার মধ্যে দিয়ে পাঠিয়েছে কণ্টক নিপাতের জন্য। বিভীষিকার স্বপ্নে হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেছে তিন জনের। বাঁচানোর নামে তিন জনকেই শেষ করেছে লোকচক্ষুর আড়ালে মারণ ক্রিয়ায়।

অরূপ চলে যাবার পর রতন। রতনকে সরিয়েছে নিজের গুণের কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে বলে। আর সৌরভকে? শ্মশান ময়দান করে ফেললে—অম্বুবাচীর নামে বাইরে যাচ্ছি বলে ক্রিয়াকলাপ করবে কোথায়—এমন মানুষ লুকিয়ে রাখার জঙ্গল-শ্মশান পাবে কোথায়!

চিত্তেশ্বরীকে আমার রহস্যময়ী নারী মনে হয়েছে। কি যা-তা বকছে! আর সেই বকুনি একমনে শুনে যাচ্ছে মঞ্জুষা। কোন বাদপ্রতিবাদ নেই মুখে, বড় বড় চোখে কথাগুলো গিলছে। আর শিউরে শিউরে উঠছে।

চোখের পাতায় ঘুমের বোঝা চেপে বসছে আমার। আমি চেয়ে থাকতে পারছি না আর চেষ্টা করেও।

চিত্তেশ্বরীর মুখের বিরাম নেই! গড়গড় করে আরও কি সব বলছে। সব কথাই জড়িয়ে জড়িয়ে কানে বাজছে আমার। রুদ্রেশ্বরের ক্রিয়া রুদ্রেশ্বরকে ফিরিয়েই দিতে হবে তোকে। আমিই তোকে দিয়ে করাবো সে কাজ—শীগগির শুরু কর। দেখলি তো রুদ্রেশ্বর কার্য আরম্ভ করে দিয়েছে। বল, বল, রুদ্রেশ্বরায়াং গচ্ছ, গচ্ছ···।

আর আমি কিছু জানিনা। এর পর একেবারে শ্মশানের জঙ্গলে আমি। রাক্ষুসে গাছের কবলে। আমার মৃত্যু আমি দেখলুম! দ্বিতীয় আমিকে দেখছি। মাটি চাপা অপঘাত মৃত্যু দেখেছি মঞ্জুষার। যজ্ঞের আগুনে আধ-পোড়া হতে দেখেছি মঞ্জুষার মৃতদেহ।

মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে শেয়ালের মুখে পড়ল—তাও দেখলুম।

প্রথমে অস্পষ্ট দেখছি সন্ন্যাসীকে, এখন বুঝেছি—ওই-ই রুদ্রেশ্বর। রুদ্রেশ্ব-রের মারণ যজ্ঞ আর অট্টহাসিতে আমার দ্বিতীয় মৃত্যু ঘনিয়ে আসছিল। এলো না, মঞ্জুষার আমার মতন দ্বিতীয় দেহ ধরে দাঁড়িয়ে পড়তে। রুদ্রেশ্বরায়াং গচ্ছ, গচ্ছ-মন্ত্রে। যজ্ঞের আগুন নিষ্প্রভ হয়ে গেল। মুখ থুবড়ে শুয়ে পড়ল রুদ্রেশ্বর বুক চেপে।

আমার হাত দুটো ভীষণ ঝাঁকুনি দিচ্ছে মঞ্জুষা। উঠে বোসো, উঠে দাঁড়াও। দাঁড়াও, দাঁড়াও, দাঁড়াও।

আমি উঠে বসলুম। একটা আচ্ছন্ন-আচ্ছন্ন ভাব। তন্দ্রাঘোরে মঞ্জুষার কথা শুনছিলুম এতক্ষণ, ভাবছিলুম ওকেই। ঘুম ঘুম চোখে দেখছি, চিত্তেশ্বরী হাসছে, ভাবছিলুম হাসছে মঞ্জুষাও। মঞ্জুষা দুই বাহু ধরে টেনে তুলে দাঁড় করাতে চেষ্টা করছে।

আমার সারা শরীরের অবশ অবস্থা কেটে গেছে। আগেকার শক্তি ফিরে পেয়েছি, আমি উঠে পড়লুম। মনে হচ্ছে, আগের দেহে ফিরে এসেছি আমি। নিজের কাছে নিজেকে আশ্চর্য ঠেকছে খুব।

নিজের গায়ে হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করে দেখছি আমি। না, রক্তমাংসের শরীরের। এ-আমি মেঘে জমা সূক্ষ্ম শরীর নয়। হাত ধরলুম মঞ্জুষার। মঞ্জুষাও তুষার-প্রতিমা নয়। আমার মতন রক্তমাংসের।

চিত্তেশ্বরী হাত বাড়িয়ে দিল। ওর হাত স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক হয়ে উঠলুম আমি একদম।

হেসে বলল চিত্তেশ্বরী, এতক্ষণ দেখেছিস যা—সমস্ত মৃত্যু-বিভীষিকার স্বপ্ন। রুদ্রেশ্বরের মারণ-প্রতিফলন ক্রিয়ার ফল। আগের তিনজনের মতন দশা হত তোর। করতে চেয়েছিলও তাই। পারল না। তোর ওপর আক্রোশ মঞ্জুষাকে ছিনিয়ে নিচ্ছিস বলে। মঞ্জুষাকে নিজের ভৈরবী করার বাসনা ছিল রুদ্রেশ্বরের। বিভীষিকার স্বপ্ন দেখিয়ে মৃত্যু আনতে পারেনি তোর। অন্যায়ের প্রতিফল পেয়েছে রুদ্রেশ্বর। মঞ্জুষাকে দিয়েই ওর প্রতিফলন-মারণ ক্রিয়ার ফলা-ফল ফিরিয়ে দিয়েছি আমি ওরই বুকে।

চিত্তেশ্বরী আমাকে আর মঞ্জুষাকে নিয়ে গেল রুদ্রেশ্বরের পরিণতি দেখাতে।

মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে, ঘন বাঁশঝাড়ের মধ্যে—দু'পাশের গাছ দু'হাতে ফাঁক করে করে শ্মশানের মধ্যে প্রবেশ করেছি আমরা।

খানিক তফাতে যজ্ঞের আগুন জ্বলছে। নিভু নিভু। তারই ধারে বিশাল-দেহী রুদ্রেশ্বর বুকে হাত চেপে মুখ গুঁজরে পড়ে রয়েছে। নিষ্প্রাণ দেহ।

চোখে হাত চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মঞ্জুষা। টলছে, ধরে ফেললুম আমি।

চিত্তেশ্বরী লাঠি ঠুকে ঠুকে বেরিয়ে যাচ্ছে শ্মশান থেকে।

বললুম, দাঁড়ান একটু।

চিত্তেশ্বরী বলল, এখানকার কাজ শেষ হয়ে গেছে আমার। আর একতিল থাকার উপায় নেই। অন্য জায়গার ডাক আসছে কানে।

গাঢ় সবুজের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল চিত্তেশ্বরী। যেমন এসেছিল হঠাৎ, তেমনি চলেও গেল হঠাৎ।

আমি ভাবছি—কে এ! এই দুনিয়ার মানবী, না অন্য জগতের জননী!

চার

বাংলোর ভেতরে বসে আমি। রেণুকণা ভুরুর ওপর হাত রেখে সরু চোখ করে দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। সেই দ্বৈতারি পাহাড়। ডাকটা শুনত পাহাড় থেকে, মাটি থেকে না বাংলো থেকে? মতিভ্রম ঘটে যেতে প্রতিরাতেই, ছেঁকে ধরত ত্রাসে। অপার্থিব ভয়ঙ্কর গলার স্বরটা তাকে ঘর থেকে টেনে বার করবার কি নিদারুণ চেষ্টা করেছে।

নিজের সঙ্গে নিজে যুদ্ধ করেছে। আর যুদ্ধ করেছে তার বুকের হাড়-পাঁজরা ভেঙে গুঁড়িয়ে হৃৎপিণ্ডটাকে টেনে বার করে নিয়ে আসবে যে, তার সঙ্গে।

দরজা থেকে সরে এলো রেণুকণা। আমার সামনে এসে বসল। ডায়েরির পাতা খুলে আমার হাতে এগিয়ে দিল। আমি ওর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালুম। কাঁপছে চোখের পাতা কাঁপছে ঠোঁট কাঁপছে সর্বশরীর। চোখ নামালুম আমি ডায়েরির পাতায়…।

বিভীষিকার রাজ্য নেমে আসছে দ্বৈতারি পাহাড়ের কোলে। নেমে আসছে অন্ধকারে ঘেরা ঘন সবুজের জঙ্গলে। দামসানালার কালো জলে। আর নামছে এই বাংলোটার আঙিনায়।

গভীর রাতে জেগে উঠবে ওই রাক্ষুসে পাহাড়। থর থর করে কেঁপে উঠবে ওর সারা অঙ্গ। পাহাড়টা এগিয়ে আসবে, সেই সঙ্গে কত অজানা অতৃপ্ত আত্মা। ওই পাহাড়ের বুকে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে যারা। অকালে অপঘাতে প্রাণ গেছে। পড়েছে বাঘের কবলে কিংবা অন্য কোন নৃশংস উপোসী পশুর আগুনদৃষ্টির সামনে। দামসানালার জল ভিজে উঠেছে তাজা রক্তের উষ্ণ ছোঁয়ায়।

নালার সাদা জল ফিকে লাল হয়ে উঠেছে প্রথমে, পরে গাঢ়, আরও গাঢ়। জলটার আসল রঙই বদলেছে। কালনাগিনীর কালো বিষের রঙ এখন।

এখানে জন্তু-জানোয়ারের প্রাণও মানুষ ছিনিয়ে নিতে কসুর করেনি। পশুর খুনীপ্রবৃত্তি জেগে উঠেছে এখানে মানুষের মধ্যেও। মানুষের কাছে সাক্ষাৎ মৃত্যুর ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে গেছে। অন্যের প্রাণ তার নিজের মুঠোয় না পুরে নিবৃত্তি হয়নি।

নিবৃত্তি হয়েছে কি দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবার পরেও কারো? না, আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে? হয়ে ওঠে রাতের আঁধারে। কি বীভৎস, কি নির্দয়,

কি প্রতিশোধস্পৃহায় কাতর। হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় নিজেদের ইচ্ছে-পূরণের জন্যে।

হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অনঙ্গ।

কিন্তু কেন? আমি না ম'লে ওর শান্তি হ'চ্ছে না কেন? আমি জানি ওর মৃত্যু খুব নির্মম। চোখে দেখা যায় না। ওর মৃত্যুতে কি কোন হাত ছিল আমার? যে মেরে ফেলেছে, সে আমারই লোক। আমি কারণ—এটাও ঠিক। তবু মনে হয় মৃত্যুর অপরাধী নই আমি। তবে কেন আমার এ নির্যাতন?

প্রতিরাতে ঘরের চারপাশে আগুনঝরা নিঃশ্বাস শুনতে শুনতে বুকের রক্ত জমাট হয়ে আসে আমার। চতুর্দিকে রক্তচক্ষুর পাহারা। ঘর থেকে বেরনোর উপায় নেই, পালানোর পথ নেই কোন। এভাবে মানুষ বাঁচতে পারে কেমন করে?

কানে ভেসে আসে ফ্যাসফেসে আওয়াজ। কে যেন বলে, তুই খুনী, তুই খুনী, তুই খুনী। আমার স্নায়ু অবশ হয়ে আসে একজনের কথা ভেবে। সে অনঙ্গ নয়। তার মৃত্যুটা হল কেন অমন সময়? আমার জন্যে কি? যা শুনছি, তাই কি সত্যি? আমি খুনী!

আমি পাগল হয়ে উঠি একলা ঘরে। দম বন্ধ হয়ে আসে আমার। দূরে কাছে কেউ নেই যে, চিৎকার করে ডাকব—বাঁচাও, বাঁচাও।

আমায় বলে অনঙ্গ, মরতে পার না? মর না। অপরকে মেরে ফেলতে তো খুব আনন্দ। অপঘাতে মরার জ্বালাটা একটু ভোগ কর না নিজেও।

আমি নিজের কানে দু'হাত চেপে বলে উঠি, না, না। আমি কোন অন্যায় করি নি কখনো কারো সঙ্গে। অপঘাতে মরতে পারব না আমি কিছুতেই। কিছুতেই না। না, না, না।

'না না' কথার প্রতিধ্বনি কি না বুঝি না আমি। আমি শুনি হা-হা করে অট্টহাসি হাসছে কে পাহাড়-জঙ্গল কাঁপিয়ে। আমার বাংলোটা উপড়ে পড়বে বুঝি ওই পৈশাচিক হাসির ধমকে, ধাক্কায়। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি।

মনে সাহস আনার জন্য বিড় বিড় করে বলি, যা দেখছি ভুল, যা শুনছি ভুল মনের ভয় স্রেফ! যারা নেই, তাদের আবার দেখা যায় নাকি! তাদের হাসি-কান্না নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস শোনা যায় নাকি! কিছু না, কিছু না।

আবার শুনি আমি, ব্যঙ্গের সুরে কে যেন বলছে, মনের আগোচরে পাপ নেই। মনকে বোঝালে কি আর মন বুঝবে? তুমি অপরাধী, তুমি খুনী। তোমার মৃত্যু চাই আমি। কোন ক্ষমা নেই, কোন মায়া-দয়া নেই আমার তোমার ওপর।

আবার সেই বুক কাঁপানো হাসি শুনতে পাই আমি।

সত্যিই তাহলে মাথাটা বিগড়েছে আমার?

না, যা দেখছ যা শুনছ—সব সত্যি।

আমার হাত থেকে তোমার কোন নিস্তার নেই। কারো সাধ্য নেই তোমাকে বাঁচায়। অপঘাতে মরতে হবেই তোমাকে নিশ্চয়।

আমি আর সহ্য করতে পারি না। বলি, মৃত্যুই যদি কাম্য হয়, এভাবে ভয় দেখিয়ে দগ্ধে দগ্ধে মেরো না। এখুনি আমাকে মুক্তি দাও। তোমার মনস্কামনা পূর্ণ কর।

বেরিয়ে এসো শীগগির ঘর থেকে। শীগগির, শীগগির। আমি বেরোতে পারি না, গা হাত ঝিম ঝিম করে আসে আমার। ঝাপসা হয়ে আসে দৃষ্টি।

ঝাপসা ভাবটা কেটে যেতে দেখি, ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। রাতের ব্যাপারটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে, কারো কাছে এসব বলতে মুখে বাধে। মনে হয় কোন অদৃশ্য হাত মুখটা চেপে ধরছে, গলা টিপে ধরছে। পালানোর চিন্তা করলেই দু'পা বরফঠাণ্ডা হয়ে জমে যাবার যোগাড়। নিদারুণ কনকনানি হাড়ের ভেতর। কে বুঝি মট মট করে হাড় ভাঙছে সর্বনেশে আক্রোশে। আর অনঙ্গর চোখের আগুন ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। তাড়া করছে আমায়।

এমন হত না আমার। দিন সাতেক ধরে প্রতি রাত হয়ে উঠেছে আমার কাছে রহস্যময় নিষ্ঠুর। দিন হয়ে উঠেছে বধির-পাষাণ। আমি কি করব বুঝে উঠতে পারছি না। বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পাচ্ছে, ত্রাসে ত্রাসে মনোবল একেবারে ভেঙে গেছে। কেউ নেই যে আমায় এখান থেকে এসে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। আমি অসহায় নিরুপায়।

আমার মনের কথা নিঃশ্বাসে বেয়ে বাতাসে হাবুডুবু খেয়ে কোথাও কারো কানে পোঁছচ্ছে কিনা জানি না। কোথাও কারো প্রাণে বাজছে কিনা জানি না। আমার কথা কারো কোনদিন জানা সম্ভব নয় জানি, তবুও নিজের কথা লিখতে বসেছি আজ এই ভেবে, আমার শেষ হয়ে যাবার পর, যদি কেউ কোনদিন এই বাংলোয় এসে ওঠে, আমাকে জানাতে পারবে। কেন ম'লুম, কিভাবে ম'লুম! বিচার করবে আগন্তুক সত্যিই আমি নির্দোষ কিনা। তার বিচার যদি নির্দোষ হই, আমার আত্মার মুক্তি তখুনি।

আজ আমার শেষ রাত! পৃথিবী থেকে বিদায়ের পালা। জীবনের ন্যায়-অন্যায়—দুটি অধ্যায়ই খুব তাড়াতাড়ি লিখে শেষ করে ফেলতে হবে আমায়। কাল শাসিয়ে গেছে অনঙ্গ, মৃত্যু হবে আমার আজ। সে নিজেই সে-ব্যবস্থা করবে। তারপর তার মত প্রেতাত্মা হয়ে ঘুরে বেড়ানোর সাজাও ভোগ করতে হবে।

হাতে সময় বেশী নেই আমার। মোটে এক ঘণ্টা। দেওয়াল ঘড়িতে দুটো বাজার সঙ্গে সঙ্গে ওর আহ্বান, তারপর আগমন। ওই পাহাড়ের কোল থেকে ওর ডাক উন্মুক্ত বাতাসে সাঁতার কেটে আসতে থাকবে। গাছের পাতা নড়ে উঠবে ভীষণ ভাবে। পাতা নড়ার আওয়াজে একটা গোঙানি দপাদপি করে বেড়াবে সারা জঙ্গলে। দামসানালার জল ছলাৎ ছলাৎ শব্দে একটা বুক চাপড়ানোর শব্দ তুলে খিল খিল করে হেসে উঠবে। অপার্থিব হাসি।

মেহাগিনি গাছের মগডালে বসা ঘুমন্ত পাখিটার গায়ের বিচিত্র রঙ বদলে গিয়ে ধূসর হয়ে উঠবে। ও যেন চিতার ছাই গায়ে মেখে চোখ পিট পিট করতে করতে

উড়ে আসবে বাংলোর দিকে। সকালে বাঁশির সুরের গলা যে পাখির, সে পাখির কি কর্কশ গলা! মানুষের গলায় আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চিৎকার করবে, খুন-খুনী, খুন-খুনী।

লিখতে লিখতে গলা শুকিয়ে উঠছে আমার। টাগরায় জিভ আটকে গেছে। কাঁপা হাতে টেবিল থেকে জলের গেলাসটা তুলে নিলুম। জিভটা ভিজিয়ে নিয়ে লিখতে শুরু করেছি আবার।

সামনে একটু মাথা তুলে ঘড়ি দেখছি, বুকের মধ্যে বড্ড ঢিব ঢিব করছে। লেখাটা শেষ করতে পারব তো? একটা পনেরো। আবহাওয়া থমথমে হয়ে উঠছে। আর প'য়তাল্লিশ মিনিট বাকি। কিন্তু তবু যেন পায়ের শব্দটা আজ আগে থেকেই শুনতে পাচ্ছি। ডাকটাও শুনতে পাচ্ছি। অনেক দূর থেকে। না, বেশী দূর নয়। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। মানুষটার বেঁচে থাকার সেই বিকৃত গলা। আরও ভয়ঙ্কর। ডাকছে আমার নাম ধরে।—রেণুকণা রেণুকণা——।

সারা শরীরের রক্ত হিম হয়ে আসছে আমার। অনঙ্গ হয়তো বুঝতে পারছে আমি লিখছি। ও লিখতে দেবে না আমায়। তাই আজ তাড়াতাড়ি আসার ইঙ্গিত জানাচ্ছে আমার চতুর্দিক থেকে! হাত চলছে না আমার। কলম পড়ে পড়ে যাচ্ছে। আমি কুড়িয়ে নিচ্ছি টেবিল থেকে। লিখছি প্রাণপণ শক্তিতে। লিখতে হবেই আমায়—যতখানি পারি।

সেটা পৌষের শেষের ঘটনা।

মাসকাবার হতে বাকি মাত্র দুটো দিন!

কলকাতা থেকে জরুরী টেলিগ্রাম গেল দেওঘরে। মা আর আমি তখন দেওঘরে। বাবার তলব—কালবিলম্ব না করে চলে আসতে হবে এখুনি। কারণ জানা যায়নি। কিছু লেখা নেই, উহ্য।

বাবা হাইপ্রেসারের রুগী। মা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। ভাববার অবসর নেই, আর ভেবেই বা কি হবে! আমরা যাত্রা শুরু করলাম। ট্রেনে ওঠার আগে, মা গুরুদেবের আশ্রমে গিয়ে আশীর্বাদ চাইল—ও'কে গিয়ে সুস্থ দেখি যেন গুরুজি। গুরুদেব মায়ের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, ঊষানাথের কথা ভাবছি না আমি। তবে আজ না গেলেই হত।

—আপনার দৃষ্টি থাকলেই হল বাবা। আপনি যখন রয়েছেন, আমাদের কিসের ভয়?

ট্রেনে উঠলুম আমরা।

মা অন্যমনস্ক। বাবার জন্যে আমারও চিন্তা হচ্ছে খুব। কিরকম দেখব কে জানে! দু'দুবার স্ট্রোক হয়ে গেছে। দ্বিতীয়বারে তো তিনদিন অজ্ঞান একেবারে। একফোঁটা জলে ভেজেনি জিভ। কষ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে কেবল। যমে-মানুষে টানাটানি যাকে বলে। সে একটা দিন গেছে। দিনে-রাতে—কি উৎকণ্ঠা!

মা তো কেঁদে কেঁদে সারা। ঠাকুরঘরে গুরুদেবের ছবির সামনে নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করে, দিবারাত্রি বসে আছে। লোকে বলে, সিঁথির সিঁদুর মুছবে না বলে, মায়ের এয়োতির জোরেই সে-যাত্রা জ্ঞান ফিরে পেল বাবা। বেঁচে উঠল। পুনর্জীবন পাওয়া যাকে বলে।

আশ্চর্য, ডাক্তাররা ভেবেছিল, যদি বেঁচে ওঠে—একটা অঙ্গ পড়ে যাবে—তা কিন্তু হল না। নিজেদের নিপুণ চিকিৎসার তারিফ করে নিজেদের কেরামতি জাহির করে বেড়াল ডাক্তাররা। আর মা গুরুদেবের জয়ধ্বনিতে পঞ্চমুখ হয়ে উঠল—ডাক্তার-টাক্তার কিচ্ছু না। ওদের হাতে মরত না তাহলে কোন লোক।

গুরুদেবের আশীর্বাদই সব।

বাবা সুস্থ হয়ে উঠে কিন্তু মায়ের কথায় ব্যঙ্গবিদ্রুপ করেছে অনেক। প্রায়ই বলত, ওসব কাকতালীয়। আমি বিশ্বাস করি না। আমার যা হয়েছে,ওষুধের গুণেই হয়েছে।

মা চাবির গোছা বাঁধা আঁচলটা ঘাড়ের পাশ দিয়ে গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে, ঘোমটাটা সামনের দিকে আর একটু টেনে বলেছে, জয় গুরুদেব! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর।

হো-হো করে হেসে উঠেছে বাবা। বলেছে, ওরে কণা! তোর মায়ের মাথাটা গেছে, উন্মাদ হতে আর দেরি নেই বেশী। সামলা। গুরুভূত ঘাড়ে চেপেছে রে।

মা দু'কানে চাপা দিয়ে তিনতলায় চিলেকোঠার ঠাকুরঘরে গিয়ে মেঝেয় নাকখৎ দিয়েছে বাবার দোষ মকুব করার জন্য। কালীর ছবির পায়ে সিঁদুর-কৌটো ছুঁইয়ে সিঁথিতে সিঁদুর ঢেলেছে, কপালে ফোঁটা পরেছে।

এরপর দেওঘরে অনেকদিন যায়নি মা বাবাকে ছেড়ে। মন মরা হয়ে থাকত বেশীর ভাগ সময়। বাবা বুঝতে পেরেছিল মায়ের অবস্থা মর্মে মর্মে। নিজেই উপযাচক হয়ে বলল, মালতী, কণাকে নিয়ে দিনকতক বেড়িয়ে এসো না দেওঘরে, তোমার শরীরটা বড্ড ভেঙে গেছে। হাওয়া-বদল হবেও তো। বলতে বলতে মুচকে হেসেছে বাবা।

মাথা নেড়ে বলেছে মা, বিচ্ছিরি উপহাস না ছাড়লে, কোথাও যাব না আমি। ভাঙুক আমার শরীর—তোমার মাথা ঘামাতে হবে না অত। তোমার চোখের সামনে মরব আমি।

বাবা মায়ের চোখে জল দেখে, হাসি-মস্করা করেনি আর। দিনকতক পরে আমার আর মায়ের দু'খানা টিকিট কেটে নিয়ে এসে হাজির। বলল, আমি এখন খুব সুস্থ। মাসখানেক ঘুরে এসো তোমরা। ফ্যালা তো রান্নাবান্না খাওয়ানো সেবা—সবেতেই এক্সপার্ট। ও কাছে রইল—কোন ভাবনাই নেই।

মায়ের গুরুদেবের আশ্রমেই ছিলুম আমরা। খুব ভালোই ছিলুম। বাবার টেলিগ্রামের জন্যে ফিরে যেতে হচ্ছে।

ঘুমন্ত ট্রেন চলছে।

মা আর আমি জেগে কিন্তু। হাড়-কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা লাগছে

আমার গায়ে। তবু কান-মাথা গরম হয়ে উঠছে। কেবলি বাবার আগের অসুখের দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠছে। মায়ের চোখে কি ভাসছে জানি না। মা পাথুরে মূর্তির মতন বসে। বিষণ্ণ মুখ।

পাশের যাত্রিনী মায়ের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে। সেদিকে কোন খেয়াল নেই মায়ের। আমার ভেতরটা বড্ড অস্থির হয়ে উঠছে—কতক্ষণে পোঁছুই। কি জানি কি দেখব গিয়ে। পাহাড়ী দেশ পেরিয়ে ট্রেন ছুটছে নরম মাটির দেশের দিকে। আমার মনে হচ্ছে, হিমালয়ের অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করছি। একটা অজানা ভয় পেয়ে বসছে আমায়। বাবার দিক থেকে ঠিক নয়। এটা অন্য ধরনের। কি ধরনের বুঝতে পারছি না। ট্রেন থেকে নেমে পড়তে ইচ্ছে করছে।

রাত তিনটে তখন। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কামরার ভেতরটা কম-জোর আলো। অন্য যাত্রীরা সুখ-নিদ্রায় মগ্ন। আমি যেন সকলের মুখ থেকে ঘুমন্ত অবস্থাতেই একটা আর্তনাদ শুনলুম। সেই সঙ্গে একটা বিকট আওয়াজ। ব্যান্ডেলে আমাদের ট্রেনটা অন্য ট্রেনের ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছে। এ খবর জানার আগে আমি জ্ঞানহারা।

জ্ঞান হতে প্রথম চোখ খুলতে একটা ধাঁধা লাগল আমার। মনে হল, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি একটি সুন্দর সুখস্বপ্ন দেখছি। আমার মাথার একবেগদা উঁচুতে দুটি ফর্সা হাতে কি যেন একটা তুলে ধরে রয়েছে কে। দেহটা দেখতে পাচ্ছি না, ভালো করে তাকালুম। এবারে হাত দু'খানা চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য। তার জায়গায় একটা ইস্পাতের পাত আড়াআড়িভাবে একটা সেতুর মতন দাঁড়িয়ে। আমার মাথাটাকে বাঁচাবার জন্যেই ইচ্ছে করে দাঁড়িয়ে বুঝি।

ট্রেনের কামরা চূর্ণবিচূর্ণ। শুধু গলা থেকে মাথা বাদ দিয়ে আমার সর্বাঙ্গ কাঠের স্তূপে ডুবে গেছে। বুক গলা শুকিয়ে কাঠ আমার। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। কে আছে কোথায়—এসময় এক ফোঁটা জল দেবে মুখে! আমার মতন মায়েরও অবস্থা। মায়ের দু'চোখে করুণ যন্ত্রণা। জল উপচে পড়ছে। গাল গড়িয়ে ফোঁটা ঝরছে। ওই একটা ফোঁটা যদি আমার ঠোঁটে ছিটকে পড়ে, তাহলে ঠোঁট চেটে জিভটাও ভেজাতে পারি অন্তত।

তাও বুঝি হবার নয়। অদেখা মৃত্যু বোধহয় শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে আমার। তার রক্তচক্ষুর শাসানিতে বাতাস নিথর। চোখের জলের ছিটেফোঁটা এদিকে আসতে দেবে না মোটে। আমার গলা দিয়ে কোন স্বর বেরোচ্ছে না যে চিৎকার করে ডাকি কাউকে। ঘন অন্ধকার নেমে এলো চোখে। আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম দ্বিতীয়বার।

হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে আসতে পাড়া-প্রতিবেশী বলল, মা-মেয়ের জান বটে। যমের মুখের গ্রাস হয়েও ফিরে এলো গা। বংশটারই দীর্ঘপরমায়ু। তা না হলে কর্তাটা মরতে-মরতে বাঁচল। আর গিন্নী-মেয়ের তো নিহতের জায়গায় না হয়ে আহতদের জায়গায় নাম বেরোল খবরের কাগজে। যমকে ফাঁকি দেবার কায়দা-কানুন সত্যিই জানে এরা।

হাসপাতালে অবিশ্যি বাবার স্বভাবের কোন প্রকাশ হতে দেখিনি। যতক্ষণ

দেখত, বিমর্ষমুখ। হাসির রেখা ফুটতে দেখিনি একদম। ফুটল বাড়ি এসে উঠতে আমরা। শুধু হাসি নয়, কথারও খই ফুটল। মাকে বলল, গুরুদেব কি করলেল গো? অ্যাক্সিডেণ্টটা বাঁচাতে পারলেন না? তুমি এমন অন্ধভক্ত তাঁর!

—ও কথা মুখে এনো না। দাঁতে জিভ কেটে বলল মা। গুরুর কৃপায় প্রাণে বেঁচে ফিরেছি। তোমার অবিশ্বাসী মন। বিশ্বাস তো আর করবে না আমি দেখেছি গুরুদেব দু'হাত দিয়ে আমাদের মাথা বাঁচিয়েছে।

বাবা জোরে হেসে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বলতে বলতে—মরীচিকা মরীচিকা, স্রেফ চোখের ভ্রম।

মায়ের দেব-দ্বিজে সাধু-সন্তে অগাধ বিশ্বাস-ভক্তি বাবা পছন্দ করত না বহুবার বিশ্বাস ভক্তিতে চিড় খাওয়াবার চেষ্টা করেছে নানা পরিহাসের মধ্যে দিয়ে, নানা যুক্তির জাল বিস্তার করে। মা কিন্তু নিজের ব্যাপারে অবিচল একেবারে পাহাড়।

আমি বরাবরই বাবার পক্ষে। তার পক্ষে থাকার জন্যে আমার মনকে ছোট বেলা থেকে সেইভাবেই তৈরী করেছে বাবা। আর তা ছাড়া বিজ্ঞান আমার রক্ত মজ্জায় আছে কিনা জানি না। এটুকু জানি, খুব ভালো লাগে। বিজ্ঞানের ছাত্রী হলুম তাই স্বেচ্ছায়।

এবারে আমি বাবার পক্ষ নিতে পালুম না। আমার মন বাবার মতন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জর্জর, অবিশ্বাসী—তবু বাবার 'মরীচিকা' কথাটা কানে ভীষণ বাজল। মর্মস্থানে একটা মোক্ষম আঘাত হানল। বাবার সবটাতে বাড়াবাড়ি। মা তো মিথ্যে বলে নি, অন্যায় বলেনি। এতদিন অবিশ্বাস-অবহেলা করেছি, আর করা চলে না। আমিও তো মায়ের মতন মাথার কাছে হাত দেখেছি। দু'জনের একই দেখা কেমন করে দৃষ্টিভ্রম, মরীচিকা বলি!

মনোভাব জানিয়েছি পরে বাবাকে। বাবা অপলকে মুখের দিকে চেয়ে থেকেছে খানিক। চোখের তারায় ঘন বিস্ময়। বাবার দেখার মধ্যে একটা সংশয়ও ঘোরাফেরা করছিল। মেয়েটা কেমনতর হয়ে গেল হঠাৎ। তার মনো-মতন গড়া মেয়ের মুখে এ কি কথা!

বাবা বলল, লেখাপড়া শিখে তুইও তোর মায়ের মতন হলি কণা! কুসংস্কারের প্রতাপ দারুণ দেখছি। মায়ের সঙ্গে থেকে এই হাল হল। ঠিক আছে। কুসংস্কারের কাছে আমি হার মানব না কিছুতেই। মা-মেয়ে এক হলেও, আমায় কব্জায় আনা দুষ্কর বলে দিলুম।

আদুরে মেয়ে—অভিমান হয়নি সেদিন, বরং বিরক্ত হয়েছি বাবার ওপর।

বাবা গম্ভীর মুখে চিন্তার ছায়া আর মায়ের হাসিমুখে উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়েছে। মায়ের আর আমার দু'জনের মুখের দিকে বাবা কি দেখল চোখ ছোট ছোট করে, বাবা নিজেই জানে। বলল, আমার কর্তব্যটা সারা হয়ে গেলে আমি নিশ্চিন্ত। সে যা হয় হোক গে! অতশত দেখার দরকার নেই আমার।

মা উলের মাফলার বুনছিল বেতের চেয়ারে বসে। বোনা থামাল। বাবার

দিকে মুখ তুলে তাকাল মা। বাবার চোখে চোখ পড়ল। বাবা মাকে উদ্দেশ্য করেই বলছে। কর্তব্যটা কি ধরনের শোনার জন্যে চুপচাপ চেয়ে রইল মা!

চিরকালই মা ঠাণ্ডা স্বভাবের। তখন অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা দেখাচ্ছিল। বেতের গোলটেবিলটা ঘিরে চারদিকে চারখানা চেয়ারই মুখোমুখি পাতা। মা-বাবা সামনা-সামনি বসে। আমি পূর্বদিকে।

বাবা বলল, বাড়ি ফিরে অবধি খালি জিজ্ঞেস করছ—কেন টেলিগ্রাম করেছি? কেন করেছি—কণা থাকলেই বা—বলতে বাধা কি—ওকে নিয়েই তো কথা।

মা একটু নড়ে বসল।

ভেতরের অস্বস্তি-অস্থিরতা ফুটে উঠেছে মুখে। মা আমার সামনে আমার বিষয় নিয়ে আলোচনা চাইছে না বুঝতে পেরে বিব্রতবোধ করছি আমি। মায়ের অমন ঠাণ্ডা চোখ থেকেও আগুন ছিটকোচ্ছে বাবার দিকে। আমি উঠব কিনা ভাবছি। দু'চোখ নামিয়ে নিয়েছি দু'জনের মুখ থেকে। মায়ের কাজ করা সাদা ধবধবে টেবিলক্লথের ছবিটা দেখছি। ওদের দু'জনের দিকে যে আমার মন নেই, চোখ নেই—দেখানোর জন্যেই দেখছি। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়াটা ভালো হবে না! একটু পরেই উঠে যাব।

রঙ-বেরঙের সুতোর কারিকুরির ছবিটা আমার কাছে জীবন্ত হয়ে উঠেছে সেই মুহূর্তে। একটা শক্তসমর্থ লোক ধারালো কুড়ুলের ঘা বসাচ্ছে ফলন্ত আম-গাছের গুঁড়িতে। গাছের মগডালে বসে আম খাচ্ছে, ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলছে অন্য জন। পড়া আম কুড়োচ্ছে আবার অনেকে। গাছটা বেশ হেলে আছে। পড়ব পড়ব অবস্থা। সে ধারে খেয়াল নেই কারো। যে বসে খাচ্ছে তারও না, যারা কুড়োচ্ছে—তাদেরও না।

এদের অমঙ্গল আসছে, আসছে মৃত্যু—তবুও ভ্রূক্ষেপ নেই। নিজেদের আকাঙ্ক্ষা লোভ পূরণের চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত। দৃষ্টি-মন-চেতনা জাহান্নামে গেছে। একটা জৈন মন্দিরের গায়ে পাথরে খোদাই ছবিটা দেখে মায়ের মনে দাগ কেটে যায়। মা মনের ছবি ফুটিয়ে তুলেছে টেবিলক্লথে। মায়ের মুখে এর ব্যাখ্যা শুনেছি আমি। গুরুত্ব দিইনি কোন। মাকে জৈনদের দেবতা মহাবীরের পুরোহিত এই ব্যাখ্যা শুনিয়েছে।

অদ্ভুত রোমাঞ্চকর একটা অনুভূতি আমার মন বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলল নিমেষে। বাবা আমাকে জোর করে ওই গাছটায় বেঁধে রাখার জন্যে নিয়ে যাচ্ছে। বাবা কান্নায় বুকটা ফেটে যাবার উপক্রম। আমি যাব না, বাবা নাছোড়বান্দা। যে বাবাকে দেবতা ভাবতুম, শ্রদ্ধা করতুম—সে-বাবা এত নির্দয় হয়ে উঠল। আমার মরণের জন্যে প্রস্তুত। বাবাকে দানবে পেয়েছে নিশ্চয়। বাবার হাত ছাড়িয়ে পালাব কেমন করে, রেহাই পাব কেমন করে? বাবা আমায় টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখার মতন এই বিচ্ছিরি ভাবটা আমায় এমন পেয়ে বসেছিল যে, আমি সত্যি ভেবে নিয়েছিলুম সমস্ত! অস্ফুটে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো আমার—না, ওখানে যাব না আমি কিছুতেই।

বাবার কথায় পাগল করা ঘোরটা আমার চট করে কেটে গেল। সচেতন হয়ে উঠলুম। কি লজ্জা, নিজে খুব বিব্রত হয়ে পড়েছি।

আমার মুখের কথা লুফে নিয়ে বাবা বলছে, সবই জানিস তো দেখছি। ভালো, স্পষ্টাস্পষ্টি কথাবার্তা হয়ে যাক তাহলে। যাবি না কেন? ওদের ঘর ভালো, ছেলে ভালো। উপায়ী, সুশ্রী! আপত্তিটা কোনখানে—ওখানে যাবি না? খুলে বলতেই হবে তোকে—কেমন?

আমি অবাক হয়ে গেলুম। এ আবার কি শুনছি! আমি জেগে না ঘুমিয়ে বেঁচে না মরে? কি উত্তর দোব—বুঝে উঠতে পারছি না কিছু। মৌন মুখে তাকালাম শুধু একবার।

—কোন কথা শুনব না আমি। মা-মেয়ে এক। আজ জ্ঞানচোখ খুলে গেছে আমার। আমি ক'দিন বাঁচব আর! ডাক্তার তো জবাবের খাতায় নাম বসিয়ে দিয়ে গেছে। সৎপাত্রস্থ করতে পারলে, মরেও সুখ। পাত্ররা দেখতে আসবে কাল। মেয়ে পছন্দ করলে, আমি রাজি।

মায়ের পরিষ্কার উত্তর—না, আমি মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি নই। এ জন্যেই কি টেলিগ্রাম?

—হ্যাঁ। এ ব্যাপারটাকে হালকা করে দেখতে পারো তুমি, আমি পারি না গরীব হয়ে যেতে পারি, কিন্তু বংশের একটা মানমর্যাদা আছে জানবে। কথা দিয়েছি আমি, কথা রাখব। স্ত্রীর কথায় পুরুষ উঠবে-বসবে—এ আমাদের কুলুজিতে লেখা নেই।

—তবে আর জিজ্ঞেস করা কেন? তোমার অবিদিত কোন কিচ্ছু নেই সবই জানো। জেনে-শুনে যদি—বাপ হয়ে—নিজের মেয়ের সর্বনাশ নিজে হাতে কর—আমার বলার কিছু নেই।

—আমি ওসব মানি না। সব বাজে, সব মিথ্যে।

মায়ের চোখের কোণ চিক চিক করে উটেছে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো যেন বুক খালি করে। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল মা তাড়াতাড়ি। দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বাবাও বেরিয়ে গেল দুম দুম করে পা ফেলে। আমি জবুথবু হয়ে বসে রইলুম। আমার মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছিল, চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলছিলুম বিয়ে দিলে বাবা রাজি, মা নয়। দু'জনের বিপরীত মত। বাবার বক্তব্য— বিয়ে দিলে একটা আশ্রয় হবে আমার—হয়তো বা স্বর্গবাসও। মায়ের মন্তব্য বিয়েতে সর্বনাশ, না হলে অন্তত সর্বনাশ থেকে তো বাঁচতে পারবে মেয়েটা।

বিয়ে নিয়ে বাবা-মার এই দ্বন্দ্বের ভেতর আমার জীবনের কি গোপন রহস্য লুকিয়ে রয়েছে আমি বুঝতে পারিনি।

এর আগে অনেক বার বিয়ের কথা এসেছে, মা নাকচ করেছে বাবার আড়ালে মেয়ে আরো বড় হোক, পড়ছে এখন, কর্তার শরীরটা অসুস্থ—সুস্থ হোক আগে —হরেক রকমের কথাবার্তা। তখন আপত্তির কারণ জানতে একটি বারের জন্যে কৌতূহল জেগে ওঠেনি আমার ভেতরে। এবারে জাগল, বেশী মাত্রায়ই জাগল

আমি নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না আর। বিয়ে নিয়ে বাবা-মার মধ্যে কোন তুচ্ছ আলোচনা শুরু হলেও নিজে আত্মগোপন করতুম সঙ্গে সঙ্গে। আড়ালে-আবডালে ওৎ পেতে বসে থাকা যাকে বলে, সেই ভাবে জীবন-রহস্য শোনার অধীর প্রতীক্ষায় অস্থির হয়ে পড়তুম।

মায়ের এমনিতেই গলার স্বর নিচুগ্রামের। রাগলেও উঁচুগ্রামে উঠতে শুনিনি কখনও! চাকর-বাকরকে বকলে ওরা ভয় পেত না। উল্টে হেসে কুটি কুটি সব। আলোচনায় বাবা সরব, মা নীরব বললেই চলে। দু'একটি কথা—বাইরে থেকে শোনার কারো উপায় নেই। তবু চেষ্টা ছাড়িনি আমি। অবিশ্যি আমার এ ধরনের চেষ্টা দু'দুটো ঘটনা ঘটে যাবার পর।

আগের কথায় ফিরে আসি আবার।

পরের দিন। বাবার ঠিক করা পাত্রপক্ষেরা আসবে বিকেলে। বাবা বলেই রেখেছে। বলে রাখলে হবে কি—রাত পোহাতেই ডাকাহাঁকি করে কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে বলল, বিকেলে যাবিনি কোথাও, বুঝলি? ওনারা আসবেন।

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছি, যাব না।

মায়ের মুখে রাজ্যের দুঃখ ত্রাস অন্ধকার ঘোরাফেরা করছে পাশাপাশি। দেখলেও কষ্ট হয়। চোখাচোখি হলেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি দু'চোখের পাতা ভিজে উঠছে।

আমি থাকতে পারলুম না। মাকে একবার জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করে বসলুম, বিয়ের নামে কিসের এত কষ্ট তোমার মা?

ঝর ঝর করে দু'চোখের জল ঝরে পড়ল মায়ের। ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল। কিছু একটা বলতে চেয়েছিল, পারল না। শিউরে উঠে মাথাটা এপাশ ওপাশ করেছে স্রেফ একবার। মনের 'না-না' সজোরে ধাক্কা দিয়েছে হয়তো চোখে-মাথায়। আমার কাছ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে ঠাকুরঘরে চলে গেছে। দরজায় খিল এঁটে দিয়েছে ভেতর থেকে।

বিকেলে সেজেগুজে বসে থেকেছি আমি বাবার নির্দেশ মতন। সাজগোজ করাই সার হয়েছে আমার। পাত্রপক্ষেরা আসেনি। না, এসেছে একজন। পাত্রের দাদা। ভদ্রতা হিসেবে খবর দিতে। এখানে এ মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে নারাজ তার মা। কারণ—বিয়ের উদ্দেশ্যে আনাতে গিয়েই তো ট্রেন-দুর্ঘটনা। এ একটা অশুভ লক্ষণ। ফটো দেখে ঘর দেখেই মা মনস্থির করে ফেলেছিল—বিয়ে পাকাপাকি। দেখাদেখিটা সামাজিক নিয়ম করতে হচ্ছিল স্রেফ। মায়ের ভয় ধরেছে।

বাবা বুঝিয়ে বলেছে, দুর্ঘটনা থেকে মেয়ে বেঁচে ফিরছে—এইটাই একটা মস্ত শুভ লক্ষণ—মাকে বোলো।

—বেঁচে ফিরেছে বলেই মায়ের বেশী ভয়। মেয়ের আর কিচ্ছু হবে না কখনো, অখণ্ড পরমায়ু পাবে। ভায়ের জীবন নিয়ে না টানাটানি হয়।

বাবা খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইল, তারপর অসহায় কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এলো গলা দিয়ে। একটি মৃদু শব্দ—আচ্ছা।

আমি দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিলুম। পাত্রের ভাই চলে যেতে বেরিয়ে এলুম সামনে। বাবা আমাকে দেখে চমকে উঠল। পিঠে হাত চাপড়ে আস্তে আস্তে বলল, ওসব কিচ্ছু নয় মা, ওসব কিচ্ছু নয়। যত সব কুসংস্কারের অবুঝ লোক এসে জোটে আমার ভাগ্যে।

বিকেলে ঠাকুরঘরের দরজায় খিল খোলেনি মা। নিচে নেমেছে সন্ধ্যের পর। বিয়ে ভেঙে গেছে শুনে, মায়ের চোখে জোছনার হাসি। কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম জানাল তিনবার। মুখে বলল, গুরুদেব তোমার দৃষ্টি এত দূরেও!

বাবা জ্বলে উঠল। বলল, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হতে দোব না আমি বেঁচে থাকতে। ভেবেছ মরে যাব তাড়াতাড়ি? সেটি হচ্ছে না। কণার বিয়ে না দিয়ে মৃত্যু হবে না আমার। এটা জেনে রেখো—আমার এ মনের জোর ভাঙতে পারবে না তোমরা কোনরকমে।

আমি আর লিখতে পারছি না। এই অবধি লেখা থাকলে, আমার বিষয় কারো কিছু জানা সম্ভব নয়। আমার এই চব্বিশ বছর জীবনের কতটুকুই বা জানতে পারবে—যে পড়বে! জীবনের ছেঁড়াপাতার একটা কোণের একটা ছোট্ট টুকরো শুধু এই লেখা।

আমার দু'হাত ভারী হয়ে উঠেছে। আঙুল অসাড়। হাতের ওপর দশমণ লোহা চাপানো যেন। কি যে কষ্ট—একমাত্র আমিই জানি। আবার সেই ভয়ঙ্কর ডাক এগিয়ে আসছে আমার দিকে। বাংলোর এলাকার বাইরে—শাল গাছটার নিচে থেকে আসছে মনে হচ্ছে। আমার কাছাকাছি এসে পেঁছিতে আর কতখানি পথই বা বাকি! কিছুই না, সামান্য।

ডাকছে অনঙ্গ—রেণুকণা রেণুকণা রেণুকণা··· !

গলা নয় তো—মেঘের গর্জন। উচ্চারণের এক একটা শব্দে বাজ পড়া আওয়াজ। ওর ওই ভয়াবহ মূর্তি আজ আর চোখে দেখতে চাই না আমি তার আগেই আমি সরতে চাই। চিরদিনের জন্য বিদায় নিতে চাই এই পৃথিবী থেকে। এ নিদারুণ ভয় সহ্য করার ক্ষমতা নেই আর আমার

ঘড়ির দিকে তাকাতেই বুকটা ধড়াস করে উঠস। একটা পঁচিশ। অস্থিরতা বেড়ে উঠল আমার। আর তো পঁয়ত্রিশ মিনিট বাকি আমার জীবন-প্রদীপ নিভে যেতে। এই পঁয়ত্রিশ মিনিট আমার কাছে এখন পাঁচ মিনিট বলে মনে হচ্ছে আঙুলে কর গোনা সময়। আমার নিঃশ্বাস দ্রুত পড়তে শুরু করেছে। সমীরণের কথা না লিখে মরলে আমি শান্তি পাব না।

প্রথম বিয়ে ভেঙে যাবার পর সমীরণের মনেও কম আঘাত লাগেনি প্রতিদিন এসেছে আমাদের বাড়ি। ওদের বাড়ি আর আমাদের বাড়ি এক পাড়ায়। ওদের গলির মুখে, আমাদের মাঝখানে।

যখনি ওর হাঁপানির টানটা বাড়ত, তখনি আসত ও বেশী করে। বুড়ো মানুষের মতন কুঁজো হয়ে, বুকে হাত চেপে এসেছে। সে রাতই হোক, দিন

হোক। দেখে কষ্ট হত খুব। বলতুম, ডেকে পাঠালে আমি তো যেতে পারি সমীরণদা। এমন করে না এলেই কি নয় ?

অত যন্ত্রণা—মুখের দিকে তাকিয়ে তবু হেসেছে সমীরণ। হাঁপিয়ে-হাঁপিয়ে বলেছে, বারোমেসে রুগী বললেই তো চলে আমাকে। আমার জন্যে কেউ কষ্ট করুক—এ আমি চাই না। আর তাছাড়া আমার জন্যে তোমার দুর্ভোগ পোহাতেও তো হয় না কম।

—কি বলছ তুমি ? কবে কোন দুর্ভোগ পুহিয়েছি বল ? একদিনও নয়, এক বারের জন্যেও নয়।

—তুমি নয় বললে কি হবে—বিধাতা চোখ দুটো রেখেছে এখনও। তুমি বলতে চাও—আমি কি দু'চোখ বুজে থাকি—দেখি না কিছু। ট্যুইশনি করে রাতে বাড়ি ফেরো যখন—কি ক্লান্ত। তবু আমার অন্যায় আবদার রাখতে হয়। আমি বুঝি, তোমার ওপর নির্যাতন করি। ভাবিও—আর করব না। কিন্তু পারি না। হাঁপের টানটা বাড়লে, আমি বিবেকবুদ্ধি হারিয়ে ফেলি তখুনি। অবুঝপনা করে বসি।

চৌকির ওপর ফরাশ পাতা। তাকিয়া সাজানো। একটা তাকিয়া টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরেছে সমীরণ। ওর নিঃশ্বাসের আওয়াজে মনে হয়েছে, দম আটকে যাবে এখুনি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি আমি।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেই অভয় দিয়েছি। —ভয় কি ? ভাবনার কিছু নেই। এখুনি ভালো হয়ে যাব। এখুনি ঘুমিয়ে পড়ব। ওষুধ তো হাতেই কণা !

আমি বহুবার বলেছি, সমীরণদা, ইনজেকশন করলে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাও তো। তা কর না কেন ? কেন তুমি নিজেকে এভাবে ক্ষইয়ে চলেছ দিনের পর দিন ? এ তো এক ধরনের সুইসাইড।

—ইনজেকশনে যাবার রোগ নয় আমার, তাই করাই না।

আমি কথা বাড়াই না আর। জানি, কোথায় ব্যথা ওর, কিসের অভিমান। এ কথা বলা ঠিক নয়। ওর ব্যথার জায়গাটা সজোরে টিপে ধরা স্রেফ। তবে মাঝে-মাঝে বলে ফেলি। অত কষ্ট দেখতে পারি না, দেখে সইতে পারি না বলে। বলেও আবার অনুশোচনায় দগ্ধে দগ্ধে মরি নিজেই।

কাছে গিয়ে বসি। বুকে মাথায়-পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে গুন গুন করে গান ধরি। সমীরণের অতি প্রিয় গান। কবিগুরুর এ গানের সুরে ভাষায় একাত্ম হয়ে যায় সমীরণ। নিজেকে হারিয়ে ফেলে। সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে ঘুমিয়ে পড়ে ছোট্ট শিশুর মতন। ঘুমন্ত মুখে ছেয়ে যায় প্রশান্তির হাসি। আমি দেখি আর অবাক হয়ে ভাবি—সত্যিসত্যিই কি এ গানে ঘুমপাড়ানি জাদু আছে ? গান বন্ধ করলে—পাছে কাঁচা ঘুম ভেঙে যায়—ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে গাইতে থাকি আমি।

'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকল খানে।

আছে সে নয়নতারায় আলোকধারায়, তাই না হারায়,
ওগো ভাই দেখি তায় যেথায় সেথায়,
তাকাই আমি যেদিক পানে।…'

সমীরণের ঘুম ভেঙেছে যখন—স্বাভাবিক সুস্থ।

রোজ জিজ্ঞেস করব জিজ্ঞেস করব ভেবেও করতে পারিনি। মুখে কেমন বাধত। একদিন কৌতূহল চাপতে না পেরে বলে ফেললুম, এ গানে ওষুধ আছে সমীরণদা—ঘুমিয়ে পড়?

প্রশ্ন শুনে, কেমন একটা নিস্পৃহ ভাব এসে গেল মুখে। খানিক মৌন থেকে বলল, জানি না কথাটা বিশ্বাস করবে কিনা তুমি—বিশ্বাস না করো—চুপ করে থেকো—যুক্তি দিয়ে আমার বিশ্বাস ভাঙার চেষ্টা করো না। ভুল হোক, ঠিক হোক—আমার ধারণা নিয়ে আমি শান্তি পাই, আমি সুস্থ হয়ে উঠি।

গানের ভাষার সঙ্গে নিজে মিশে যাই আমি—বলেছে সমীরণ। বলেছে মনে হয়, আমার ভেতরে কে যেন অন্য একজন রয়েছে। সে-ই বাইরে চতুর্দিকেও। সে আর কেউ নয়, আমি। চতুর্দিকে নিজেকে দেখতে দেখতে যন্ত্রণার কথা মনেই থাকে না। সমস্ত ভুলে যাই আমি।

সমীরণ নিজেই গেয়ে উঠেছে, 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তায় সকল খানে… !'

আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। গাইতে গাইতে আমারও একটা অনুভূতি জেগে ওঠে ভেতরে। বলেছি, যা বলেছ তুমি সত্যি, মর্মে মর্মে সত্যি।

আমার মনে হয়েছে মানুষের মধ্যে সমীরণ দেবতা। নিজের কষ্টকে নিজে কিভাবে লাঘব করে! মানুষটার কারো ওপর দুঃখ নেই ক্ষোভ নেই, নেই কোন অভিযোগ-অভিমান। শিশুর হাসি সদাসর্বদা লেগে রয়েছে ঠোঁটে।

সেই সমীরণ। কি আদরে না মানুষ। ওর মায়ের মৃত্যুর পর চতুর্দিকে শূন্য দেখল। আজ ওর বাবা যে দুর্ব্যবহার করে, সে সময় কিন্তু তা করেনি। তখনকার মাটির মানুষের হৃদয় এখন পাথরে বাঁধানো। কেমন করে মানুষের মন এমন বদলে যায়—আমি ভেবে কুলকিনারা পাই না।

মায়ের মৃত্যুর পর বাবা বুকে টেনে নিয়েছে মাতৃস্নেহে, কিন্তু পরে রুদ্ররোষে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে আবার। বিয়ে করব না বলেও বিয়ে করেছে বাবা। শান্তশিষ্ট মায়ের আসনে এসে বসল যে মেয়ে, সে বিপরীত প্রকৃতির। রণচণ্ডীর ওপরেও যদি আরও কড়া নাম থাকত কোন—দিলে, ভুল দেয়া হত না।

হাঁপের টানে কষ্ট পাচ্ছে সমীরণ, বাবাকে আসতে দেবে না কাছে, দেবে না ওর ঘরের ত্রিসীমানা মাড়াতে। বাবা লুকিয়ে যদি ঘরে এসেছে কোন দিন জানতে পেরে তুলকালাম। কান্নার বন্যা ছুটেছে দু'চোখে। ঘন ঘন অচৈতন্য হয়ে পড়েছে সৎমা। তাকে সামলাতেই বাবা হিমসিম খেয়ে গেছে।

সমীরণ মন-মরা হয়ে থাকত দিনরাত এসব দেখে-শুনে। ধীরে ধীরে নিজেকে গুটিয়ে নিল নিজের মধ্যে। বাড়িতে থেকেও বাড়িতে নেই। এতেও কি নিশ্চিন্তে থাকতে পেরেছি? পারেনি। সৎমার মুখ থেকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি

শুনতে হয়েছে প্রতিদিন।

যখুনি বাড়ি থেকেছে, জানলা-দরজা রুদ্ধ করে অন্ধকূপে বাস করেছে। হাঁপানির টানে একলা ঘরে, বুকে বালিশ চেপে কাতরেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একবার মনে হয়েছে, প্রাণটা ঠোঁটের আগায় এসে থমকে গেল। মৃত-মা এসে কাছে দাঁড়াল যেন। দু'চোখ জলে ডব ডব করছে। নরম হাতে মাথা স্পর্শ করল। যেমন বেঁচে থাকতে করত। মাথায় হাত রেখে জপ করত ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে—সমীরণকে নীরোগ করে তোলার প্রার্থনা।

হতে পারে সমীরণ কল্পনায় সবই দেখেছে। বর্তমান দুঃখের রাজ্যে, শূন্যতার রাজ্যে, সুখের অতীতকে টেনে এনে ফেলেছে নিজেরই অজ্ঞাতে। তা হোক, তবু তো শান্তি পেয়েছে স্বস্তি পেয়েছে, নিজেকে সত্যি সত্যি রোগমুক্ত ভেবে নিয়ে ক্ষণেকের জন্যে—নিঃসঙ্গ অসহায় মানুষের এ পাওনার মূল্যও বড় কম নয়।

ছোটবেলা থেকেই সমীরণদের বাড়িতে যাতায়াত ছিল আমাদের। দু'বাড়ির সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। তারাও আসত আমাদের বাড়িতে। সমীরণের মুখে তার জীবনের নতুন করুণ অধ্যায় শোনার পর থেকে আমার ভেতরটা ডুকরে কেঁদে উঠত মাঝে মাঝে। কি করে ওকে একটুও শান্তি দিতে পারা যায়—এই চিন্তায় রাতের ঘুম ভেঙেছে আমার কতবার।

আমি ওকে শান্তির রাজ্যে ডুবিয়ে রাখতে পারি দিনরাত। সে-মন সে-ওষুধ নাকি আমার কণ্ঠে আমার সুরে আমার গানে। আবিষ্কার করল একদিন স্বয়ং সমীরণ।

অঘ্রাণের আকাশ। ছিটেফোঁটা সাদা মেঘ নেই কোথাও। ঝকঝকে তকতকে নীল। রাত্তির আটটা। পূর্ণিমা পেরিয়ে গেছে দিন তিনেক আগে। ভরা জোছনার আলো আর নেই, তবে জৌলুস মরে গেলেও কিছুটা রয়েছে। ছাত্রীর বাড়ি গান শেখাতে যাইনি সেদিন। বিয়ের নেমন্তন্নে গেছে ওরা, আমার ছুটি।

মায়ের বাড়িতে থাকা না থাকা সমান। বেশীর ভাগ সময় ঠাকুরঘরে। বাদবাকি বোনাবুনিতে। মাকে একটু বেশীক্ষণ কাছে পাওয়া মানে অনেক আরাধনার দেবতাকে পাওয়া। বাবা বাড়িতে নেই। জিওলজিস্টের চাকরি, কাজে কাজেই দেশে দেশে ঘুরতে হয় যখন তখন।

যখনকার কথা লিখছি, তখন বাবা এখানে। আজ আমি যে বাংলোয় বসে ডায়েরির পাতা ভরিয়ে তুলতে চলেছি আমার রহস্যময় জীবনের খবর লিখে—এ বাংলো বাবার তৈরী। চেয়ার বাবার টেবিল বাবার। মায় খাট আলমারি বিছানা ড্রেসিংটেবিলও বাবার। আমার নিজস্ব কানাকড়িরও কোন জিনিস নেই এ বাংলোর এ ঘরে।

কেন জানি না দ্বৈতারী পাহাড়ের ক্রোমাইট ফিল্ড বাবার অত ভালো

লেগেছে। কাজ না থাকলেও মাঝে মাঝে বাবা এখানে এসে কাটিয়ে যেত। পাহাড়-জঙ্গলের একটা অজানা মোহ মানুষকে আকর্ষণ করে। নেশা ধরায় চোখে। মনকে আটকে রাখে সবুজ নীলের দুটি বাহু-বেষ্টন করে।

বাবা এখানে। আমি কলকাতার বাড়িতে নির্বান্ধব পুরীতে বাস করছি বললেই চলে। একা একা কি করি ? একা থাকলেই গান আমার ভেতর থেকে কথা কয়ে ওঠে। বলে, গা না। অমুক গানের অমুক কলিটা। গান আমার রক্ত-মজ্জায়। বিজ্ঞানের ছাত্রী আমি। বি-এস-সি পাসের পরও ছাত্রী না পড়িয়ে, গান শিখিয়ে বেড়াই। গান গাইতে যেমন ভালো লাগে, শেখাতে আমার তার চেয়েও ভালো লাগে।

বাবা অবিশ্যি গান শেখাতে যেতে বারণ করেছে কত। বলেছে, আমি তো এখনও মরিনি রে। এর মধ্যে উপায়ের ধান্দা করার দরকার কিছু আছে ?

আমি বলেছি, বাবা, এটাকে তুমি উপায় করা বলছ ? এটা আমার ভালো লাগা। নেশা কেবল। আর তা ছাড়া তুমি তো আমাকে বলেছ—তুই আমার ছেলে, তুই আমার মেয়ে। ছেলের মতন মানুষ করেছ যখন—উপায় করার চেষ্টাই যদি করি—সেটা কি খারাপ আমার পক্ষে ?

মাথা চুলকোতে চুলকোতে বাবা সরে গেছে সামনে থেকে ?

বাবা বাড়িতে থাকলে, আমার সঙ্গে অনেক গল্পগুজব করে। তার কর্ম-জগতের রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনায়। কিভাবে বাঘের মুখ থেকে বেঁচে গেছে কোথায়, কিভাবে বিষধর সাপের চোখ থেকে, কিভাবে জংলী মানুষের কোপ থেকে। আমার কখনও ভয় কখনও বিস্ময় কখনও রোমাঞ্চ জাগে মনে শরীরে। গল্পের শেষে বাবা বলেছে প্রতিবারে, দ্যাখ কণা, মানুষকে বিশ্বাস করবি না কখনও। মানুষের চেয়ে জানবি বনের হিংস্র পশুও অনেক—অনেক ভালো। ওদের একটা নীতি আছে তবু। আঘাত করলে আক্রমণ করে কোথাও, কোথাও বা খিদের তাড়নায়। কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন অনেকে আছে—এদের চেয়েও হীন। আঘাত না পেলেও আঘাত করবার চেষ্টা করবে। পেট ভর্তি থাকলেও, সর্বগ্রাসী লোভে অপরের মুখের আহার লুট ক'রে নিতে এতটুকু দ্বিধা করবে না। নিজেকে ছাড়া এতটুকু দয়া নেই মায়া নেই কারো ওপর। অন্যায় করে অনুশোচনার বালাই নেই কোন। অন্যায়কে অন্যায়ই ভাবে না। ভাবে ওইটাই তাদের কর্তব্য।

বাবা কাছে নেই বলেই, বাবার হিতোপদেশ কানে বাজছে আমার। আমি স্কেলচেঞ্জ হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে ফরাশ পাতা ঘরজোড়া চৌকির দেয়াল ঘেঁষে বসলুম। গাইছি—'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে··· ।'

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হল সমীরণ। হাতের ইশারায় গান থামাতে নিষেধ করল। সন্তর্পণে চৌকির ওদিকটায় বসল পা তুলে বাবু হয়ে। পাশের তাকিয়াটা কোলে টেনে নিয়ে দু'কনুইয়ে ভর দিয়ে হাতের তেলোয় চিবুক রেখে, চোখ বুজে শুনছে। নিঃশ্বাসের ধমকে বুক ওঠা-নামা করছে হাপরের মতন।

গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে সমীরণ। ভাঙতে চোখ চেয়ে বলেছে, কি সুন্দর স্বপ্ন দেখছিলুর। মায়ের কোলে মাথা রেখে কি ঘুম ঘুমিয়েছি শান্তিতে। সেই মুহূর্তে আমার অঙ্গে অঙ্গে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। অজানা আনন্দের! আমার মনে হয়েছে, সমীরণ যেন একটা বাচ্চা ছেলে। বিচিত্র অনুভূতি। এরপর থেকে যখুনি ও যন্ত্রণাকাতর হয়ে এসেছে আমার কাছে, আমি ওই একই গান গেয়েছি, আর মাথায় পিঠে হাত বুলনোর সময় ভেতরের জমা স্নেহ উজাড় করে ঢেলে দিয়েছি। সে স্নেহের সায়রে চান করে উঠেছে সমীরণ হাসিমুখে।

সমীরণ এখন অসুস্থ হয়ে গান শুনতে আসে না আমার কাছে। আসে সুস্থ অবস্থায়, গানও শোনে তন্ময় হয়ে। আমি বুঝি, আমি গান ভালোবাসি বলে, গান গাইয়ে ও আমায় অন্যমনস্ক করে রাখতে চায়। ও ভাবে, বিয়েটা ভেঙে যাওয়ায় আমি বুঝি খুব দুঃখু পেয়েছি। প্রত্যাখ্যানের আঘাত ভেতরে ঘূর্ণি ঝড় তুলছে। আমাকে ভেঙে খান খান করে ফেলছে।

আসলে কিন্তু এ সমস্ত কিছু হচ্ছে না আমার। এ ব্যাপারে আমার মনের কোণে একটুও দাগ কাটেনি। বাবা-সমীরণ আমাকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। বাবা তো সমীরণ এলেই আমাকে শুনিয়ে সমীরণকে বলবে, বুঝলে সমীর—আর একটা পাত্র পেয়েছি। এরা তো আমার মা-মণির ফটো দেখে পাগল। বলে, কোন দেনাপাওনার কথা নয়, মেয়েটিকে বৌ হিসেবে ঘরে তুলতে পারলে ভাগ্য মনে করব। ছেলের মা বললেন, রেণুকণা তো! কনফারেন্সে কত গান শুনেছি। আহা, কোকিলকণ্ঠী যাকে বলে। আপনার ভাগ্য ভালো—মেয়ের যেমন রূপ তেমনি গুণ। ভদ্রমহিলা তো ওর সামনে বসে গান শোনার জন্যে পাগল একেবারে। এখনো বিয়ে হয়নি, আমায় বেয়াইমশাই বলেই সম্বোধন করে বসলেন। যেটা গেছে, ভালোই হয়েছে, এমন ঘর এমন মানুষ নয় ওরা। সমীরণ একগাল হেসে বলেছে, মেসোমশাই, ইচ্ছাশক্তিতে মানুষের কি না হয়! শুনেছি অসাধ্যসাধন করতে পারা যায়। আপনার শুভেচ্ছা চেষ্টা—এর দাম নেই? আপনার আশাপূরণ হবেই হবে। কণার মতন মেয়ে ভালো ঘরে পড়তে বাধ্য মেসোমশাই।

মা এসে পড়লে বাবা-সমীরণ চুপ করে যেতে তক্ষুনি। মা মুচকে হেসে, সকলের দিকে তাকিয়ে কোন কথা না ক'য়ে বসার ঘর থেকে বেরিয়ে ওপরের সিঁড়ির ধাপে পা রাখত। ওঠার আগে আর একবার আড়চোখে দেখত আমাদের তিনজনকে। আবার বিদ্রূপের হাসি—ঠোঁটের ফাঁকে চোখের কোণে উঁকি মেরেই মিলিয়ে গেছে।

দাঁতে দাঁত চেপে গজ গজ করেছে বাবা, সমীর, সর্বনেশে মেয়েছেলে ও। ভাবখানা দেখলে—বুঝলে কিছু? মানে—যতই যা কর না তোমরা—আমি দোব না বিয়ে হতে। এমন মা কোন সংসারে দেখেছে কেউ?

আশ্চর্য! আমি বিয়ে-পাগল নই। তবে মায়ের রকম-সকমে বুঝতে অসুবিধে হয় না—মা বিয়ে দিতে চায় না মোটে। এই নিয়ে বাবা-মায়ে রীতিমতন

বাড়িটা থমথমে ম্যূর্তি ধরে। একটা অজ্ঞাত অস্বস্তির তাড়নায় আমি ছটফট করি। শার্শি-খড়খড়ি বন্ধ থাকলে, খুলে দি তাড়াতাড়ি। রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমোই। নিঃশ্বাস টানি ঘন ঘন।

যেটা আমার অভ্যাস করা, আবার তাই করলুম। জানলার কাছে এসে দাঁড়ালুম। খোলাই ছিল। নিঃশ্বাস নিচ্ছি। বাবা ফরাশে গালে হাত দিয়ে বসে। সমীরণ প্রবেশ করল ঘরে। একটু পরেই অনঙ্গ দৌড়ে ঢুকে, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে ও। উসকো-খুসকো চুল, রক্তজবা চোখ। ঘামের ডোরা নামছে মাথা বেয়ে রগের পাশ দিয়ে।

কাঁপা নিঃশ্বাসের আওয়াজে বলল, বাবুমনু মারা গেছে।

অস্ফুটে বলে উঠল সমীরণ, সত্যি ?

হ্যাঁ, সত্যি।

বাবা হতভম্ব, আমি স্তব্ধ।

বাবুমনুর ঘটনা জানি আমি। ওকে দেখেছিও আমাদের পাড়ায় বারকয়েক। তরতাজা বাইশ বছরের তরুণ একটি। মিষ্টিমুখ মিষ্টি হাসি। পাড়ার ছেলেরা ওকে শাসিয়েছিল অনেক। ঠ্যাং খোঁড়া করে দোব। গর্দান থেকে মাথা নামিয়ে দোব। চোখ উপড়ে নোব।

বাবুমনু এসব কথায় কর্ণপাত করেনি। ছেলেটা সাহসী। এসেছে। জান নিয়ে পালাতে পারেনি, হয়তো চায়নি। অজ্ঞান হয়ে পড়েছে রাস্তায়। লাঠির ঘায়ে সর্বাঙ্গ থেঁতলে পিষে—চেনার উপায় নেই। প্রাণটা ধুকধুক করছে তখনো। চ্যাংদোলা করে পার্কের ভেতর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এলো ছেলের দল বাইরে থেকে।

এই দলের পাণ্ডা অনঙ্গ।

প্রথমে ক্যাঁত করে একটা ভারী বুটের লাথি বসিয়ে দিয়েছে অনঙ্গই বাবুমনুর তলপেটে। 'মাগো' বলে লুটিয়ে পড়ল ছেলেটা রাস্তায়। তার ওপর লাঠি পড়তে আরম্ভ করল পর পর।

আমি জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না আর। মাথা ঝিম ঝিম করে বসে পড়লুম। বেশ মনে আছে, একবার চিৎকার করে উঠেছিলুম—মরে যাবে যে—কেউ বাঁচাও না ওকে! জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি আমি।

বাবুমনুর অপরাধটা কি ?

রঙিন বয়সে মনে প্রজাপতি ঘুরে বেড়ায়। অনঙ্গর বোন মলিকে বিয়ে করতে চেয়েছে বাবুমনু। অনঙ্গর মামার বাড়ি আর বাবুমনুদের বাড়ি পাশাপাশি। মামার বাড়ি বেড়াতে গেছল যখন মলি, তখন থেকেই বাবুমনুর চোখে নেশা ধরল—প্রতিদিন মলিকে একবার করে দেখার জন্যে। মলি চলে আসার পরও নেশা ছোটেনি। এসেছে ও।

পড়ুয়া ছেলের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। ওর সঙ্গে বিয়ে দেবে কে ? এঞ্জিনিয়ার পাত্রের সঙ্গে বিয়ে ঠিকঠাক। বাবুমনুর কথা শুনবে কে আর! অতএব বাবু-মনুকে শায়েস্তা কর।

সমীরণ অনঙ্গকে লুকিয়ে নিয়ে এনে তুলেছে এই বাংলোয়। অনঙ্গকে বাঁচাতে হবে। ও ছিল না কলকাতায়।

সমীরণের জন্যেই অনঙ্গ খুনের দায় থেকে বেঁচে গেছে সে-যাত্রা।

তারপর বেশ কিছুদিন বেঁচেছিল অনঙ্গ বহাল তবিয়তে। মৃত্যু এলো একসময়।

কিন্তু সে-মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। ভয়াবহ।

অনঙ্গর প্রেতাত্মা আমাকে বলে, আমার মৃত্যুর জন্যে দায়ী তুমি। তুমিই খুন করেছ আমায়।

আমি করেছি? একটা বিভ্রান্তি ঘিরে ধরে আমায়।

ভেবেছিলুম, একনাগাড়ে লিখে যাবো। এবারে আর মাথা তুলে তাকাবো না ঘড়ির দিকে। তাকালেই হাত চলতে চায় না, 'সময় হয়ে এলো, সময় হয়ে এলো' ভয়। আমার ইচ্ছেয় কিছু হবার নয়। নিচু করা মাথাটা কে যেন ধরে সিধে করে দিল। ঘড়িতে দেড়টা এখন। আবার ডাকটা শুনতে পাচ্ছি। এবারে বাইরে থেকে নয় আর। বাংলোর ভেতরে। হৃৎকম্প হচ্ছে আমার। আগের চেয়ে কাছাকাছি এসে গেছে ডাকটা। ···রেণুকণা রেণুকণা···। অনঙ্গর প্রেতাত্মা এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে।

আমার মনে হচ্ছে দরজা খুলে বেরিয়ে যাই। হেরিকেনের আলোটা দপদপ করে উঠছে। নীল আলোটা নেই। ধোঁয়াটে লালচে আলো—নিশুতি রাতে নির্জন মাঠে আলেয়ার আলো যেন। চিমনির একটা দিকে থিকথিকে কালো ভুষো জমেছে। ঘরটা আলো-আঁধারি। নিঃশ্বাসের বাতাসে দম আটকানো দুর্গন্ধ।

যত বিভীষিকাই এগিয়ে আসুক—আমার জীবনের যে ক'টা অধ্যায়—সব ক'টা শেষ করে লিখে যেতে না পারলে ভবিষ্যতের অতিথি—কখনও যদি এ বাড়িতে এসে কেউ ওঠে—কেমন করে নির্ভুল বিচার করবে কতখানি অপরাধ আমার? খুনীদের মধ্যে কোন শ্রেণীতে পড়ি আমি। প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয়, না চতুর্থ? না আমার জীবন অনুযায়ী পরিস্থিতি পরিবেশ অনুযায়ী—যুক্তি-নীতির নিরিখে আদপে কোন খুনীশ্রেণীর মধ্যেই পাড় না।

একঢোক জলে গলা ভিজিয়ে নিলুম আমি। টাগরায় জিভটা আটকে যাচ্ছিল। আবার আমি লিখছি। আঙুল বেঁকে যাচ্ছে আমার। লেখাও বাঁকা-বাঁকা হয়ে উঠছে। তা উঠুক, ধড়ে প্রাণটুকু থাকা অবধি লিখতে চেষ্টা করে যাবো আমি।

আমাকে পাত্রস্থ করার জন্যে বাবা ব্যস্ত ঠিক, কিন্তু নতুন পাত্রের মা আবার বাবার আটগুণ ব্যস্ত। পুত্রদায় হয়েছে যেন তারই।

প্রত্যেক দিনই বিকেলে আসে। নিজেদের গাড়ি, অসুবিধে কোন নেই। চিবুক ধরে আদর করে আমায়। ধ্যানের মতন চোখ বুজে বসে গান শোনে এক-

মনে। কখনও কখনও বোঁজা চোখের পাতা বেয়ে জল ঝরে টস টস করে।

আমার ওকে খুব ভালো লেগেছে। চেহারাটি দেবীপ্রতিমা। কথাবার্তায় আভিজাত্য মাখানো স্নেহ উপচে পড়ছে। স্বামী পুরীর বাড়িতে থাকে। পঞ্চাশ বছরে পড়েছে। সংসারে থাকা চলে না আর। যেই মনে হওয়া—সঙ্গে সঙ্গে বানপ্রস্থ অবলম্বন। স্ত্রীর ওপর বিষয় আশয়ের ভার দিয়ে স্বামী নিশ্চিন্ত। বলে দিয়েছে, তাকে যেন তার সাধনার রাজ্য থেকে টেনে আনতে কেউ না চেষ্টা করে কোন রকমে।

স্ত্রী স্বামীর আদেশ পালন করে চলেছে গুরু আদেশ শিরোধার্য ভেবে নিয়ে।

স্বামী বানপ্রস্থ নিয়েছে বছর পাঁচেক আগে। তখন স্ত্রীর বয়েস পঁয়তাল্লিশ। এখন মাসখানেক পর পঞ্চাশে পড়বে। পঞ্চাশে পড়লে স্ত্রীও অনুগামিনী হবে স্বামীর। অর্থাৎ বানপ্রস্থ নেবে। তাই ছেলেটার মাথায় জল দেয়ার ব্যবস্থার জন্যে উঠিপড়ি লেগেছে। বাপ থেকেও তো নেই। মা-ই বাপের কাজ করছে বাধ্য হয়ে।

আমায় দেখে ছেলের মায়ের মনে হয়েছে, তার ছেলের উপযুক্ত হতে পারি একমাত্র আমিই। বহু মেয়ে দেখেছে, উপযুক্ত মনে হয়নি একটাকেও আজ অবধি—আমি ছাড়া।

পাত্রের মা, গান শোনার পর বোঝাচ্ছিল আমায়—ছেলে আমার মা বড্ড আপনভোলা। কিছু জানে না জগতের। আমার মতন তোমাকে বিষয়-সম্পত্তির হাল ধরতে হবে। ভয় নেই, তুমি পারবে।

আমার মা এসে পড়েছিল ঘরে। আমাদের দু'জনের মুখের দিকে বোকা বোকা মুখ করে তাকায় একবার। তারপর চোখের কোণে কৌতুকের হাসি খেলে যায়। আস্তে আস্তে ছেয়ে যায় মুখময়।

মায়ের এ হাসিটা কেমন কেমন। কেন জানি না দেখলেই একটা ত্রাসের ছায়া পড়ে আমার মনে। বাবার মুখখানাও ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। মাকে আড়াল করে সামনে এসে দাঁড়ায়। এসবে পাত্রের মা কি বোঝে কে জানে! তারও মুখখানা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। দৃষ্টিতে ভেসে ওঠে আশঙ্কা না সংশয়—আমি সঠিক বুঝে উঠতে পারি না। হয়তো আমার দেখা ভুল, নয়তো দুটোর একটা—কিংবা দু'টোই একসঙ্গে। মা থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছি আমি। গুমোট আবহাওয়াটা হালকা করে দিল মা নিজেই। হাবভাব দেখে আঁচ করতে পেরেছিল নিশ্চয় কিছু।

হাসিটা মায়ের মুখের শোভা, না একটা গোপন হাতিয়ারের নিশানা—এত-দিন ধরে দেখে দেখেও মাথায় আসেনি আসলটা। যত দেখি, যত দিন যায়, তত মনে হয়—মা আমার রহস্যময়ী। মায়ের মনে কোথায় একটা কোন সুদূরের ছায়ার আনাগোনা চলছে। সেটা কি ?

সে-ছায়া কি বাবাও দেখে মায়ের মধ্যে ? দেখে হয়তো। নাহলে বাবাই ব নির্জীব হয়ে পড়ে কেন মায়ের সামনে। যেটুকু হম্বিতম্বি করে—অসারের তর্জন গর্জন সারই মনে হয়। মায়ের সম্বন্ধে একটা গোপন ভয়ও বাবার বুকে পোষা

রয়েছে। মা আটক রাখতে চায় আমাকে তফাত করে—অন্তত বিয়ের ব্যাপার থেকে। বাবা ছিনিয়ে নিতে চাইছে আমাকে মায়ের আটকানোর খপ্পর থেকে। মা ওপরে উঠে যেতেই বাবা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে, বুড়ো আঙুলে কপালের ঘাম চেঁচে মেঝেয় ঝেড়ে ফেলে ভারী গলায় বলেছে, মেয়ের গান কেমন শুনলেন ?

—সে কথা বলতে বেয়াই-মশাই—তুলনা হয় না। প্রথম দিনই তো আপনাকে বলেছি। একটা অনুরোধ রাখতে হবে কিন্তু আপনাকে। পাত্রর মায়ের গদগদ কণ্ঠস্বর। চোখে জল।

বলল, আমার বুড়ো বাবা বেঁচে আছে এখনও, উত্থানশক্তি রহিত। আসতে পারলে আমি এখানেই নিয়ে আসতুম। আমার বড্ড ইচ্ছে কণামাকে একবার নিয়ে গিয়ে গান শোনাই। কণামার গান শোনার কি আগ্রহ বাবার। দেখা করতে গেলেই আমাকে অস্থির করে মারে।—নিয়ে যদি না আসতে পারিস—তার গানের কথা শোনালি কেন আমায় অমন করে ? ক'দিনই বা বাঁচব আর আমি ! বাবা ছেলেমানুষের মতন হয়ে গেছে। কথায় কথায় অভিমান, কান্না। বয়েস তো আর কম হল না ! পঁচাশি পেরিয়ে ছিয়াশি।

বাবার হৃদয় গলল, গলল আমারও। বাবা বলল, তা যাবে না কেন ও—

নারেন্সে যখন গাইতে যায়, আপনার বাবার বাড়িতে—এ তো আনন্দের কথা।

পরের দিন বিকালে গেছি আমি পাত্রের মায়ের সঙ্গে। গেছি আমি নির্দ্বিধায় নির্ভয়ে।

শ্রাবণের মাঝামাঝি। অঝোর ঝরে নয়, টিপটিপে বৃষ্টি পড়ছে সারাদিন ধরে। গানের আমেজ মনে ছড়িয়ে পড়ছে। একটা নতুন স্বাদের আনন্দ অনুভব করছি ভেতরে। একজন মৃত্যুপথের যাত্রী আমার গান শোনার জন্যে ক্ষণ গুনে চলেছে। আমার গানে তৃপ্তি পেয়ে যদি তিনি প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন—আমার জীবনে সেটা অমূল্য পাথেয় হয়ে দাঁড়াবে। এ সুযোগ এ সৌভাগ্য ক'জনের কপালে ঘটে !

গান আমার প্রাণ। সেই প্রাণের ছোঁয়ায় যদি কারো মুমূর্ষু প্রাণে জীবনীশক্তি জেগে উঠে সে তো আমার সাধনা-সিদ্ধি। আমার গানের গুরু এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। এক প্রদীপের আগুন থেকে অন্য প্রদীপ জ্বলে যেমন, তেমনি অন্তরের গান অন্য অন্তরে সুধা ঢেলে সুস্থ সজীব করে তোলে মানুষকে ক্ষণেকের জন্যে—এটাও তো কম নয়। সমীরণের বেলায় প্রমাণ পেয়েছি। প্রত্যক্ষ প্রমাণ এও—যখুনি ও অসুস্থ, তখুনি আমি গাই।

—কণামা ! ভয় করছে না তো ?

আমার ভাবের ঘরের দরজায় সজোরে আঘাত হানল পাত্রের মা পাশ থেকে।

উঠলুম আমি। স্বপ্নরাজ্যের ঘোরটা খসে পড়ল চোখ থেকে। বাতাসের বেগে গাড়ি ছুটছে। কোথায় এসে পড়েছি। এদিকে ফাঁকা রাস্তা। বড় বড় বাগানবাড়ি।

পাত্রের মায়ের চোখে চোখ পড়ল আমার।

একদৃষ্টে চেয়ে আছে। ভীতসন্ত্রস্ত দৃষ্টি। কেমন লাগল আমার। বললুম, ভয় করবে কেন—কিসের ভয় ?

—না, কিচ্ছু না। এমনি বলছিলুম, অনেক দূরে এসে পড়েছি কিনা—তাই। প্রায় এসে পড়েছি। বাবা ফাঁকা জায়গা ভালোবাসে বলে বাগানবাড়িতে থাকে। শেষ জীবনটা নিরিবিলিতে কাটাতে চায়।

বাড়িতে ঢোকার মুখে আমার মায়ের মুখখানা ভেসে উঠল। সেই হাসি। বুকের মধ্যে ছাঁত করে উঠল। ভেতরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে গেট বন্ধ করে দিল দারোয়ান। লাল কাঁকর মাটি মাড়িয়ে বাগানবাড়ির হলুদ কার্পেট মোড়া কাঠের বাক্স-সিঁড়িতে পা রাখলুম আমরা। আমি আর পাত্রের মা। মা গাড়ি থেকে নামার মুখে সেই যে ডানহাতটা ধরে রেখেছে আমার, ছাড়েনি। দোতলার ঘরে এসে ছাড়ল।

মেঝেয় সবুজ কার্পেটে ঢালা বিছানা পাতা। একজন বৃদ্ধ শুয়ে আছে ঠিকই। তবে অসমর্থ নয় তেমন। পাশে একজন যুবক বসে। এত ভারী দেহ—কলির ভীম। দুটি দারোয়ান দুপাশে বসে। যুবকটির পিঠ টিপছে, পা টিপছে, ঘাড় দলাই-মলাই করছে।

বিছানার একপাশে বসালো আমায় মা। মায়ের মুখ শুকিয়ে গেছে কিসে কি জানি। পরিবেশ আমার ভালো লাগছে না। আমি নিষ্প্রাণ পুতুলের মতন বসে। কি করে পালাই, কেমন করে পালাই—মাথার মধ্যে চিন্তা। আমি বন্দিনী।

একজন বলিষ্ঠ জোয়ান চাকর হারমোনিয়াম এনে সামনে রাখল। বৃদ্ধ পানের ডিবে খুলে একটা পান দু' আঙুলে ধরে মুখে পুরলো। চিবোতে চিবোতে বলল, নাতবৌ, গান শোনাও একখানা। মেয়ের মুখে তোমার প্রশংসা শুনেছি অনেক। গাও—গাও।

মা এসে পাশে বসল। অস্থির-অস্থির ভাব। ভীষণ ভয় পাচ্ছে। চতুর্দিকে তাকাচ্ছে চনমন করে। একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা সংশয় আমার মনে দোলা দিচ্ছে। গাইতে অনুরোধ করল বৃদ্ধ আবার। মা মৃদুস্বরে বলল, একখানা অন্তত গাও মা। অনেক আশায় বুক বেঁধে এনেছি তোমায়।

কি আশা জানার দরকার নেই আর, জানার ইচ্ছেও নেই। গলা কে যেন চেপে ধরেছে দু'হাতে। স্বর রুদ্ধ। আমি যেন আমাতে নেই। বসে আছি তো বসেই আছি।

যুবক বসে বসে দুলতে লাগল। বৃদ্ধের চোখে আর মায়ের চোখে ইশারায় কি সব কথা হল বুঝলুম না। দারোয়ান-চাকরের মুখের দিকেও তাকাল মা। তারা বেরিয়ে গিয়ে তখুনি ফিরল লাঠি-দাড়ি নিয়ে। আমি হতভম্ব হতবাক

মায়ের চোখে জল টল টল করে উঠল।

যুবকের দু'চোখ লাল করমচা হয়ে উঠেছে। দুলুনি বাড়ছে। বিড় করে কি বলছে। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল বৃদ্ধ, মা-ও উঠে দাঁড়াল। চাকর দারোয়ান—যে দু'জন টিপছিল এতক্ষণ—তারাও উঠে পড়ল।

এ যে ঝড় আসার পূর্ব-সংকেত ! কিসের ঝড়—কেন ঝড়—কাকে নিয়ে ?
কি ? থর থর করে কাঁপছে আমার সর্বশরীর।
বিকৃত গলায় চিৎকার করে উঠল যুবক। দেহটা কি ভয়াবহ—চতুর্গুণ ফুলে
। বিছানা ছেড়ে দাঁড়াল। উত্তেজনায় কাঁপছে। বলছে, খুন করে ফেলব।
াকে দাদুকে গলা টিপে মারব। আমার সঙ্গে চালাকি, জোচ্চুরি ! গাইয়ে
সঙ্গে বিয়ে দেব। বোবা মেয়ে এনে ঠকানো ! ওই শয়তানীটাকে আগে
ুন করব। দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে আমার দিকে।
চোখের পলকে বড় হলঘরখানা কুরুক্ষেত্রের রূপ ধরল। যুবকের কি তাণ্ডব-
ৃত্য। ঘর সুদ্ধু লোক ধরে সামলাতে পারছে না। পিঠে দমাদম লাঠির ঘা
ড়ছে। দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বাঁধছে ওকে। আমি দু'চোখে হাত চাপা
মা আমার হাত ধরে তুলল। নিয়ে এলো বাইরে।
ফিরে আসার সময় গাড়িতে বলেছে সমস্ত। আমাকে না বলে কয়ে নিয়ে
াটা ভুল হয়েছে। মহা অন্যায় করেছে। ছেলে পাগল। দিনরাত চেঁচামেচি
িনস ভাঙাভাঙি—সকলকে মারধোর। ছেলেকে পাহারার জন্যেই অত লোক
। ছোটবেলায় গান শুনতে ভালোবাসত খুব ছেলে। তাই মা ভেবেছে,
ান শোনালে যদি আগের মনে ফিরে আসে আবার। ডাক্তারের মত—মন ফিরে
লে বাধা নেই বিয়েতে। মা ভেবেছিল, গান শুনিয়ে যদি ওকে প্রকৃতিস্থ করা
য় —বিয়ে দিয়ে দেব। পরীক্ষা করে না দেখে পরের মেয়ের সর্বনাশ করতে
রবে না। পরীক্ষা করে দেখার জন্যেই সব গোপন রেখে বাবা অথর্ব বলে
থ্যের আশ্রয় নিয়েছে। কোন খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না।
ক্ষমা চেয়েছে মা আমার কাছে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে বাচ্চা মেয়ের মতন।
মিও নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনি। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে কেঁদেছি।
মায়ের এ কি অদৃষ্ট ! পৃথিবীতে ভালো মানুষেরই কি যত দুর্গতি !
রণেরও তো কি যন্ত্রণা। অথচ অনঙ্গ ওই প্রকৃতির—খুনে। বেশ আছে,
ক বাজিয়ে নেচেকুঁদে বেড়াচ্ছে। দুষ্টুর কাছে ঈশ্বরও জব্দ ? না, ঈশ্বর বলে
কেউ কোথাও। থাকলে এমন অবিচার হয় কেমন করে !
বাড়িতে পোঁছে দিয়েই পাত্রের মা আর একদণ্ড বসল না। গান শুনতেও
ল না রোজের মতন। অপরাধী মুখ করে গাড়িতে উঠে বসেছে তাড়াতাড়ি।
ায় বাবার সঙ্গে দেখাটা পর্যন্ত করেনি।
আমার মন বিষাদে ভারাক্রান্ত। ভেবেছিলুম বাবাকে বলব না এ সমস্ত। শুধু
আর মন খারাপ করানো কেন ? কিন্তু ভাবলুম এক, আর কাজে করে
লুম অন্য। মিথ্যে বলা অভ্যেস নেই। বাবা ও বাড়ির খবর জিজ্ঞেস করতেই,
গড় করে হুবহু বর্ণনা দিয়ে গেলুম।
মাকে যত ভয়, ঠিক মা এসে হাজির। বলার মাঝপথে যদিও বা এসেছে,
ঘটনা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। বাবা শুনে থ। মুখ কালো হয়ে গেল।
য় নিয়ে এ তার দ্বিতীয় পরাজয় মায়ের কাছে। আর মা ? আগের চেয়ে
রা খুশী দ্বিগুণ। এবারে আর মুচকে হাসি নয়, হেসে কুটি কুটি। ওপর

দিকে চোখ করে কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম তিনবার। ঘর থেকে বেরোনে
সময় বেশ জোরেই বলে গেল—গুরুদেব, সত্যিই তোমার কি করুণা, দূরে
আমার কথা শুনতে পাও দেখছি।

আমি বিস্ময়বিমূঢ়। বাবা মেঝেয় দু'বার পা ঘষে চৌকিতে বসে
থপাস করে। পাতা ফরাশ কুঁচকে গেল। আমার দিকে চোখ তুলে তাকা
না। খুব অস্বস্তি বোধ করছে। সামনে থেকে সরে পড়া উচিত আমার।
গেলুম।

বাবার জীবনীশক্তি প্রচুর। তাই দু'বার হেরে যাবার পরও দমল না।
চেষ্টা। এবারে মা ভয়ঙ্করী হয়ে উঠল। সাংঘাতিক ভাবেই বাধা
লাগল। যেখান থেকেই বিয়ের খবর আসুক না কেন—মা আগেভাগে
উচ্ছেদ করে দিয়েছে। সব কিছু গোপন সত্ত্বেও মা পাত্রপক্ষের ঠিকানা পায়
করে—আশ্চর্য হয়ে গেছি। পাত্রপক্ষের বাড়ি এমন চিঠি লেখে যে, যে-
একবার এসেছে—দ্বিতীয় বার বাড়ির ধারে-কাছে আসে না, আসতে চায়ও
পাত্র পক্ষের বাড়িতে বাবা উপস্থিত হলে, লাঞ্ছনা-অপমানের বোঝায় মাথা
করে নির্বাক মুখে বেরিয়ে আসতে হয়। মায়ের চিঠি বাবার চোখের সামনে
ধরে ওরা। বলে, যা লেখা আছে সত্যি ?

বাবা উত্তর দেয়—আমি বিশ্বাস করি না।

অপর দিক থেকে ভৎর্সনার সুরের প্রশ্নে বাবার বুকে শেল বেঁধে।—আ
করুন না করুন—আমরা করি। জিজ্ঞেস করেছিলুম যখন, লুকিয়ে
কেন ? ওই মেয়েকে আমাদের ছেলের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে সর্বনাশ করতে
কেন বলুন তো ! এখানে আসতে লজ্জা করে না ? ভদ্রলোক হন যদি এমুখো
হবেন না বলে দিচ্ছি।

এ সমস্ত বাবা চেপে যেত আমার কাছে। মাকে দেখলে, একটা দম
কানো নিঃশ্বাস ফেলেছে। আড়ালে কানের কাছে মুখ এনে চুপি চুপি
বাপ-বেটি পালিয়ে যাই কোথাও না হয়। তোর মা থাকতে বিয়ে হতে দে
ওর নিঃশ্বাসে আমার সব আশা নির্মূল হয়ে যাচ্ছে। ওর চোখের বাইরে
দেখবি এক মাসের ভেতর বিয়ে-থা সমাধা।

আমি বলেছি, দরকার নেই বাবা বিয়ে নিয়ে মাথা ঘামিয়ে। আমি তো
আছি গান-বাজনা নিয়ে। তুমি কি আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে
পারলে শান্তি পাচ্ছ না ?

—ছিঃ ছিঃ। ওকথা মুখে আনিস না। কবে বলতে কবে চলে
ডাক্তার ছুটি দিয়েই দিয়েছে। তাই তোর একটা অবলম্বন করে দিয়ে
পারলে নিশ্চিন্ত হই। ও মায়ের হাতে তোকে ছেড়ে দিয়ে মরে শান্তি পাব না
ও তো মা নয়, আস্ত একটা ডাইনি—নিজের মেয়ের সর্বনাশ নিজে করে-
মা-ও দুনিয়ায় থাকে !

আমি বাবাকে আশ্বাস দিই—বোঝাই, বলি, তুমি আমায়
শিখিয়েছ, গান শিখিয়েছ—অবলম্বন তো করেই দিয়েছ—আবার কিসের

ম্বন ! পেট চালিয়ে নিতে পারব'খন। ডাক্তারের বারণ—একদম চিন্তা না করতে। আমার জন্যে এভাবে চিন্তা করলে —কিছু ঘটলে—আপসোসের অন্ত থাকবে না যে আমার সারা জীবন ধরে !

বাবা যেন কি ভাবল খানিক। দু'চোখের তারা অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, মুখে হাসি ফুটেছে। আমি ভাবলুম, বিয়ের ব্যাপারে যাবে না বাবা আর। মায়ের সঙ্গে জেদাজেদির রণক্ষেত্র থেকেও সরে এলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম আমি।

স্বস্তি পেলেও কৌতূহল আমার গেল না। আমার সঙ্গে কেন এমন করে, কি কারণ ? আমার বিষয়ে লেখার কি আছে—যে লেখা পড়ে লোকে আমার মুখদর্শন করতে চায় না।

মা মুখ খুলে বলেনি আজ অবধি আমাকে কোন কথা। বাবাকে জিজ্ঞেস এড়িয়ে যায়। আমার কি এমন ঘটনা থাকতে পারে—এত ঢাকাঢাকি !

রাতের ঘুম অদৃশ্য হয়েছে আমার চোখের পাতা থেকে। আমি বিছানায় বসে থাকি। আমি এপাশের খাটে, মা ওপাশের খাটে। বাবা পাশের ঘরে। উঠে বসলেই, ঘুমন্ত অবস্থায় মা উসখুস করে। এপাশ-ওপাশ ফেরে। ঘুম ভাঙে। চোখ রগড়ে উঠে বসে। আমাকে বসে থাকতে দেখে, খাট নেমে কাছে আসে। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, ঘুমোসনি ? ভগবান তোকে শান্তি দিন, গুরুদেব কৃপা করুন।

সর্বশরীর জ্বলে উঠেছে আমার। গোরু মেরে গোদান। সর্বনাশ করে স্তবনা দেয়া ! কতরকমই জানে মা ! বিরক্তির একশেষ। খেঁকিয়ে উঠেছি—শোওগে যাও। আমার কি হয়েছে যে বকর-বকর। দোহাই মা, তুমি শোওগে ই।

মায়ের ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠেছে। কিছু বলতে চেয়েছে হয়তো। জলভরা বড়বে চোখে মাথায় হাত রাখতে গেছে আবার। আমি হাতটা ধরে সরিয়ে য়েছি। বেশ জোরেই ধরেছিলুম। মা ব্যথা পেয়েছিল বোধহয়। ধরার য়গাটায় হাত বুলোতে বুলোতে চলে গেছে।

আমি শুয়ে পড়েছি মায়ের চোখ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে। চোখ বুজে গে শুয়ে আছি। ঘুম আসছে না। গভীর রাত। আবার উঠে বসেছি। খলুম মা জেগেই শুয়েছিল। আমার মতন ঘুমোয়নি। এবারে উঠল না, শুয়ে শুয়েই কপালে হাত ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে বলছে, ঠাকুর, কণাকে ান্তি দাও !

পরের রাতে মায়ের কাছে শুইনি আমি। এপাশে—দোতলায় উঠেই বাঁদিকের রটায়—এটা আমার রেওয়াজ করার ঘর—ফরাশ পাতা চৌকির ওপর—হাত-পা শুয়ে পড়লুম। ঘুম আসছে না, ছটফট করছি। দরজায় টোকার াওয়াজ। প্রথমে সাড়া-শব্দ দিইনি।

আওয়াজ থেমে গেল। খানিকপর পায়ের শব্দ পেলুম আবার। দরজার াছে এসে মিলিয়ে গেল। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। ভেবেছি যে এসেছিল, সে

চলে গেছে। ভুল হয়নি। চৌকি থেকে নামার সময় মচ মচ আওয়াজ হতেই
আবার দরজায় টোকা। জোরে নয়, মৃদু। টক-টক-টক…। থামছে না
এ মায়ের কীর্তি ছাড়া আর কারো নয়। আচ্ছা করে শুনিয়ে দোব।

দরজা খুলে দেখি, মা নয়, বাবা। বাবা গলা নামিয়ে বলল, তোর মা
এসেছিল। জানালা দিয়ে দেখেছি আমি।

কথায় বাধা দিয়ে বললুম আমি, তুমি ঘুমোও নি?

শরীরটা ভালো নয়, ঘুম আসছে না। শোন, তোকে একটা কথা বলে যাই।
ও যদি তোকে কোন কথা বলে, কোন কাগজপত্র দেখায়—বিশ্বাস করিসনি
মোটে। আমি বিশ্বাস করিনি, করিনাও। বুঝলি, মনের জোর রাখবি। ভেঙে
পড়িস না যেন।

বাবা পা টিপে টিপে চলে গেল ঘরে। দরজা বন্ধ করলুম আমি। নিজের
কৌতূহল গিয়ে বাবার চিন্তা পেয়ে বসল আমায়। বাবা আবার অসুস্থ হয়ে
পড়বে। বাঁচানো যাবে না আর। কি করা যায়, কি উপায়!

এবার যে এসে দরজায় টোকা মারছে—মা ছাড়া কেউ নয়। ধরনটা সম্পূর্ণ
আলাদা। আগের চেয়ে আরও মৃদু আরও হালকা। সাবধানী সরু আঙুল
পড়েছে দরজার ওপর। থেকে থেকে। মাঝে মাঝে বিরতি, আবার শুরু। চুপ-
চাপ বসেছিলুম, উঠব না, খুলব না। দেখলুম না খুললে যাবে না কিছুতেই।
অগত্যা খুলে দিলুম দরজা।

মা প্রবেশ করল ঘরে। হাতে পাকানো কাগজ। বাবা যা বলে গেছে—
সত্যি। দরজার পাশের দেয়ালে সুইচে আঙুল ঠেকাল মা। ঘরময় টিউব
ল্যাম্পের দিন করা আলো ছড়িয়ে পড়ল অন্ধকার রাতে।

মা সস্নেহে আমার হাত ধরে চৌকিতে বসালো। চৌকাটের ওপারে মু
বাড়িয়ে দেখে নিল—কেউ আছে কি না, কেউ আসছে কি না। ভেতর থেকে
ছিটকিনি এঁটে দরজা বন্ধ করে দিয়ে কাছে এসে বসল।

বলল, মনে করেছিলুম, তোকে না বলে, আমি নিজেই ঠিক মতন ব্যবস্থা করে
নিতে পারব। তা হল না। এখন দেখছি ভরাডুবি হতে বসেছে। তোর বিয়ে
আমি দিতে চাই না, বেঁচে থাকতে দিতে দেবো না। তা বলে দিনে রাতে
এইভাবে না ঘুমিয়ে চিন্তায় চিন্তায় নিজেকে শেষ করে ফেলবি তুই—আমি চাই
না। আমি মা—মায়ের কাজই করে যাচ্ছি—করেও যাব। কেউ ভালো বলুক
মন্দ বলুক—আমার তাতে কিছু যায়-আসে না। তুই বড় হয়েছিস, বুঝতে
শিখেছিস—তুই ঠিক থাকলেই আমার বুক বাঁধা। দশটা নেই পাঁচটা নেই—তুই
যে আমার একটা—বড় মুখ-চাওয়া রে কণা!

গলা ধরে এলো মায়ের। একটু থেমে একটা ঢোঁক গিলে আবার বলেছে,
হয়ে সে-কথা মুখে বলতে পারব না কখনও। মরে গেলেও না। কর্তার মাথা
খারাপ। তা নইলে সব জেনে-শুনেও মেয়ের দুশমন হয়ে দাঁড়ায়। চোখে
জলের বড় বড় ফোঁটা মায়ের গাল গড়িয়ে পড়ছে। আমারও চোখে জল আসছে
মা বলল, তোর বাবা আমায় চিনতে পারল না। আমার সঙ্গে রেষারেষি ক

জেদ করে একটা রাক্ষুসে সর্বনাশ ডেকে আনছে সাত তাড়াতাড়ি। কাগজটা পড়ে দ্যাখ তুই। পড়ে, যা ভালো বুঝিস করিস। হ্যাঁ, আমি তোর বিয়ে ভেঙেছি, চিঠি দিয়েছি। যেখানে যেখানে সম্বন্ধ হয়েছে অনঙ্গকে দিয়েই ঠিকানা যোগাড় করিয়েছি। বিয়ে বিয়ে করে কর্তা এমন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে—মেয়েটাকে যার তার ঘরে না দিয়ে ফেলে—তুই আমার একটু সহায় হ। মন্ত্রের মতন কাজ হয়েছে এককথায়। অনঙ্গও বলেছে, মেসোমশাইয়ের যত সব বাড়াবাড়ি। কণার বিয়ে এখনই কেন? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি দেখে-শুনে ঠিক করে দোব'খন।

—এখন নয় বাবা—আমি বললে, তবে।

—নিশ্চয়ই। আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন। হেঁপো সমীরণটার কাছে যেন প্রকাশ করবেন না। মেসোমশাইকে বলে দিতে পারে ও।

মোড়া কাগজখানা খাস্তা হয়ে গেছে, বিবর্ণ। পাছে ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়—ভয়ে সন্তর্পণে খুলল মা। আমার চোখের সামনে তুলে ধরল। —পড়।

এ কি দেখছি, এ কি পড়ছি!

শ্রাবণে পৌষের বরফ ঠাণ্ডা হাড়কাঁপানো শীত এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপরে। ঠক ঠক করে কাঁপছি। বাবা অবিশ্বাস করতে বলেছে, ভুলে গেলুম। এই আমি। পায়ের তলা থেকে মেঝে সরে যাচ্ছে আমার।

নিজেকে ঠিক রাখতে পারলাম না আর। মাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদেছি আমি। আমিও যত কাঁদি, মা-ও তত কাঁদে।

বেঁচে কোন সুখ নেই আমার। নিজে কোনদিন সুখী হব না, কাউকে সুখী করতে পারব না। আত্মঘাতী হতে ইচ্ছে করছে তখন। আমার ভাবগতিক জানতে পেরে মা বুঝিয়েছে, বেঁচে থাকারই এই যন্ত্রণা, অপঘাতে ম'লে—আত্মা প্রেতাত্মা হয়ে ঘুরে বেড়ায়—সে ভীষণ কষ্ট!

সেই ভীষণ কষ্ট এড়ানো গেল না আমার জীবনে। একটু পরেই অপঘাত মৃত্যু আমার। অনঙ্গর প্রেতাত্মা শাসিয়েছে গতকাল—কেউ রুখতে পারবে না। এখন ঘড়িতে একটা প'য়ত্রিশ। আর প'চিশ মিনিট বাকি মাত্র। বারান্দা থেকে ডাক শুনছি আমি। অনঙ্গ ডাকছে—রেণুকণা রেণুকণা··· ।

ডাক যতই কাছে এগিয়ে আসুক না, কান না দিয়ে লিখে যেতে হবে। এখনও অনঙ্গর মৃত্যুর ব্যাপার লেখা হয়নি যে। কান থেকে মনকে জোর করে লেখার কলমে আনছি, পারছি না, তবু আনছি। লিখছি—

বাবাকে দেখে আমার দুঃখ হয়েছে। বাবার শরীর ভেঙে যাচ্ছে। নিজের ওপর কোন লক্ষ্য নেই। লক্ষ্যটা আমার ওপর কেবল। বলে, গানটা ছাড়লি কেন? গা'না! আমারও তো শুনতে ইচ্ছে করে।

সমীরণও এসে বলে। আমার গলা দিয়ে সুর বেরোয় না। হারমোনিয়াম তানপুরা ছুঁতে ইচ্ছে করে না। অত চোখের জল আমার ভেতর কোথায় জমা ছিল জানি না। ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে শুধু কাঁদতে ইচ্ছে করে। কাঁদিও। তাতেই বা শান্তি পাই কই!

একখানা কাগজ আমায় ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। কাগজটা যে সত্যি বলছে, তার প্রমাণও উল্লেখ করে সচেতন করে দিয়েছে মা। অবিশ্বাস করা যায় কেমন করে?

বাবা বলেছে, দেওঘরে যাবে। মায়ের জিওনকাঠি মরণকাঠি ওখানে—মায়ের গুরুদেবের হাতে। গুরুদেবকে দিয়েই জব্দ করতে হবে মাকে। ভাবাও যা কাজও তা।

মা বলেছে, অবিশ্বাসী যে সেই গুরুদর্শনে গেছে, এইটাই আমি চেয়েছিলুম। বলে কয়ে অনুরোধ করে—নিয়ে যেতে পারিনি কখনও। যাক, গুরুর আশীর্বাদে লোকটার একটু মতি ফিরুক। চোখ বুজে, জোড় হাত করে বলেছে, গুরুদেবের কি মহিমা! আমার ইচ্ছে পূর্ণ করলেন কি ভাবে! অত দূর রয়েছেন—শক্তি কি—কর্তাকে টেনে নিয়ে গেলেন তো এখান থেকে।

দিনকতক বাদে বাবা ফিরে এলো। মুখে চিন্তা-ভাবনার লেশ নেই এতটুকু। মায়ের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ একদম। একটু বিচিত্র ধরনের আচরণ। বেশীর ভাগ সময় নিজের ঘরে জানলা-দরজা বন্ধ করে একা থাকে। মাঝে-মধ্যে সামনা-সামনি পড়লে আমাকে দেখে হাসে শুধু। কোন কথাবার্তা নয়।

এতে আমার কোন দুঃখু নেই। বাবা যাতে শান্তি পাক—সেইভাবে থাকুক। আমারও কাম্য তাই। আমার বিয়ের ব্যাপার থেকে বাবা যে সরে যেতে পেরেছে—আমি নিশ্চিন্ত।

প্রথমে মা-ও খুব খুশী হয়েছিল। যতদিন যায়, মায়ের ভেতরে সন্দেহের দানা বেঁধে ওঠে তত। সব বিষয়ে নির্লিপ্ত হয়ে থাকার লোক তো কর্তা নয়। কেমন-কেমন ঠেকছে। একলা ঘরে বসে নতুন কি মতলব ভাঁজছে কে জানে! অমন কটুভাষী মুখফোঁড়—সাধুসন্তের ছায়া নজরে পড়লে মুখ ফিরিয়ে নেয়—শত হাত দূরে পালান—সেই মানুষ! মায়ের চেয়েও মৌনও হয়ে গেল! এমন গুরুর আশীর্বাদ পড়ল! আর পড়ল পড়ল কর্তার ওপরেই—যার ভক্তিশ্রদ্ধার বালাই ছিল না কোনকালে! এ যে পাতাল থেকে একলাফে স্বর্গপ্রাপ্তি।

গুরুদেব নাকি মাকে বলেছিলেন একবার, তোমার স্বামী খুব বাস্তববাদী। ধর্ম-কর্মের ধার ধারবে না কোনদিন। সকলে ধর্ম ধর্ম করে নাচলে সংসার চলে কেমন করে? পৃথিবীতে দু'জাতেরই লোক থাকবে চিরকাল। সংসারী অসংসারী। তোমার কাজ তুমি করে যাও। ওকে আর এর মধ্যে মিছিমিছি টানাটানি করে অশান্তি ভোগ করা কেন?

গুরুর সে কথা তো মিথ্যে হবার নয়। হঠাৎ পরিবর্তন। আসলে গুরু-দেবের ওখানে যাব রটিয়ে, অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে পারে। কোন দিক দিয়ে মায়ের সঙ্গে না পেরে উঠে গুরুর নামে ভয় দেখিয়ে ভান শুরু করেছে।

মা স্থির থাকতে পারল না। চলে গেল গুরুদেবের কাছে নিজেই। তবু একবার জেনে আসা ভালো—প্রকৃত ঘটনা কি।

মায়ের সঙ্গে একমত হতে পারিনি আমি এ বিষয়ে। আমার মনে হয়েছে, মায়ের সব অতিরিক্ত।

মা চলে যেতে বাবা এসেছে আমার ঘরে। আকাশের দিকে তাকিয়ে আনমনে বসে আছি দেখে, বলেছে, কণা, মনটা ভালো নেই আমার। একটা গান শোনা আজ। ফরাশের ওপর বসে পড়েছে। হাঁপাচ্ছে। আমার ভয় হল। প্রেসার বাড়লে এ রকম হল। বুকে-পিঠে হাত বুলিয়ে দিলুম আমি।

বাবা হাসল—মনের বুকে হাত না বুলোলে কি ভেতরের ব্যথা কমে রে পাগলী। আমার বুকটা দুমড়ে মুচড়ে গেল। ব্যথা—মুখ ফুটে কোনদিন বলেনি। তিনদিন অজ্ঞান হয়ে থাকার পরে, জ্ঞান হতে ভালো আছিই বলেছে।

সেই বাবা! শরীরকে কখনও বিশ্রাম দেয়নি সংসারের জন্যে। ডাক্তারের কথা কানে নেয়নি। কাকে না দেখেছে বাবা! ভাগ্নে-ভাগ্নী আত্মীয়-স্বজন—বাবার কর্তব্যের খাতিরে সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়নি তো কেউ কখনও। আজ বাবা একা। পাশে কেউ নেই। কারো মনের কোণে কি মানুষটার একটুও স্থান নেই, মানুষটার জন্যে কি কারো একটুও মমতা নেই?

বললুম, তোমার মনের ব্যথা দূর করতে পারি না কি আমি?

—তুই-ই তো পারিস মা। তোর কাছে এসেছি সেই জন্যেই তো। তোর গানই আমার সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে দেয়।

বাবার জন্যে আমি হারমোনিয়াম নিয়ে গাইতে বসলুম আবার।

মা যে কদিন ফেরেনি, বাবা মহানন্দে কাটিয়েছে। আমি রোজ গান শুনিয়েছি। সমীরণও আমাদের গানের আসরে যোগ দিয়েছে। ওর জ্বালা আপাদমস্তক অবধি।

'নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে'—এই অবস্থা। সৎমা বলেছে, সমীরণ সাংঘাতিক ছেলে—তার স্বামীকে নাকি অসুখের অজুহাত দেখিয়ে আটকে রাখতে চায়, সৎমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে। এ কথা শোনার পর নিজের বাবার ধারে-কাছে আর যায় না। অসুখ-বিসুখে কাউকে দিয়ে জানায়ও না।

ওর জন্যেও ভাবনা আমার খুব। মানুষটার কেউ নেই, নেই কেন—মা ভিন্ন আছে সব। ওরা থেকেও নেই এই যা দুঃখ।

লক্ষ্য করে দেখছি, প্রতিদিন গানের শেষে বাবা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, সমীর, তুমি রইলে কণা রইল। আরও কিছু বলতে চায় হয়তো, দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে যায়। একটু বাদে বলে, আমার তো ডাক এলো বলে।

সমীরণ বলে ওঠে, মেসোমশাই কি বলছেন আপনি? এখনও অনেক দেরী। নুলোদাদুর তিনবার স্ট্রোক হয়ে গেল। এখনও কি শক্ত-সমর্থ! বাজার করছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। দাদুর চেয়ে আপনার বয়েস তো অনেক কম।

আমার ভেতরটা ডুকরে কেঁদে ওঠে। বাবাই আমার সব। বাবা চলে যাবে ভাবতে পারি না। শুনতে পারি না। আমার চতুর্দিক শূন্য হয়ে যায়, অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। বলি, আচ্ছা বাবা, তোমার মুখে কি ওই অলক্ষুণে কথা ছাড়া দ্বিতীয় কথা নেই?

—সত্যিই তো একদিন যেতে হবে মা। কেউ কি অক্ষয় অমর হয়ে আছে আজ পর্যন্ত। বল, কে আছে? তোর বাবারও বাবা ছিল তো? কই, আছে?

তোদের মধ্যে আমি বেঁচে থাকব রে। তোর মধ্যে সমীরের মধ্যে। তোর মা তো আমার মতের বিপরীত। ও মনে রাখবে কেন?

ঘরের বাইরে—বারান্দায় পায়ের শব্দ শুনলুম। বাবা চুপ করে গেল। অনঙ্গ ঢুকল ঘরে। বলল, মাসীমা কবে আসবেন মেসোমশাই? না থাকলে বাড়ি মানায় না। কি যত্ন-আত্তি। 'ওরে ফ্যালা, চা করে দে'—বাড়ি মাত করতেন এতক্ষণ।

—কেন—কণা করে দিচ্ছে। বাবা বলল।

—না, দরকার নেই, গাইয়ে মানুষ—তানপুরা চালানোর আঙুলে গরম জলের ভাপ লেগে ফোস্কা না ওঠে আবার!

অসহ্য। চুপ করে থাকব ভেবেছিলুম। কথায় কথা বাড়বে। চুপ করে থাকতে পারলুম না আর হাড়-জ্বালানো কথায়। বললুম, বটেই তো। সুরের মর্ম তুমি বুঝবে কি? তুমি অসুর। গান বন্ধ করে দেবার অনেক দিনের জমা ক্ষোভ ফেটে পড়ল আমার।

মনে করেছিলুম, গোঁসা ক'রে গট গট করে চলে যাবে। তা নয়, উল্টে আরও জেঁকে বসল ফরাশের ওপর। দাঁত বার করে, হি-হি করে হেসে উঠেছে। বলেছে, আমি অসুর হলে বলতুম, হাত পুড়ুক আর যা হোক আমার জানার দরকার নেই—শুধু এক কাপ চা চাই। আমি গন্ধর্বলোকের লোক বলেই, শিল্পীর জন্যে দরদী মন নিয়ে বলা।

—গন্ধর্বলোকের লোক নও তুমি, আমি জানি কোন লোকের।

—কোন লোকের?

—গর্দভলোকের।

ঘর ফাটানো হাসি হেসে উঠল অনঙ্গ। আনন্দ আর ধরে না। এমন বেহায়া নির্লজ্জলোক যদি ভূ-ভারতে থাকে। আমার ভালো লাগছে না একে, ভালো লাগছে না ওর কথাবার্তা। উঠে পড়লুম।

ওষুধ পড়ল: অনঙ্গ 'হুম' বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অনঙ্গ মায়ের চর। মা এলে, ও বলবে সমস্ত। কে কখন কোথায় ছিলুম—কোন্ ঘরে ছিলুম। কি কথা কইছিলুম—বিয়ে ভাঙাভাঙিতে মস্ত হাত ছিল ওর মায়ের স্বপক্ষে। সে নিয়ে কোন বিদ্বেষ নেই আমার ওর ওপর। ওকে দেখলেই বাবুমনুর মৃত্যুর কথা মনে পড়ে যায়—কি নৃশংস ও। বুটসুদ্ধ তলপেটে সজোরে লাথি। ছেলেটার অন্তিম আর্তস্বর 'মাগো' এখনও কানে বাজে আমার। বাজে, ওকে দেখলেই, ওর কথা শুনলেই। এমনিতেই ওর দুর্ধর্ষগিরি অবুঝপনা সইতে পারতুম না আমি একেবারে। ওর চলন-বলন আমার দু'চোখের বিষ। তার ওপর ওই খুন!

দেওঘর থেকে ফিরে এলো মা দিন সাতেক পরে।

খুব মন-মরা। গাড়ি থেকে নেমেই আমার ঘরে এসে হাজির। গলার স্বরে হতাশা, কথায় দুর্ভাবনা। খুব ভয় পেয়েছে। বলল, কণা, দুঃসংবাদ। দরজাটা বন্ধ করে দে আগে। বলছি সব। যেন কাক-পক্ষী না টের পায়।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সিঁথির সিঁদুরে সিঁদুরকৌটো খুলে সিঁদুর চাপড়ালো খানিক। কপালের সিঁদুরে টিপে টিপে সিঁদুর লাগালো। নাকটার ওপর সিঁদুর ঝরে লাল হয়েছে, সে ধারে খেয়াল করল না মুছলও না। খাটে এসে বসল।

বলল, কর্তা গেছল গুরুদেবের কাছে।

আর যা বলল—শুনে আমারও রক্ত জল। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

বাবা যে ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে থাকে একা—যোগসাধনা করে। যোগ সাধনায় ভয় পাবার এত কিছু নেই। ভয়—নিঃশ্বাস বন্ধ করে 'কুম্ভক' করতে করতে একটা কেলেঙ্কারি না করে বসে। শরীর ভালোর জন্যে করলে গুরুর কাছে বসে যোগের পাঠ নিত। যা নিয়ম। এ অন্যের মন ঘুরিয়ে মেয়েকে বিয়ে করার মন করে দেয়া। তা-ও সাধনা চলছে গুরু ছাড়া। প্রেসার—হার্ট দুর্বল। বাতাস টানাটানিতে কোন্ সময় কি হয়ে যাবে কে বলতে পারে!

গুরুদেবকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছে বাবা, অনেক যোগের বইতে দেখা যায়—যোগে অসাধ্য বলে কোন কথা নেই। অপরের মন ঘোরানো ফেরানো কত ক্রিয়াকলাপের আশ্চর্য বর্ণনা রয়েছে। সত্যি—এসবে কোন ফল-টল হয় কি?

গুরুদেব বলেছেন, হ্যাঁ, হয়। যোগ যেমন প্রত্যক্ষ, তেমনি তার ফলও প্রত্যক্ষ। উপযুক্ত অভিজ্ঞ গুরুর কাছে না শিখে করলে সবই অপ্রত্যক্ষ অসত্য। তোমার এ বিষয়ে আবার ঝোঁক এলো কেন? কর টর নাকি?

বাবা বলছে, না। এই এমনি কৌতূহল হয়েছিল।

গুরুদেব বললেন, কৌতূহলে আবার অনেকে করেও বসে। ওসব কোর না যেন। নিঃশ্বাস টানা ছাড়া বন্ধ রাখা—সবেরই একটা ছন্দ আছে, সংখ্যাসীমা আছে।

মাকে বলেছেন গুরুদেব, যেভাবে প্রশ্ন যেরকম আগ্রহ—তাঁর মনে হয়, কণার বিয়ের ব্যাপারে পছন্দসই কোন ছেলের মনে প্রভাব বিস্তার করছে বাবা যোগে। তাঁকে জিজ্ঞেস করে যাবার পর—একা ঘরে দরজা-জানলা এঁটে বসে ওই কীর্তিই করছে নিশ্চয়। গুরুদেব সাবধান করেছে মাকে, এ ক্রিয়া যে-কোন প্রকারে বন্ধ করতে চেষ্টা কর, না হ'লে মানুষটাকে পাবে না শেষে। হিতে বিপরীত যে-কোন মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে।

ঘটে যেতে পারে কেন--ঘটে যাচ্ছিল। মেরে ফেলেছিলুম আমি নিজেই।

মা আসার পর ঘর থেকে বেরোনো বন্ধ করল বাবা। মা না থাকায় একটু আধটু এসেছে তবু গান শুনতে, সে-ও বন্ধ।

আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল—কি উপায়ে বাবার এই যোগসাধনা বন্ধ করা যায়। মতবব এসে গেল। যখুনি দরজা বন্ধ দেখব বেশীক্ষণ—ধাক্কা দিয়ে বাধা দোব।

এর আগে এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল, যা আমি কল্পনা করতে পারিনি। বৃষ্টি পড়ছিল। কোন সময় জোরে, কোন সময় গুঁড়ি গুঁড়ি। ছাত্রীকে গান শিখিয়ে ফিরছি, মুষলধারে নামল। সমীরণের জন্যে মনটা অস্থির হচ্ছে বড্ড।

ওর দু'দিন ধরে হাঁপের টানটা বেড়েছে। আমার গান না শুনলে, আরও কষ্ট পাবে। ছাত্রীরা বলেছিল একটু থেকে যেতে, একটু দেখে যেতে—আমি শুনিনি। ঘর তখন আমায় টানছে। আমি বৃষ্টি মাথায় করেই পথে নেমেছি। বাড়ি এসে দেখি, ঘরে সমীরণ। বুকে বালিশ চেপে হাঁপাচ্ছে। টানটা বেড়েছে, অসম্ভব রকমের। নিদারুণ কষ্ট। দম বেরিয়ে যায় বুঝি। দু'চোখের জল গড়াচ্ছে। আমি কি করব ভেবে পাচ্ছিলুম না। বললুম, সমীরণদা, ডাক্তারকে একবার খবর দিই না।

সমীরণ হাতের ইঙ্গিতে বারণ করল। বসে গান ধরতে বলল। কথা কইতে পারছিল না। হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। ভিজে সপসপে জামা-শাড়ি না ছেড়েই গাইতে বসেছি।—'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে, তাই হেরি তায় সকল খানে'।

একটু শান্ত হবার পর, ঘুমের ঘোর নেমেছে সমীরণের চোখে। ঘোর কাটতেই চমকে উঠেছে ও আমাকে দেখে। বলেছে, ভিজে শাড়ি-জামা—মারা পড়বে যে! ওঠো আগে! ছেড়ে এসো আগে, তবে কথা কইব, নইলে কইব না। সমীরণের কথা শুনলুম। শুকনো শাড়ি-জামা পরে এসে দাঁড়াতে, বলল, ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায়।

প্রথম ধাক্কা খেলুম আমি। এ ধরনের কথা ওর মুখ থেকে শুনিনি কখনও। আরও বলল, চিরদিন কি তুমি টুইশানি করে বেড়াবে ভেবে রেখেছ নাকি? আমি করতে দোব না। আমি যা উপায় করি, তাতে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর পেট চলবে না?

আমার চোখে সমীরণ বাচ্চা ছেলে। ওর মুখে সরল শিশুর হাসি দেখি। আনন্দে ভরে যায় আমার মন। ও যে আমার দেবশিশু। আমার ভেতরের যত স্নেহ উজাড় করে দিয়ে হাঁপের টানের সময় ওর পিঠে-বুকে-মাথায় হাত বুলোতে থাকি।

এ আমি কোথায়! এ কোন সমীরণ! আমার স্বপ্নের সৌধ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। দেয়ালের সঙ্গে পাথুরে মূর্তির মতন লেপটে গেছলুম আমি। কতক্ষণ একরকম দাঁড়িয়েছিলুম জানি না। সমীরণের কথাতেই সচেতন হয়ে উঠলুম। ও বলছে, ছাত্রীকে নোটিস করে দিও—তুমি আর যেতে পারবে না।

মাথার আগুন জ্বলল আমার। এ সব বাবার কারসাজি। ঘরে বসে বসে যোগসাধনা হচ্ছে। ফুলের মতন ছেলেটা—রোগে ভুগে ভুগে যে ক'দিন আছে—বাঁচতে দেবে না আর। মেয়ের বিয়ে বিয়ে করে মতিভ্রম হয়েছে বাবার। একটা নিষ্কলঙ্ক ছেলেকে মরণের বুকে ঠেলে দিতে কোন দ্বিধা নেই। আমি তো সাফ জবাব দিয়েছি—করব না। তবুও কেন এই চেষ্টা!

ওপরে এলুম। বাবার ঘরের দরজা বন্ধ একনাগাড়ে গুম গুম করে ঘুষি মেরেছি পাগলের মতন।

বাবা দরজা খুলেছে। সে দৃশ্য ভুলতে পারব না আমি। সারা দেহ প্রচণ্ড কাঁপছে বাবার। পড়ে যেতে যেতে শুয়ে পড়ল। একি হল, একি করলুম আমি?

দৌড়ে গিয়ে ডাক্তার নিয়ে এসেছি।

বাবা মরতে মরতে বেঁচে উঠেছে অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে।

দরজার ধাক্কায় বাবা বাজ পড়ার আওয়াজ শুনেছে ঘরের ভেতর। নিঃশ্বাস ফেলতে পারেনি, নিতে পারেনি। দম বন্ধ হয়ে মরে যাবার উপক্রম। কোন রকমে সামলে দরজা খুলেছে।

ডাক্তার বলেছে, বেঁচে উঠলেও এখনও কিছু বলা যায় না। ভয়ের কারণ আছে যথেষ্ট। স্ট্রোকেরও সম্ভাবনা যায়নি। কোন প্রকারের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা যেন না আসে। মনের সম্পূর্ণ বিশ্রাম চাই।

বাবার সে বিশ্রাম হচ্ছে কই! আর হচ্ছে না আমাকে ঘিরেই। আমার হাত ধরে কেবলি বলছে, তোর একটা ব্যবস্থা না করে মরেও সুখী হবো না কণা। চোখের জল উপচে পড়ে বাবার। বলে, তোর মায়ের মন কুসংস্কারে ভরা। ওকে আমি বিশ্বাস করি না একটুও! ওর হাতে ছেড়ে দিয়ে যেতে চাই না তোকে। আমার এ যন্ত্রণা থেকে তুই-ই মুক্তি দিতে পারিস মা। সমীরণকে আমার অগাধ বিশ্বাস। ও ভালো ছেলে।

ডাক্তারের কথা কানে বেজেছে আমার, এত ওষুধ-বিষুধে কোন কাজই হচ্ছে না। যেসব লক্ষণ উপস্থিত হচ্ছে ভালো নয়। বাবাকে কি করে বাঁচানো যায় এইটাই মাথায় ঘুরছে আমার। বাবা বলছে, এ যন্ত্রণা থেকে তুই মুক্তি দিতে পারিস মা। আমার হাতটা ধরে আছে বাবা! আমি বললুম বাবাকে, কথা দিচ্ছি। তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হোক। বাবার মুখে হাসি খেলে গেল। সে কি আনন্দ বাবার। জল ভরা চোখেও হাসি ঢল ঢল করছে।

পেছন ফিরে তাকাতেই দেখি মা দাঁড়িয়ে। মা এবারে অন্য মা, আগের মা নয়। নেই ঠোঁটের ফাঁকে সেই বিদ্রূপের হাসি, নেই চোখের কোণে কৌতুকের ইশারা। বাবার দিকে চেয়ে মা বলল, কণাকে আশীর্বাদ কর—ও সুখী হোক। কেঁদে ফেলল। কান্নাভেজা গলায় বলল, ভবিতব্য। গুরুদেব বলেছেন, অনেক ভবিতব্য স্বয়ং ভগবান এসেও খণ্ডাতে পারে না।

ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেছে বাবা। সমীরণের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে খুব খুশী। বিশ বছর বয়েস কমে গেছে। বাবার কমেছে, মায়ের বেড়ে গেছে কিন্তু। মা বুড়িয়ে গেছে। মাথাটা সাদা হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে মা এসে আমায় জড়িয়ে ধরে। বলে, শান্তি পাস যেন মা।

বিয়ের সময় অনঙ্গর কি উদ্দীপনা। কি কর্মশক্তি। প্রাণ ঢেলে খাটুনি যাকে বলে, সেইভাবে খেটেছে—খাটুনির অবসরে আমার কাছে এসে এসে জ্বালিয়ে গেছে—ভেবেছ, বিয়ে হয়ে গেলে অসুরের মুখ দেখতে হবে না আর, গর্দভলোকের মুখ দেখতে হবে না আর—সেটি হচ্ছে না। এ অসুরও যাচ্ছে সঙ্গে। সমীর তো মেসোমশাইয়ের বাংলোয় থেকে ক্রোমাইট ফিল্ডে কাজ করবে। আমাকেও যেতে হবে। সমীর আমি—দুজনে একসঙ্গে কাজ না করলে, শিগগির হবে না। মেসোমশাইয়ের অর্ডার বুঝলে কণাদেবী! ওড়িশায় রওনা হচ্ছি একসঙ্গে তিন-মূর্তি—তুমি আমি আর সমীর।

ভেবেছিলুম, ও এমনি-এমনি বলছে—স্রেফ খ্যাপানোর জন্যে। তা নয়, সত্যি সত্যিই এলো ও আমাদের সঙ্গে এই বাংলোয়।

যে ঘরে বসে লিখছি আমি, যে টেবিলে লিখছি, যে চেয়ারে বসে আছি—এক বছরের মধ্যে এই ঘরে এসেছে অনঙ্গ অসংখ্যবার। এই চেয়ারে বসেছে এই টেবিলে লিখেছে। ফাউন্টেন পেন অনঙ্গ উপহার দিয়েছিল আমায়। পড়ে রয়েছে। লেখা তো দূরের কথা—ছুঁই না পর্যন্ত। যেটায় লিখছি সেটা সমীরণের। অনঙ্গ ডাকছে আমায়—রেণুকণা রেণুকণা রেণুকণা ···। আমার দরজায় ও উপস্থিত। অন্যদিন রাত দুটোয়—আজ একটা পঁয়তাল্লিশে এসে গেছে। আমার লেখা শেষ করার আগে ও আমায় শেষ করে ফেলার জন্যে প্রস্তুত দেখছি। মরীয়া হয়ে লিখছি আমি—

এখানে এসে মাস ছয়েক ধরে বেশ কেটেছে আমাদের। সপ্তাহে সপ্তাহে বাবা-মাকে চিঠি দিয়েছি, আমরা দু'জনে ভালো আছি। ওখান থেকেও ভালো খবর আসে। মায়ের চিঠিতে একটা বাড়তি কথা যোগ হয় শেষের দিকে—প্রতিটি চিঠিতেই—তোর সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হোক।

গেটের পাশের ঘরটায় অনঙ্গ থাকত। আমরা এধারে। সারাদিন পাহাড়ে জঙ্গলে লোক নিয়ে খোঁড়াখুঁড়ির কাজে ব্যস্ত থাকে সমীরণ। কোথায় কালচে ক্রোমাইট পাথর, কোথায় খয়েরি লালচে। আমাকে এসে সব বলে। ওর খুব আনন্দ। বলে, দ্যাখ কণা, এই সব পাথরে কিভাবে জমে রয়েছে লোহা,ক্রোমিয়াম। পাথরের টুকরোগুলো নিয়ে এসে আমাকে দেখায়।

সন্ধ্যের পর আমি গান গাই, ও শোনে। আর নওলি। আদিবাসী মেয়ে হলে কি হবে—পুরো বাঙালি মেয়ে বনে গেছে আমার কাছে। কষ্টিপাথরের রঙ হলে কি হবে—আমার চোখে রূপসী। অমন নিটোল নিখুঁত গড়ন চোখে পড়ে কম। মাটির মেয়ে একেবারে। মনটি স্বচ্ছ সরল। দারুণ পরিশ্রমী। আমাকে তো কোন কাজই করতে দেয় না। ভুঁয়ে পা ফেলতে না দেওয়া যাকে বলে—তাই। দেবীর মতন দেখে আমায়। কি সেবা, দিদি বলতে অজ্ঞান।

সারাদিনের সঙ্গী আমার ওই-ই—সমীরণ না আসা অবধি। সমীরণ ফিরলে ডেরায় যায়। আবার আসে ভোর না হতেই। ওর ডেরাতে গেছি আমি, ওই-ই আনন্দ করে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিল আমায়। বাঁশের দেয়াল, লতাপাতার ছাউনি। তা হোক, বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দেয়ালে টাঙানো আমাদের বিয়ের ছবি। সমীরণের পাশে দাঁড়িয়ে আমি। বনফুলে সাজানো। ঘরে রাখব বলে, কাকুতি-মিনতি করে চেয়েছিল একদিন। আমি দিয়েছি একটা। জিজ্ঞেস করলুম—একটু তামাশা করার জন্যে, কিরে এত ফুল কেন—পুজোটুজো করিস নাকি?

—পুজো করবি না! তুই, দাদা আমাদের ঠাকুর আছিস না? হেসে

লুটিয়ে পড়েছে মাটির মেঝেয়। হাসি ওর অভ্যেস। কথায় কথায় হাসি। মনে-প্রাণে বাঙালি হয়ে গেছে ও। কথাটা যা একটু ভাঙা ভাঙা। তা হোক, আমার বেশ মিষ্টি লাগে।

অনঙ্গ হুট হুট করে যখন-তখন আসে আমার কাছে।—খিদে পেয়েছে, কিছু থাকে তো দাও। সকালে খাইয়ে পাঠালে কি হবে—অসুরের খিদে কি সহজে মেটে! সমীরের কথা ছেড়ে দাও—ও একাহারী। কোন সময় এসে বলেছে, তোমকা পাহাড়ের প্ল্যানটা দাও না কণা! সমীরকে বলে এসেছি—তাড়াতাড়ি নিয়ে আসছি।

ওকে দেখলেই, ওর কথা শুনলেই হেসে গড়াগড়ি খাবে নওলি। অনঙ্গ ফাজলামি করতে ছাড়ে না। বলে, কেন—অসুরকে ভয় করতে পারিস না? অসুরের শক্তি তো জানিস না? তুলে ফেলে দোব খাদের ভেতর একদিন। মজা বুঝবি। নওলির আবার হাসি। আমার দিকে তাকিয়ে বলে অনঙ্গ—তোমার অসুর যাচ্ছে এখন। এই প্রেতিনীকে সামলাও তুমি।

অনঙ্গর হাসি-মস্করাও আমি সইতে পারতুম না। কেমন যেন মনে হত—ও আমার মনের নীল আকাশে কালো মেঘ।

অনঙ্গ বলত আমায়, আমায় মুখের সামনে কেউ কোনদিন কোন কথা বলতে সাহস করেনি। আমার দাপটে থরহরি কম্পমান। তুমিই আমায় গালমন্দ করেছ—গর্দভ, অসুর। তা তোমার মুখে শুনে খুব খারাপ লাগেনি। মিষ্টিই লেগেছে। গালাগাল শুনতেই তো আসি ফিল্ড থেকে দৌড়ে দৌড়ে।

কথা শুনে পিত্তি জ্বলে যায় আমার। বলি, আচ্ছা নচ্ছার লোক তো!

—আমি নচ্ছার, আমি নচ্ছার—বলতে বলতে হেসে ওঠে পাহাড়-বন কাঁপিয়ে। একদণ্ড না দাঁড়িয়ে দৌড়ে পালায়।

নওলি জিজ্ঞেস করে, নচ্ছার কি দিদি?

—থাম এখন!

—ওঃ—থাম এখন? হাসির ঢেউ উথলে উঠেছে নওলির সর্বাঙ্গে।

নওলির এ হাসিও শুকালো—শুকালো আমার বুকের রক্তের সঙ্গে। সর্বনাশ ওৎ পেতে বসে ছিল পাহাড়ের চুড়োয়। লাফিয়ে পড়ল ক্রোমাইট ফিল্ডে।

সমীরণের জন্যে দুপুরের খাবার নিয়ে নওলি যাচ্ছে ক্রোমাইট ফিল্ডে। আমি সঙ্গে। জঙ্গলে গাছের ডাল ঠেলে উঁচু নিচু পাহাড়ী পথ মাড়িয়ে এলুম আমরা ফিল্ডে। ক্রোমাইট পাথরের টুকরো বোঝাই লোহার ট্রলিটা এগিয়ে আসছে। পাহাড়ের চুড়ো বেয়ে।

ওদিক থেকে চিৎকার করে উঠল সমীরণ—কণা, ট্রলি ট্রলি! সরে যাও, সরে যাও! সমীরণ ছুটে আসছে এদিকে, ট্রলিটা ছিঁড়ে পড়ল। পাহাড় ফেটে চতুর্দিকে পাথর টুকরো ছিটকালো যেন। ট্রলির টুকরো পাথর লাগেনি আমাদের কারো গায়ে। কিন্তু একটা ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে গিয়ে ঝুলে পড়ল ওপর থেকে। সপাং করে চাবুকের ঘা বসিয়ে দিল যেন সমীরণের পিঠে।

মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সমীরণ তারে জড়িয়ে। লাঠি দিয়ে তার সরিয়ে

ফেলছে অনঙ্গ তখুনি।

গ্রহের ফের, না নিয়তি, না আমি—কে এই ঘটনার জন্যে দায়ী? বাবার কথায় এটাও কি কাকতালীয়? হাসপাতালে সমীরণের শিয়রে বসে আমি ভাবতুম। ক্ষীণকণ্ঠে সমীরণ জিজ্ঞেস করেছে—কি ভাবো এত কণা?

মিথ্যে বলতে মুখে আটকেছে তবু মিথ্যে সান্ত্বনাই দিয়েছি মনের কথা চেপে রেখে।—ভাবছি ঈশ্বরের কি আশীর্বাদ আমাদের ওপর। তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠছ তুমি।

দেখেছি বিয়ের আগের সেই সমীরণকে আবার। শিশুর অনাবিল আনন্দে ভরা সেই মুখ। হাঁপের টান বাড়লে এসেছে সে-সময়। যে-সময়ে আমি গান শুনিয়েছি, বুকে পিঠে হাত বুলিয়েছি। ঘুমিয়ে পড়েছে ও। সেই ঘুমন্ত মুখ।

ডাক্তাররা আড়ালে আমায় বলেছে, ইলেকট্রিক শকে সমস্ত নার্ভ ওর শুকিয়ে গেছে। সব অঙ্গই তাই ওর পড়ে গেছে। এখন যদি প্রাণটুকু ধরে রাখা যায়—জানবেন ভগবানের অশেষ কৃপা।

ওরা অনেক সেবাশুশ্রূষা করেছে তিন মাস ধরে। চিকিৎসার কোন ত্রুটি করেনি। প্রাণটুকু ধরে রেখেই এই বাংলোয়—এই ঘরে রেখে গেল।

সমীরণের বাবাকে খবর দোব কিনা—প্রথম জ্ঞান হতেই জিজ্ঞেস করেছি ওকে। বলেছে—না, আমি মরে গেলেও দিও না।

আমার তো বাড়িতে খবর দেয়ার কথাই ওঠে না। কাকে দোব? বাবা শুনলে তখুনি শেষ। মা শুনলে তুমুল কাণ্ড বাধাবে বাবার সঙ্গে—আমার মতের বিরুদ্ধে—হয়েছে তো! কোন দিক দিয়েই বাবার শেষ রুখতে পারব না আমি।

যে মাথা অত উঁচু ছিল আমার, নিচু করে অনঙ্গর শরণাগত হয়েছি। কাতর অনুরোধ করে বলেছি—ভাই অন্তত ওর মুখ চেয়ে এ খবর চেপে যেও তুমি অনঙ্গদা।

কথা শুনেছে অনঙ্গ, ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছে। আমাকে না করুক—সমীরণকে সম্ভ্রম-সম্মান করত অনঙ্গ। ঘরে থাকলে ঢোকেনি কোনদিন। একটা কারণের জন্যে হয়তো এটা ওর কৃতজ্ঞতা।

সমীরণের দুর্ঘটনার পর থেকে নওলির মুখে কোনদিন আর সেই প্রাণখোলা মন মাতানো হাসি দেখিনি আমি। দেখেছি যা—সে কি বিকট হাসি—ওই মেয়ের মুখে ওই হাসি—বিশ্বাস করতেও সময় লেগেছে আমার। মাস তিনেক এই ঘরে শয্যাগত হয়ে ছিল সমীরণ। বাঁচাতে পারেনি ডাক্তাররা, বাঁচাতে পারেনি আমার সিঁথির সিঁদুর।

মায়ের কুসংস্কারই ফলল আমার জীবনে। মা কুষ্ঠির কাগজ দেখিয়েছিল আমায়। আমার বিষকন্যা-যোগ। এ যোগে স্বামী থাকবে না। মা চায় নি বিয়ে দিতে। থাকুক কুমারী হয়ে। সধবা করিয়ে বিধবার জ্বালা আর ভোগ করানো কেন ওকে? অপর মায়ের কোল থেকে একটা ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যমের

মুখে ধরা দেয়া কেন ? জেনে-শুনে এসব করা উচিত নয় মোটে।

বাবা বিশ্বাস করেনি। মায়ের সমস্ত কুসংস্কার। মা প্রমাণ দেখিয়েছে আমার দুটো বিয়ে ভাঙার উপমা দিয়ে। সব ভেসে গেল। যা হবার আমার তাই-ই হল।

সমীরণের মৃত্যুর পরেও জানাইনি মা-বাবাকে এ দুঃসংবাদ। বরাবরের মতন চিঠি লিখেছি—আমরা খুব ভালো আছি। তোমরা ভেবো না।

সমীরণ চলে গেছে মাসখানেক হল। নওলির মুখের হাসি শুকোলেও চোখের জল শুকোয়নি। আমার চোখে জল আসবে কেমন করে! আমার বিষকন্যা-যোগ যে। আমি আগুন। আমার আগুনে আমি পুড়িয়ে মারছি যে সবাইকে। দুচোখ শুকনো খটখটে। মরুভূমির দুপুরের হলকা ছুটছে আমার দুচোখের তারা দিয়ে।

আমার জীবনের বিভীষিকার রাত শুরু হল সেই রাত্তিরে—অনঙ্গকে পুড়িয়ে মারা হল যখন।

ঘুম হচ্ছে না আমার, দুচোখে তন্দ্রার ঘোর লেগেছে সবে। স্পষ্ট শুনলুম আমি, অনঙ্গ ডাকছে আমায়। —রেণুকণা রেণুকণা রেণুকণা……। অনঙ্গ হালকা সুরে কথা বলার সময় কণা বলেই সম্বোধন করতো। এ ছাড়া অন্য সময় রেণুকণাও বলত।

অনঙ্গর আর্তনাদে তন্দ্রা ছুটে গেল আমার। দরজা খুলে দেখি পাহাড়ের দিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। নওলির পাতার ঘর গ্রাস করছে হুতাশন।

বারান্দায় বেরিয়ে এসেছি পড়ি-মরি করে। ছুটতে ছুটতে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে নওলি। রাক্ষুসী মূর্তি, পাগলের মতন হাসছে। আমায় বলল—বদমাশটাকে সরিয়ে দিয়েছি। তোর আর কোন ভয় নেই।

আমার ভয়টা কিসের ?

ভয় ছিল। নওলির ঘরে গোপনে গেছে বহুবার অনঙ্গ। প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে বিয়ে করার। করেনি। নওলি বললে সে বলেছিল—এখন প্রকাশ করিস না কারো কাছে, বিয়ের দিনে তোর দিদি-দাদাকে তাক লাগিয়ে দোব ব্যবস্থা করে।

সরল প্রাণের মানুষ নওলি। বিশ্বাস করেছে। দাদা চলে গেল, মনমেজাজ এত খারাপ—ও কথা তুলতে ইচ্ছে করেনি এমনিতেই। মাথায় রক্ত চড়ল নওলির আদিবাসী দস্যিদের সঙ্গে অনঙ্গর শলা-পরামর্শ শুনে। দিদিকে এদেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে রাতের অন্ধকারে—অমাবস্যার রাতে।

সরিয়ে নিয়ে যাওয়া দেখাচ্ছে নওলি! তার আগেই সরিয়ে দেবে সে অনঙ্গকে। হাসির মুখোশ পরে নওলি অনঙ্গকে ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে। তারপর বেরিয়ে বাইরে থেকে ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছে বাঁশের খিল শক্ত করে এঁটে, আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ঘরের চারপাশে।

নিত্য নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে আমার। এমনও হয় মানুষ! এখনও সমীরণের নিঃশ্বাস বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই সেদিনের কথা। কেমন করে ভুলে গেল

অনঙ্গ ওকে। একদিন অনঙ্গকে আগলে রেখে খুনের দায় থেকে বাঁচিয়েছে সমীরণই। সেই সমীরণের স্ত্রী আমি। আমার ওপর—এতটুকু বিবেকে বাধল না অনঙ্গর! অকৃতজ্ঞ কোথাকার।

নওলিকে বললুম, আমি না হয় চলে যেতুম এখান থেকে—আমাকে জানালি না কেন? ঘুমন্ত পুড়িয়ে মারলি লোকটাকে!

নওলি আমার দু'পা জড়িয়ে বসে রইল।

পুলিশের কাছে বলেছি আমি—নওলি ও-ঘরে থাকে না অনেকদিন। থাকে আমার বাংলোয়।

পুড়িয়ে মারার দায় থেকে নওলি বেঁচে গেছে, কিন্তু আমি বেঁচেছি কই!

আটদিন আগে রাত দুটোয় আগুন জ্বলেছে নওলির ডেরায়। সাতদিন ধরে ওই সময়ে আমার বাংলোয় আমার ঘরের দরজায় শাসানির আগুন শিখা লক লক করে ওঠে।

আজ শেষ রাত, শেষ শাসানি। কাল থেকে এই বাংলোর আঙিনা নিস্তব্ধ শান্ত বিভীষিকা মুক্ত।

আমায় ডাকছে অনঙ্গ। ওর ডাক শুনলেই মনে হয়, ঘরের দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে যাই। বৈতারী পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ি দামসালনালার জলে। সব জ্বালা জুড়োক আমার এক নিমেষে। হোক অপঘাত মৃত্যু আমার। হোক মনোবাঞ্ছা পূর্ণ অনঙ্গর। কালও বলে গেছে, তোমার অপঘাতে মৃত্যু নিশ্চিত। ওর আকর্ষণ টানে আমায়। টেনে নিয়ে যাবে আমার মৃত্যুর ফাঁদে—আমি জানি আমি প্রস্তুত।

প্রেতাত্মা—বিষকন্যা-যোগ—এসব নিয়ে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলা লেগেছে আমার মনে বহুবার। কখনও মায়ের কথা মনে দাগ কেটেছে, কখনও বাবার। কারটা সত্যি, কারটা বাস্তব?

যেটাকে অবাস্তব কুসংস্কার বলা হয়েছে—সেটাকে তো বাস্তবে ঘটতে দেখছি আমি। দেখেছিও অন্তত আমার জীবনে। বিষকন্যা-যোগ প্রমাণ হয়ে গেছে। প্রেতাত্মা?

স্বচক্ষে দেখছি, ডাক শুনেছি। আমার মনোবিকার কিনা—সে চিন্তাও করেছি। একদিন নয়, সাত সাতটা দিন—দেখেছি শুনেছি। এর পরেও মনোবিকার বলি কেমন করে?

এ বিপদে আমি অসহায়-নিরুপায়। আমি একা। রক্ষে করার কেউ নেই আমায়। রাতের ঘটনা সকালে বলার উপায় নেই কাউকে। আমার গলা টিপে ধরে মুখ চেপে ধরে কে যেন। পালানোরও কোন উপায় নেই। গেটের কাছে যেতে গেলেই চতুর্দিক থেকে অনঙ্গর রক্তচক্ষু আমায় তাড়া করে। দুঃসহ যন্ত্রণায় কাটালুম আমি বাংলোর এই ঘরখানায়।

কোণের ঘরে থাকে নওলি। দিনে ওর মতন আপনজন আমার কেউ আর নেই। দিনে নওলি সেবিকা, রাতে বিভীষিকা। রাত দু'টোয় আমার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে আসে ও ঘর থেকে। আমি শুনি, বৈতারী পাহাড়ের ওপর থেকে

ভেসে আসছে বুঝি ওই ডাক। এগিয়ে আসছে ক্রমে।

নওলির কণ্ঠে হুবহু অনঙ্গর বিকৃত গলার স্বর, কথাবার্তাও। নওলির চোখ দেখি না আমি ওসময়, দেখি নওলির চোখে অনঙ্গর চোখ। একটুও ভুল নয়, পরিষ্কার। রাত দু'টো থেকে চারটে অবধি নওলির দেহে ভর ক'রে অনঙ্গর কি তর্জন-গর্জন। তারপর বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে নওলি আমার দোরগোড়ায়। ভোরের আলোয় হুঁশ আসে ওর। নওলির গলায় ডাকে নওলি। কেমন ক'রে এলুম রে আমি এখানে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে!

জানিনা আমার মৃত্যুর পর নওলির কি হবে। ও বেঁচে থাকবে কিনা সন্দেহ। অনঙ্গ বলেছে নওলিরই মুখ দিয়ে—নওলিকে বাঁচাতে পারবে না তুমি। ও আমায় পুড়িয়ে মেরেছে। পুলিশের কাছে বলেছে তোমার বাংলোয় ছিল। তোমার সঙ্গে ওরও শেষ।

বাইরের ডাক আমাকে টানছে। আমি আর বসে থাকতে পারছি না। আমি উঠবো, বেরিয়ে যাবো দৈতারী পাহাড়ে!

ঘড়ির ঢং ঢং আওয়াজ আমার বুকে দুম দুম ক'রে হাতুড়ির ঘা বসিয়ে দিল। রাত দুটো, শেয়াল ডেকেছে চতুর্দিক থেকে। ওই ডাকে গলা মিলিয়ে—একটা অনঙ্গ নয়—শত সহস্র অনঙ্গ ডাকছে, রেণুকণা রেণুকণা রেণুকণা…। কানে তালা ধরে যাচ্ছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠছি আমি কাঁপতে কাঁপতে কাঁপতে। কাল ভোরে কেউ খুঁজে পাবে না আর—আমি কোথায়!

দরজা খুললুম আমি।

চৌকাঠের ওপারে পা রাখতে যাচ্ছি, পেছন থেকে হাত দু'টো কে যেন চেপে ধরে, টেনে নিয়ে এলো আরও ভেতরে। আচ্ছন্নভাবটা কেটে গেল আমার। সঙ্গে সঙ্গে আমার যেন নবজন্ম হ'ল। এ আমি এক অন্য রেণুকণা। শান্ত নির্ভয়।

সেই মুহূর্তে অসম্ভব ঘটনা ঘটে গেল একদিনে যা ঘটেনি। রক্তজবা দু'চোখ ফিকে হ'য়ে এলো নওলির। নওলি টলতে টলতে চোখ বুজে লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়। চোখের পলকে চোখ চাইল আবার। নওলির আগের ঠাণ্ডা সেই চোখ!

আমার মনে হচ্ছে, সমীরণের দু'টি বাহু আমাকে বেষ্টন ক'রে রয়েছে। স্পর্শের অনুভূতি পাই আমার মনে, আমার দেহে।